অপরাজিত

হাওয়ার্ড ফাস্ট

অনুবাদঃ প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী

বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২



প্রথম সংস্করণ—ফাল্গুন, ১৩৫৯

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক—ফাইন আর্ট টেম্পল

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ফোটোটাইপ সিণ্ডিকেট

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

মুদ্রাকর—রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড
পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড
১৪১, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড
কলিকাতা-১৩

৩০০৫/৩/০৭
STATE CENTRAL LIBRARY
WEST BENGAL
CALCUTTA
২১.১১.৫৭

পাঁচ টাকা

অনুবাদ-প্রসঙ্গে

অপরাজিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। অপরাজিতের কাহিনী আমেরিকার মুক্তিযুদ্ধের খণ্ড-কাহিনী। স্বাধীনতা, সমানাধিকার ও গণতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ আমেরিকান বিপ্লব দীর্ঘ ছয় বছর চলে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এই মুক্তিযুদ্ধের একটি পর্যায়ের পটভূমিকায়, প্রথম আট মাসের বিপর্যয়ের কাহিনী নিয়ে লেখা হয়েছে এই উপন্যাস। আজাদী ফৌজের নিউইয়র্ক অভিযানে উপন্যাসের আরম্ভ এবং ট্রেনটন অভিযানের উদ্যোগ-আয়োজনে তার সমাপ্তি। উপর্যুপরি পরাজয়ে বিপর্যস্ত মুক্তি ফৌজের পশ্চাদপসরণের পরিপ্রেক্ষিতে হাওয়ার্ড ফাস্ট যে ঐতিহাসিক চিত্র এঁকেছেন, তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে গোটা আমেরিকান বিপ্লবের প্রকৃতি, সেকালের আমেরিকার ঔপনিবেশিক জীবনের আলেখ্য এবং মুক্তি যুদ্ধের মহান নেতা জর্জ ওয়াশিংটনের চরিত্র। এই উপন্যাসের কোন ঘটনাই কিংবদন্তী, ঐতিহাসিক অসত্য কিম্বা কল্পনা-রঞ্জিত নয়...কোন চরিত্রই কাল্পনিক নয়। ফাস্টের ভাষায়, 'প্রতিটি নামের এক একটি লোক ছিলেন এবং কাহিনীতে যে ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, খোদ বিপ্লবেও তাঁরা অনুরূপ ভূমিকাই গ্রহণ করেছেন। আমি তাঁদের বাঁচিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছি...।' আমেরিকান বিপ্লবের মহান নেতা এবং তাঁর চারপাশের লোক-জন এই উপন্যাসে 'যথোচিত মানবীয় মর্যাদায়' প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

ঐতিহাসিক ব্যক্তিরাও রক্ত-মাংসে-গড়া মানুষ। কিন্তু উত্তরপুরুষে সাধা-রণত তাঁদের মধ্যে অতিমানবীয় মহত্ত্ব ও মহিমা আরোপ করে পূজা করে কিম্বা দোষ-ত্রুটি-দুর্বলতা ফেনিয়ে-ফাঁপিয়ে তাঁদের লঘু প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করে। 'সর্বদেশের হতভাগ্য ও নিপীড়িতদের নিয়ে গড়া এক নতুন জাতির জনক', জর্জ ওয়াশিংটন সম্পর্কেও এমনি মনোভাব দেখা দিয়েছিল। উত্তরকালের একদল পূজারী তাঁকে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করে; আর একদল সমালোচক তাঁকে ভার্জিনিয়ার গর্বিত অভিজাত বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করে। ফাস্ট এই দুই পন্থাই বর্জন করেছেন। সমকালীন লোকের দৃষ্টিতে রক্ত-মাংসে-গড়া মানুষ হিসাবে, নেতা হিসাবে যে-ভাবে তিনি প্রতিভাত হয়ে-ছেন, আমেরিকান মুক্তি যুদ্ধের পটভূমিকায় ফাস্ট যথাসম্ভব সেই ভাবেই ওয়াশিংটনের চরিত্র এঁকেছেন। এই ভাবে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখবার যে নতুন ধারা ফাস্ট প্রবর্তন করতে চেয়েছেন, অপরাজিত আমেরিকার সাহিত্য-জগতে সেই একক প্রচেষ্টার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অপরাজিতের ওয়াশিংটন

চরিত্র স্মরণ করিয়ে দেয় টলস্টয়ের 'ওয়ার এণ্ড পীস' উপন্যাসের রুশ জেনারেল কুতুজভকে।

ফাস্টের এই প্রচেষ্টার সাফল্য আমেরিকাতেও অকুণ্ঠ স্বীকৃতি পেয়েছে। অপরাজিতের সমালোচনা প্রসঙ্গে একজন আমেরিকান সমালোচক বলেছেন, 'এতকাল পরেও ওয়াশিংটনকে ঐতিহাসিক চরিত্র এবং রক্ত-মাংসে-গড়া মানুষ হিসাবে চিনতে না পারা প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হয়। মিঃ ফাস্টের বৈশিষ্ট্য এই যে, ওয়াশিংটনকে তিনি একসঙ্গে মহান নেতা ও মানুষ হিসাবে এঁকেছেন। অন্য কোন ঔপন্যাসিক এমন সফলভাবে একাজ করেছে বলে আমার জানা নেই।'

উপন্যাসের শেষে লেখক নিজেই এক জবানবন্দী দিয়েছেন। তাঁর সেই 'শেষ কথা'র পর উপন্যাস সম্পর্কে বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই উপন্যাসের কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেকালের আমেরিকার ঔপনিবেশিক জীবনধারা। কাজেই আমেরিকান উপনিবেশের গোড়াপত্তনের ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সংক্ষেপে দু-চার কথা অনুবাদ যাঁরা পড়বেন, তাঁদের কাছে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক বলে গণ্য হবে না।

খ্রীস্টীয় সপ্তদশ ও অস্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইয়োরোপবাসীর প্রবাস যাত্রার ফলে নতুন মহাদেশের সমুদ্র সৈকতে গড়ে ওঠে এক নতুন দেশ—গোড়াপত্তন হয় এক নতুন জাতির। পুরনো ইয়োরোপ প্রতিবিম্বিত হয় নব-রূপে নতুন পরিবেশে। গোটা ইয়োরোপীয় সমাজের শিক্ষা-সংস্কৃতি, আচার-আচরণ ও রীতি-নীতির সংমিশ্রণে আজকের আমেরিকার বনিয়াদ গড়ে ওঠে নতুন জগতেব অতলান্তিক সৈকতে।

নিজ নিজ ভাষা সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতিনীতি নিয়ে ইয়োরোপের সর্বদেশেব অধিবাসী ও নিগ্রো ক্রীতদাস আসে তিন হাজার মাইল সাগর পাড়ি দিয়ে। আসে ভাগ্যান্বেষী কুবেরত্ব-লোভী, আসে দুঃসাহসী। আর আসে দুর্গত হতভাগ্য আর নিপীড়িতের দল ..রাজনৈতিক সামাজিক ও ধর্মীয় পীড়ণের হাত থেকে ত্রাণ পাবার আশায় পালিয়ে আসে, আসে দাসখত লিখে। আমেরিকার সাবেক বসিন্দা ইণ্ডিয়ানরা হটে যায়, পালিয়ে যায়, নির্মূল নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় শ্বেত আগন্তুকদের ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর উৎসাদন যজ্ঞের দাপটে। আমেরি-কার কেনেবেক, কনেক্‌টিকাট্‌, হাডসন, শাস্‌কেহানা ও পোটোমাক নদীর মোহানা বরাবর প্রায় তেরোশ মাইল জুড়ে গড়ে ওঠে তেরোটি নতুন উপনিবেশ।

ইয়োরোপের ভাগ্যান্বেষী, দুঃসাহসী আর দুর্গতরা পায় অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ, সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত খামার ও বসবাসের জমি।

নতুন মহাদেশে নতুন উপনিবেশ যারা গড়ে তুলেছে, নিপীড়িত ও নির্যাতিতের সংখ্যা তাদের মধ্যে সর্বাধিক। দারিদ্র্যের পীড়নেই হোক, রাজভয়েই হোক, ধর্মাচরণের স্বাধীনতার মোহেই হোক, নিজ দেশে দুঃসহ নিপীড়নের সম্মুখীন না হয়ে কেউ সাগর পাড়ি দেয়নি।

সাড়ে তিনশো বছর আগে ইয়োরোপবাসীর কাছে নতুন জগৎ ছিল বন-কান্তার-ঘেরা অজ্ঞাত-পরিচয় রহস্যময় দেশ। মাঝখানে সমুদ্রের দুস্তর ব্যবধান। তবু নতুন জগতের অফুরন্ত বেওয়ারিশ ধন সম্পদের রূপকথা চমক জাগায়, প্রলুব্ধ করে। ইংলণ্ডের কিছু ধনপতি উপনিবেশ স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হলেন। কিন্তু নতুন জমিদারী পত্তন করতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন লোক-বলের চাই কুলি-কামিন ক্ষেত-খামারে কাজ করবার লোকজন। সেকালের আমেরিকার এ লোক-সম্পদ ছিল না। অন্য জায়গা থেকে যোগান দিতে হবে। ইয়োরোপের দুঃস্থ আর দুর্গতরা এবং নিগ্রো ক্রীতদাস এ অভাব পূরণ করে। এক মুলুকের হতভাগ্য আর নিপীড়িতের দল অন্য দেশে গড়ে তোলে নতুন বসতি।

সেকালের ইয়োরোপের সামন্ত সমাজ ব্যবস্থার শোষণ ও পীড়ন, ধর্মীয় বাদ-বিসম্বাদ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের দরুণ কোন দেশেই দুর্গত বা নিপীড়িতের অভাব ছিল না। তবু নিজদেশে অভাব-অনটন ও অত্যাচারক্লিষ্ট মানুষও স্বভাবতই অজ্ঞাত ভবিষ্যতেব মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে কুণ্ঠা বোধ করে। নানা ছলা-কলার আশ্রয়ে, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রলোভনে মুগ্ধ করে উপনিবেশ স্থাপয়িতারা এদের অনেককে দেশত্যাগে প্রলুব্ধ করেন। অর্থ দিয়ে, সংসারের অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্র দিয়ে, সমুদ্র যাত্রার ব্যয়ভার বহন করে এবং নতুন দেশে ভরণপোষণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা সপরিবারে লোক সংগ্রহ করতে লাগলেন। লোক সংগ্রহের এ ছাড়াও ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হয়। দাস-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ব্যবস্থা করা হয় নিগ্রো ক্রীতদাস যোগান দেবার। বিচারক ও কারাধ্যক্ষদের সঙ্গে ব্যবস্থা করা হল বন্দী-সংগ্রহের। জাহাজের কাপ্তেন দের সঙ্গেও বন্দোবস্ত করা হল লোক সংগ্রহের জন্য। নানা প্রলোভন দেখিয়ে কিম্বা সরাসরি অপহরণ করে এরাও নিয়ে এসেছে বহু লোক পুরস্কারের লোভে।

নতুন জগতের অচিন পরিবেশে এইভাবে যত হতভাগ্য এসে পড়েছে, উপনিবেশ স্থাপয়িতারা তাদের দাসত্বের চুক্তিশর্তে আবদ্ধ করেছেন। প্রথম

দিকে আজীবন দাসত্বের চুক্তিবন্ধ করা হত। পরে চার থেকে সাত বছর দাসত্বের দাসখত লিখিয়ে নেওয়া হত। মেয়াদী চুক্তি অন্তে তাদের স্বাধীন-ভাবে বসবাসের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

এইভাবে বেসরকারী উদ্যম ও প্রচেষ্টায় আমেরিকায় বেশ কয়েকটি উপ-নিবেশ গড়ে ওঠে। মূল উপনিবেশ থেকেও পরে আরও কয়েকটি পত্তন হয়েছে।

আমেরিকার গোড়াপত্তনেব ইতিহাসে অর্থনৈতিক কারণের প্রাধান্য থাকলেও তার পাশাপাশি ভিন্ন কারণও কাজ করেছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর ইয়োরোপের ধর্মীয় বিবোধ-বিসম্বাদ, রাজনিগ্রহের ভীতি এবং যুদ্ধবিগ্রহের বিভীষিকা নতুন দেশের প্রসার ও পুরিপুষ্টির প্রভূত সাহায্য করেছে। ধর্মা-চরণের স্বাধীনতাব আগ্রহে বিভিন্ন সময়ে বহু ইংবেজ পিউরিটান (গোঁড়া নিষ্ঠাচারী), ধর্মভীরু শান্তিবাদী কোযেকাব এবং আতঙ্কিত ক্যাথলিক যেমন নতুন উপনিবেশে এসেছে, ঠিক তেমনি বাজ নিগ্রহেব ভয়েও বহু লোক সাগর পাড়ি দিয়েছে।

মোটামুটিভাবে এইটুকুই প্রথম দিককার অতলান্তিক সৈকতের তেরোটি উপনিবেশের গোড়াপত্তনের কাহিনী। অফুবন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করে, বিশাল দেশের অভ্যন্তরে অবাধে দুঃসাহসী অভিযান চালিয়ে অতি দ্রুত এই নতুন বসতি সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যায়।

নতুন দেশের ভৌগোলিক পবিবেশের পার্থক্য এবং নতুন বসিন্দাদের সাবেক ধ্যান-ধারণার বিভিন্নতা তাদেব সমস্টি-জীবন রূপায়ণে সুস্পষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি করে। প্রতিটি উপনিবেশে গড়ে ওঠে অন্য-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন। প্রথম থেকেই প্রতিটি উপনিবেশে বৃটিশ আইন ও শাসন-বিধি চালু ছিল। ইংলণ্ডেশ্বরের আনুগত্যও স্বীকার করত সবাই। তবু প্রতিটি উপনিবেশ কার্যত ছিল সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনাধীন সতন্ত্র অঞ্চল। তখন পর্যন্ত নতুন জাতীয়তার আদর্শ দানা বেঁধে ওঠেনি। আঞ্চলিক প্রীতি, নিজ নিজ উপনিবেশেব প্রতি আনুগত্য বসিন্দাদের মনে বেশী সাড়া জাগাত। উপনিবেশে উপনিবেশে রেষা-রেষি বাদ-বিসম্বাদের অন্ত ছিল না। নয়া ইংলণ্ড নামে পরিচিত উত্তরাঞ্চলের উপনিবেশসমূহের বাসিন্দারা ঘৃণা করত দক্ষিণাঞ্চলেব অভিজাত প্লান্টাবদের। আবাব দক্ষিণাঞ্চলের তামাক ব্যবসায়ী প্লান্টার ভূস্বামীরা নয়া-ইংলণ্ডের বসিন্দাদের ইতর চাষা বলে মনে করত।

উত্তরাঞ্চলের পিউরিটানদের গোঁড়ামি মধ্যাঞ্চলের উপনিবেশে পাত্তা পায়নি। এখানকার সমাজজীবন ছিল বৈচিত্র্যময় এবং সহনশীল। ইংরেজেতর বসিন্দারাও এই অঞ্চলেই ভীড় করেছে সব চাইতে বেশী। ধর্মভীরু শান্তিবাদী কোয়েকারদের প্রভাবে এবং বহু জাতির মিলনতীর্থ বলে বহু ভাবধারা, বহু ভাষা এবং বহুল বৃত্তি এখানে পাশাপাশি বেড়ে উঠেছে। বহু জাতি, বহু ভাষার মিলনতীর্থ নিউইয়র্ক মধ্যাঞ্চলের আদর্শপ্রতীক।

উপনিবেশে উপনিবেশে এত পার্থক্য এবং ঝগড়া-ঝঞ্ঝাট সত্ত্বেও কয়েকটি বিষয়ে নতুন বসিন্দারা একমত ছিল। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার এবং দেশের অভ্যন্তরে সম্প্রসারণের অধিকারের প্রশ্নে কোন উপনিবেশই ভিন্ন মত পোষণ করত না।

বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টের নীতির ফলে যখন এই অধিকার সংকোচের শংকা উপস্থিত হয়, আমেবিকাব বাসিন্দাদেব মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিল। প্রথম দিকে বৃটেনের কোন সুসংবদ্ধ কিম্বা সুস্পষ্ট ঔপনিবেশিক নীতি ছিল না। অস্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ভারতবর্ষে ও আমেরিকায় ফরাসী শক্তিকে ঘায়েল করে, সাম্রাজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বীর শংকামুক্ত বৃটেন আমেরিকায় অধিকতর কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর হয়ে উঠল। বিভিন্ন দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য কবে, করভাব চাপিয়ে, পশ্চিম দিকে উপনিবেশেব সম্প্রসারণের পথে বাধা-নিষেধ আরোপ কবে সে আমেবিকাকে নিয়ন্ত্রণাধীনে আনবার সুস্পষ্ট সাম্রাজ্যিক নীতি অবলম্বন করস। আমেবিকার বসিন্দাদের মধ্যে তুমুল আলোড়ন দেখা দিল। কর বিরোধী আন্দোলনেব মধ্য দিয়ে মুক্তি আন্দোলন প্রসার ও পরিপুষ্টি লাভ করতে লাগল। কব-ভারের চাইতে কর সংশিলষ্ট রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক প্রশ্ন প্রাধান্য লাভ করল। আমেরিকাব পক্ষ থেকে দাবী করা হল যে একমাত্র আমেরিকার প্রতিনিধিদেরই অধিকাব আছে আমেরিকার উপর কবধার্য করবার। তাবা বল্লে, ইংলণ্ডেব রাজা মাসাচুসেটসেরও রাজা। কিন্তু বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টে যেহেতু উপনিবেশের কোন প্রতিনিধি নেই, কমন্স সভার কোন এক্তেয়ার নেই আমেরিকার উপর কর ধার্য কববার কিম্বা আমেরিকা সম্পর্কে কোন আইন পাশ করবার। কর বিরোধী আন্দোলনের এই রাজনৈতিক ধ্বনি বহু আমেরিকানকে টেনে এনেছে মুক্তি-সংগ্রামের পতাকা তলে।

উপনিবেশের প্রতিরোধ আন্দোলনের তীব্রতায় বৃটেন মাঝে মাঝে পিছু হটেছে, থমকে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু নীতি ত্যাগ কবেনি। আমেরিকাব ব্যাপারে বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টের হস্তক্ষেপে বিক্ষুব্ধ বসিন্দাদের মধ্যে প্রতিরোধ আন্দো-

নের কর্ম্মপন্থা সম্পর্কে একমত ছিল না। একদল ছিল আপোষপন্থায় বিশ্বাসী। আমলাতন্ত্র, কোয়েকারদের অনেকে, বহু ব্যবসায়ী (বিশেষতঃ মধ্যাঞ্চলের) চরমপন্থার বিরোধী ছিল। কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ সশস্ত্র বিদ্রোহে বিশ্বাসী চরমপন্থী দেশপ্রেমিকদের দলে ছিল দরিদ্র, বৃত্তিজীবী শ্রেণী, দক্ষিণের প্লান্টার ভূস্বামীরা এবং বহু ব্যবসায়ী। আমেরিকান বিপ্লব প্রসঙ্গে যাদের নাম অবিস্মরণীয় হয়ে আছে, সেই আদমস, জেফারসন, হ্যানকক, টম পেইন, ফ্রাঙ্কলিন, ডিকিনসন এবং ওয়াশিংটন ছিলেন এই চরমপন্থী দলে। শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী চরম পন্থীদেরই জয় হল। রাজভক্ত আপোষপন্থীরাই আমেরিকার ইতিহাসে টোরী নামে পরিচিত।

চরম অবস্থা দেখা দিল, বৃটেন যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে চা ব্যবসায়ের অধিকার দিল। এই একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে সর্বত্র বয়কট আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। কোম্পানীর এজেণ্টরা অন্যত্র পদত্যাগ করল কিন্তু বোস্টনের এজেণ্টরা রাজশক্তির সাহায্যে চা খালাস করবার জিদ ধরল। সামুয়েল আদমসের নেতৃত্বে দেশ-প্রেমিকেরা জাহাজে চড়ে চায়ের বাক্স জলে ফেলে দিল। বোস্টন ও মাসাচুসেটস উপনিবেশ প্রথমাবধি প্রতিরোধ আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এইবার তাদের শায়েস্তা করবার জন্য বৃটিশ গবর্নমেণ্ট বোস্টন বন্দর অবরোধ করে মাসাচুসেটসের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক আইন জারী করলেন। আইন প্রয়োগের জন্য বোস্টনে একটি বৃটিশ গ্যারিশন মোতায়েন করা হল। দেশপ্রেমিকেরা সশস্ত্র প্রতিরোধের তোড়জোর শুরু করল। লেকসিংটন গ্রাম ও কনকর্ড শহরে আমেরিকান বিপ্লবের প্রথম শোণিতপাত হল। লেকসিংটন ও কনকর্ডের এই গুলীর আওয়াজ সারা আমেরিকায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল। সমস্ত উপনিবেশে মুক্তি যুদ্ধের সাড়া পড়ে গেল।

সাধারণ বিপদের সম্মুখে, সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে তারা একসাথ হল, একজোট হল, কিন্তু একমত বা একপ্রাণ হতে পারল না।

প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন উপনিবেশের ঐক্য বেড়ে ওঠে। স্ট্যাম্প আইনের প্রতিবাদে নয়টি উপনিবেশের প্রতিনিধি নিউইয়র্কে মিলিত হয়ে সম্মিলিত প্রতিবাদ জানায় (অক্টোবর, ১৭৬৫)। দমনমূলক আইনের প্রতিবাদে ফিলাডেলফিয়ায় প্রথম মহাদেশীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয় ১৭৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। লেকসিংটন ও কনকর্ডের ঘটনার পর একমাস যেতে না যেতেই এই শহরেই দ্বিতীয় মহাদেশীয় কংগ্রেস মিলিত হয় (মে, ১৭৭৫)।

এই কংগ্রেস থেকেই গোলামির পরিবর্তে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণবলি দেবার উদাত্ত আহ্বান জানান হয়, কর্ণেল ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে মহাদেশীয় মুক্তি ফৌজ গঠন করা হয় এবং ১৭৭৬ সালের জুলাই মাসে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। দীর্ঘ ছয় বছর যুদ্ধ চলে। ১৭৮১ সালে কর্নওয়ালিসের আত্মসমর্পণে যুদ্ধ শেষ হয়। আমেরিকা স্বাধীনতা লাভ করে।

আমেরিকার মুক্তিযুদ্ধের এই দীর্ঘ ইতিহাসের প্রথম আটমাসের ঘটনা অবলম্বনে গড়ে উঠেছে অপরাজিতের কাহিনী। ফাস্টের ভাষায়, 'শেষ কথা দিয়েই অনেক বই শেষ করা হয়। এখানে সে-রীতির ব্যতিক্রম আছে। যে রক্তমাখা পায়ের মিছিল ট্রেনটনের দিকে এগিয়ে যায়, সেই মিছিলের পদশব্দ বজ্রনির্ঘোষে দুনিয়ার বুকে প্রতিধ্বনিত হয়েছে।' গ্রন্থকার তার পুনরুক্তি না করেই উপন্যাস শেষ করেছেন।

আনভ্যাঙ্কুইস্‌ট্‌ (অপরাজিত) বাংলা সাহিত্যে হাওয়ার্ড ফাস্টের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। আজকের আমেরিকার অন্যতম প্রতিভাশালী এই প্রগতিশিল্পী বাঙালী পাঠকের কাছে সুপরিচিত হলেও, বাংলা পাঠকদের সঙ্গে সে পরিচয় তাঁর নেই। কাজেই ফাস্টের সামান্য পরিচয় দিয়ে আমার কথা শেষ করব।

নিউইয়র্ক শহরে ফাস্ট জন্মগ্রহণ করেন ১৯১৪ সালের ১১ই নভেম্বর। স্কুলের পড়া শেষ করে, কলেজে না ঢুকে তিনি বাড়ী থেকে পালিয়ে যান দক্ষিণাঞ্চলে। কিন্তু কিছুদিন পরেই নিঃস্ব হয়ে ফিরে আসতে হয়। তারপর চিত্রশিল্পী হবার আশায় ভর্তি হলেন ন্যাশনাল একাডেমি অফ ডিজাইনে। দু'বছর পরেই বুঝতে পারলেন যে চিত্রশিল্পী হবার সম্ভাবনা তাঁর কোনকালেই নেই। তখন সব ছেড়েছুড়ে দেন। সেই থেকে জীবিকা অর্জনের জন্য তিনি অনেক কিছুই করেছেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের যত্র-তত্র ঘুরে বেড়িয়েছেন। এই সময় হামেশাই তিনি লিখতেন। মাত্র ঊনিশ বছর বয়সে (১৯৩৩) তাঁর প্রথম উপন্যাস, 'টু ভ্যালিজ' প্রকাশিত হয়। আমেরিকার মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকের সীমান্ত কাহিনী নিয়ে লেখা তাঁর এই উপন্যাস প্রকাশিত হবার পর ফাস্টের জীবনের মোড় ঘুরে যায়। সাহিত্য-সাধনাকে তিনি জীবনের প্রধান বৃত্তি বলে গ্রহণ করেন এবং অচিরেই আমেরিকার সাহিত্য জগতে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

ফাস্টের ঐতিহাসিক উপন্যাসে আমেরিকানরা এক নতুন ধারার সন্ধান পেল। ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে কুড়িয়ে অতীতের রক্তমাংসে গড়া মানুষ-

গ্লোকে তিনি বাঁচিয়ে তুললেন সমকালীন পরিবেশে। আজকের মান্ষ নতুন করে চিনতে পারল সেকালের সাচ্চা মান্ষগ্লোকে। মান্ষের প্রতি গভীর মমতা, দরদ ও অকৃত্রিম ভালবাসার প্রলেপে সেকালের মান্ষের সঙ্গে আজকের মান্ষের নতুন আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হল। আনভ্যাঙ্কুইস্ট্ (অপরাজিত), ফ্রীডম বোড্, লাস্ট ফ্রন্টিয়ার, কনসিভড্ ইন লিবার্টি, সিটি-জেন টম পেইন এবং স্পার্টাকাস্, ফাস্টের এই ঐতিহাসিক সাহিত্য সাধনার উজ্জ্বল নিদর্শন। সাচ্চা ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর উপন্যাসে দেখতে পাই সেকালের সাচ্চা মান্ষগ্লোকে।

কিন্তু ফাস্ট শ্ধ্ ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখকই নন। ছোট গল্প, প্রবন্ধ-সাহিত্য ও শিশ্-সাহিত্য রচনাতেও তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এই বহুম্খী শিল্পীর বই আজও আমেরিকায় বিশেষ সমাদর ও বহুল প্রচার লাভ করে। বিদেশেও ফাস্টের অন্রাগীদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।

নিজের জীবন ধারা সম্পর্কে তিনি নিজেই চমৎকার এক ফিরিস্তি দিয়ে-ছেন। 'লেখা, ব্রিজ খেলা, সবকিছ্ ছেড়ে ছ্ড়ে চুপ করে থাকা, পাহাড়ে চড়া, আমেরিকান বিপ্লব, আড্ডা মারা, মাছ ধরা, মদ খাওয়া, ছবি আঁকা এবং খাওয়া-দাওয়া'—এ-ই নাকি তাঁর জীবন!

কিন্তু এ ছাড়াও ফাস্টের ভিন্ন পরিচয় আছে। ফাস্ট শ্ধ্ শিল্পীই নন, তিনি শান্তি সৈনিক, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের শিবিরের অন্যতম যোদ্ধা। সাহিত্যকে তিনি জীবনসংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন মনে করেন বলেই তাঁকে দেখতে পাই আমেরিকার শান্তি-সৈনিকের প্রোভাগে, গণতন্ত্র ও গণ-স্বাধীনতার শিবিরে। আমেরিকার ফাসিস্তশক্তি যখন নিগ্রো-নির্যাতনের নৃশংসতায় মেতে ওঠে, তখন সাহিত্যিক ফাস্টের লেখনী-ম্খে শ্ধ্ 'পিকস্কিলঃ ইউ, এস, এ' সৃষ্টি হয় না, নিগ্রোদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তিনি সংগ্রাম করেন সমানাধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সেই অভিজ্ঞতা থেকে সৃষ্টি হয় সাহিত্যের।

পাণ্ডুলিপি সংশোধনে বন্ধ্বর রবি ভট্টাচার্যের যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। সে ঋণ স্বীকার না করলে অন্বাদ প্রসঙ্গ অসমাপ্ত থেকে যায়।

১লা ফাল্গ্ন, ১৩৫৯ **প্রফুল্ল চক্রবর্তী**

প্রথম পর্ব

ব্রুকলিন

ভার্জিনিয়ার ভদ্রলোক

গা-পোড়ান গরম ঘরের মধ্যে। গরম জলের ছ্যাঁকা লাগ্‌ছে মনে হয়। তিন তিনটে জানালা ও কপাট খিল দেওয়া। গুমটের তাত তাই আরও বেড়েছে। ঘুমের ব্যাঘাত কোন কালেই তাঁর বড় একটা হয় না। কিন্তু আজ সব চেষ্টাই ব্যর্থ হচ্ছে। ঘুম নেই। তন্দ্রায় চোখ জড়িয়ে আসে, তবু উশখুশ ক'রে ঘামে-ভেজা বালিসের উপর এপাশ-ওপাশ করে কাটাতে হচ্ছে। স্মৃতিলোকে আবর্তিত হচ্ছে বহু ছায়াছবি, নানা কথা ঘুরপাক খাচ্ছে মাথার মধ্যে। পলকেব জন্য কোন কোনটা হয়ত মানসপটের সমুনে এগিয়ে আসে, আবার পরক্ষণেই হারিয়ে যায়। চিন্তার এই আনাগোনা ভীড় ঠেলাঠেলি একেবারে সরিয়ে দিয়ে তিনি ঘুমোতে চান্‌ জোর করে চোখ বুজে মট্‌কা মেরে পড়ে থাকেন ঝিমোন ; তবু কোথায় ঘুম? স্মৃতিপটে জেগে থাকে অস্বস্তিকর এক বেদনার অনুভূতি।

বিছানার পাশে ঝুল-কালি মাখা ঢাকনির মধ্যে মোম বাতিখানা জ্বলে যাচ্ছে। সেই নিভু-নিভু অস্পষ্ট আলোকেও ঘড়ির কাঁটা মালুম হয়। বারবার ঘড়ি দেখ্‌ছেন তিনি। একটা দেড়টা ..দুটো...। মিনিট দশেক পরেই মনে হয় এখন নিশ্চয়ই পাঁচটা হবে। বাতি নিভে না যাওয়া পর্যন্ত চ'লল এই বার বার ঘড়ি দেখা।

সে রাত্রে সহসা একবার ঘুম ভেঙে তাঁর কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। কেমন একটা ছম্‌ছমে ভাব। গায়ের ঘাম যেন ঠাণ্ডা হয়ে এল। আচম্‌কা শিউবে উঠ্‌লেন তিনি. মুখ ভরতি ব্রণের দাগ হাতড়ে হাতড়ে আত্মস্থ হবার চেষ্টা করলেন। নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে চোখ পাকিয়ে তাকাতে লাগলেন কোথাও কিছু দেখা যায় কি না! কিছুই নজরে আসে না। এ অন্ধকারেব শেষ নেই। জানালা-কপাটে কষে খিল-আঁটা, তার কোনো ফাঁক দিয়ে ক্ষীণতম আলোর ঝিলিকও মালুম হয় না। আবার তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার নিজের নাক-কান-চিবুক-কপাল, ব্রণের দাগগুলো ও পাত্‌লা চুলে হাত বুলোতে লাগলেন। আজ তাঁর বোধশক্তিও লোপ পেল নাকি? নিজের নাকটাকে মনে হচ্ছে বিরাট কিছু, ব্রণের দাগগুলো লাগছে গভীর

গর্তের মত আর চিবুকটাকে মনে হচ্ছে কিম্ভূতকিমাকার একটা কীলকের মত।

পাশ ফিরে গায়ের কম্বলখানা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন; তারপর সহসা 'পাত্সি, পাত্সি' বলে কঁকিয়ে উঠে ভেজা বালিশে মুখ চেপে উপুড় হয়ে পড়ে রইলেন।

ঊষার পাণ্ডুর ছটা চুঁইয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকতেই আবার তাঁকে দেখা গেল। আগেই ঘুম ভেঙেছে। ছড়ান-উল্টান বিছানার উপর বসেছিলেন তিনি। ভাঁজ পড়া নাইট শার্টটা হাঁটুর উপরে কুঁচকে আছে। অস্থিসার লম্বা পা' দুখানা দেখে কাকতাড়ুয়ার ঠ্যাং-এর কথা মনে পড়ে। রাত্রে ঘুম হয়নি বলে তাঁকে বিশ্রী উস্কোখুস্কো, আরও অবসাদ-ক্ষিন্ন কৃশ বলে মনে হচ্ছে। পাছা ঘষে ঘষে বিছানার পাশে এসে তিনি লম্বা ঠ্যাং বাড়িয়ে মেজেয় চটিজোড়া খুঁজতে লাগলেন। নরম ফেল্টের চটি আঙুলে ঠেক্তেই একটু কোমর বাঁকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। এমনিভাবে খাড়া হয়ে দাঁড়ান খুব লম্বা লোকের একটা সহজাত অভ্যাসের মত। হাই তুলে দুই একটা আড়মোড়া দিয়ে তিনি জানালার কাছে গিয়ে খিল খুলে দিলেন। বাইরের হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা। মিনিট কয়েক সেই শরীর-জুড়ান স্নিগ্ধ হাওয়ায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তখনও অরুণোদয় হয়নি। উদয়াচল সবে ফর্শা হয়েছে মাত্র। দিন ভাল যাবে কি যাবে না এখুনি বলা যায় না। তবে আবহাওয়া যাই হোক,—রোদ উঠুক কি ক্ষুব্ধ ঝড়ো মেঘে আকাশ ছেয়ে থাক, চট্‌চটে অস্বস্তিকর গরমের জ্বলুনি থেকে নিস্তার নেই। গোটা দেশের মধ্যে এই ভ্যাপ্সা গরম একমাত্র নিউইয়র্ক শহরেরই বৈশিষ্ট্য।

সুদূর উদয়দিগন্ত থেকে ক্ষুব্ধ ঝড়ো মেঘের ক্ষীণ গুরু গুরু ডাক কাণে আসছে। খানিকক্ষণ জানালায় দাঁড়িয়ে থেকে আপন মনে তিনি বলে উঠলেন: বৃষ্টি হবেই। ঝড়ো মেঘ, বৃষ্টি, জল, কাদা এর বেশী কিছু চিন্তা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়—এত ঘুম-কাতর ক্লান্ত তিনি। বড় বড় হাতের পাতা দিয়ে চোখ রগড়ে বিছানার চারপাশে কয়েকটা পাক খেয়ে তিনি ধপ করে একটা সরু-পায়ার চেয়ারে বসে পড়লেন। কিন্তু ঠিক হয়ে বস্তে না বস্তেই কড় কড় শব্দে বাজ ডেকে উঠ্ল। এই আচম্কা চড় চড় শব্দ বর্ষণের নয়, বিনাশের ...বজ্রপাতের। চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন তিনি। কোথায় রইল চটি! খালি পায়েই ছুটে গেলেন জানালার কাছে। মুখ বার ক'রে হাঁকলেন—বিলি! বিলি! বিলি!

কণ্ঠস্বর তাঁর তেমন ভরাট বা জোরাল না হলেও বেশ তীক্ষ্ন, ঝাঁজাল। চাবুকের মত কড়া। চটপট মাথার উপর দিয়ে শার্টটা খুলে ফেলে তিনি 'বিলি বিলি' বলে চীৎকার করে উলঙ্গ হয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। হাড়ের উপর চামড়া জড়ান অস্থিসার দেহ। প্রশস্ত কাঁধ, প্রশস্ততর পাছা। তবু এই শীর্ণকায় লোকটির বিশাল দেহের খাঁচা যখন পোশাকের সাজে চাপা পড়ে তখন তাঁকে শক্তিমান বলেই মনে হয়। হন্তদন্ত হয়ে একটি কালো আদমী ঘরে ঢুকতেই তিনি পোশাক নিয়ে আসবার ফরমাস দিলেন।

কালো আদমীটির সাহায্যে পোশাক পরতে পরতে তাঁর উত্তেজনার ভাবটা সহসা কেটে গেল। মেজাজ শান্ত হল। বিছানার পাশে ব'সে নিজেই মোজা, বাফ্ ব্রিচেজ, উঁচু গোড়ালীর বুটজুতো পরে নিলেন। পোশাক পরবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষটা যেন বদলে গেল...জ্ঞানে বুদ্ধিতে শক্তিমান এক বলিষ্ঠ মানুষ হয়ে পড়লেন। মোটা মোটা হাড়ের গিঁঠ যেই সুতির জামা ও কালো ব্রিচেজে চাপা পড়ল অমনিই তাঁর দীর্ঘ শীর্ণ দেহ একটা বিশিষ্ট মানুষের চেহারা পেল। উস্‌কোখুস্‌কো পাতলা লাল চুল তিনি উল্টে আঁচড়ালেন। তখন বিনিদ্র রজনীর সাক্ষী রইল শুধু কটা চোখের ক্লান্ত দৃষ্টি।

এর পর সাদা একটা চীনামাটির পাত্রে হাতমুখ ধুয়ে নীল জ্যাকেটটা পরে নিলেন। এখন যদি মাথার উপর আবার কড়কড় শব্দে বাজ ডেকে ওঠে তাহ'লে তাঁর শঙ্কিত দুরু দুরু কাঁপুনি আঁটসাট উর্দির বন্ধনেই আটকা পড়ে যাবে, বাইরে ধরা পড়বে না।

কামাবেন না স্যার। কালো আদমী জিজ্ঞাসা করে।

পরে হবে।

দু'জন ভদ্রলোক বসে আছেন। কালো আদমী জানায়।

কতক্ষণ? আমায় বলিসনি কেন? কবে আর তোর জ্ঞান-গম্যি হবে বিলি?

মাত্র কয়েক মিনিট হলো তাঁরা এসেছেন।

কয়েক মিনিট কতো মিনিট বিলি? নাঃ, তোর বুদ্ধিশুদ্ধি দেখ্‌ছি দিন দিনই লোপ পাচ্ছে।

বড়জোর মিনিট পাঁচেক হতে পারে স্যার!

দীর্ঘকায় অস্থিসার সামান্য কোলকুঁজো লোকটি বাফ্ ব্রিচেজ্ ও নীল উর্দি পরে এতক্ষণে শোবার ঘর ত্যাগ করলেন। পাশের আরেকটা ঘরের নাম রেখেছিলেন অফিস ঘর। সে ঘরে ঢুকতেই তিনি ঘাড় ঝাঁকানি দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ালেন।

বছর খানেক আগে এই নীল উর্দিই ফিলাডেলফিয়াতে তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল। ফিলাডেলফিয়ায় তখন দ্বিতীয় মহাদেশীয় কংগ্রেসের বৈঠক হচ্ছে। দীর্ঘকায় একটি লম্বামুখো লাজুক ধরণের মানুষ নিখুঁত সাজ-পোশাক পরে চুপচাপ বসে দেখছে শুনছে কিন্তু নিজে 'রা' শব্দটি করছে না। অবশেষে তাঁর এই নীরবতাই বাঙ্ময় হয়ে উঠল। সবাই কথা বলবার জন্য উন্মুখ—কইছেও, কিন্তু এ লোকটি একেবারেই চুপচাপ। সব কিছু ওলট-পালট হতে চলেছে চারিদিকে বিপ্লবের পদধ্বনি...দুনিয়া ভেঙে-চুরে খানখান হয়ে যাচ্ছে এই ছিন্নগ্রন্থি জোড়া দিতে হবে। সহজ কাজ! যেই একজন ইংলণ্ডেশ্বরের কাছে বিনীত আর্জি পেশ করার প্রস্তাব করল, গর্জে উঠলেন জন আদম্স্ঃ 'ধিক্ মূর্খ! আর্জির কথা যারা কল্পনাও করে শত ধিক্ তাদের ক্লীবত্বে!'

বাক্-বিতণ্ডার এই হাঙ্গামা-হট্টগোলের মধ্যে নীল-উর্দি-পরা লম্বা লোকটি কোন কথাই বল্‌ল না। সবই শুন্‌ল। সন্ধানী চোখে সভার সব কিছুই লক্ষ্য করল; কিন্তু ঠোঁট ফাঁক করল না।

—লোকটা কে? মাসাচুসেট্‌সের জনৈক সদস্য জিজ্ঞাসা করে।

—তেমন কেউ-কেটা লোক নয়।

—ঐ যে উর্দি-পরা লোকটা হে!

—হাঁ হাঁ, বলছি তো এমন কেউ-কেটা নয়। লোকটা ভার্জিনিয়ার একজন সম্পন্ন চাষী—নাম ওয়াশিংটন।

—ওয়াশিংটন?

—হাঁ হে, ওয়াশ্-ইং-টন্।

—এমন নাম তো সাত জন্মেও শুনিনি কখনো।

—তাহ'লে কি হবে, ওই ওর নাম। বেশ তালেবর লোক হে।

মাসাচুসেট্‌সের সদস্যটি ঘাড় নেড়ে জানাল—বুঝেছি। নিজেও সে কারবারী। ওয়াশিংটনের পোশাকের দিকে চেয়ে মনে মনে সে দাম কষতে লাগল. .উর্দিটা চল্লিশ পাউণ্ড . লেশ্ পাউণ্ড তিনকে.. জুতোর দামও পাউণ্ড চারেকের কম নয়।

—আচ্ছা, উনি কথা বলেন না? সে জিজ্ঞাসা করে।

—না।

—অমনি ভাবেই ব'সে থাকেন?

—হাঁ।

নামটা আবার মনে মনে আওড়ায় সদস্যটি...। জন আদম্‌স্‌ তাঁর 'তুতো-ভাই সামের দিকে চেয়ে বল্লেন: লোকটিকে আমার পছন্দ হয়েছে।

—কেন?

—জিভ সামাল দিতে জানে বলে।

—হয়তো ওর বলবার মত কিছুই নেই। সাম্‌ বলে।

—নাঃ! যাদের কোন বক্তব্য নেই তারাই বরং সারাক্ষণ বক্‌ বক্‌ করে। কিন্তু ঐ ওয়াশিংটন লোকটা কোন কিছুই বলেনি। অথচ চার চারটে মিলিটারী কমিটির চেয়ারম্যান সে। ভার্জিনিয়ার ওয়াশিংটনের নাম আগে কেউ শোনেনি। তবু লোকে তাঁর উর্দির দিকে তাকায়, চালচলন লক্ষ্য করে, তাঁর রেস্তর গল্প শোনে, তারপর আর কোন কিছু না ভেবে ভোট দিয়ে যায়।

—আচ্ছা কত রেস্ত আছে ওর? সাম্‌ জিজ্ঞাসা করে।

—তা কম নয়! আমেরিকার যে কোন বড় লোকের সমান!

—প্রধান সেনাপতি তাহ'লে...? মুচ্‌কি হেসে সাম্‌ ইঙ্গিত করে।

—কেন নয় বলো? ওর উর্দিপরা আর ঘোড়ায় চড়ার কায়দাটা একবার চেয়ে দেখো না!

আমেরিকার যে কোন তালেবর লোকের সমান হবার অর্থ সামের কাছে সুস্পষ্ট। গণ-বিপ্লবের কথা মনে পড়তেই আস্তে আস্তে সাম্‌ আদম্‌স্‌ বল্লেন: ব্যাপারটা কেউ কেউ হয়ত পছন্দ করবে না।

—উত্তরাঞ্চলের লোকেরা পছন্দ করবে না জানি; কিন্তু দক্ষিণীরা খুশী হবে। উত্তর অঞ্চলকে আমরা দলে ভিড়িয়েছি। এখন দক্ষিণীদের, মোদ্দা-কথায় ভার্জিনিয়াকে আমাদের চাই।

—ওদিক দিয়ে আমি ভাবছি না। সাম্‌ বলেন। —আমি ভাব্‌ছি হানককের কথা। লোকটা নেতৃত্বের জন্য পাগল হয়ে উঠেছে।

—তুমি নিজেও তো প্রার্থী। হাঁ কিনা বলো! চোখ পাকিয়ে ভ্রাতার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন জন আদম্‌স্‌।

—আমার পক্ষে উর্দিপরা সম্ভব নয়। সাম্‌ জবাব দেয়।—তা হ'লেও হানকক্‌কে বাদ দিলে বহুত গোলমাল হবে।

—হয় হোক্‌। আমি ওয়াশিংটনকেই মনোনীত করবো।

সে আজ এক বছরের কথা। বছর খানেক আগেই এই চুয়াল্লিশ বছরের শিয়াল-শিকারী প্লান্টার ও ধনী চাষীর মনোনয়ন-নির্বাচনের পালা শেষ হয়ে

গেছে। তবু আজ অবধি তিনি নিজেকে অসংকোচে জেনারেল বলে মনে করতে পারছেন না।

যে লোকদুটি তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল, নিতান্ত গতানুগতিকভাবে মাথা নেড়ে তাদের সম্ভাষণ জানিয়ে তিনি বক্তব্য জানাবার ইঙ্গিত করলেন। এ দুজনেরও ঘুম হয়নি। ক্লান্তি ও জাগরণে চোখ লাল, মুখ মলিন, জামা ঘামে-ভেজা। জেনারেল পুটনাম তাদের পাঠিয়েছেন, লোকদুটি জানাল।

—বিলি, ভদ্দরলোকদের কিছু খেতে দাও। বার্তাবহদের দিকে ফিরে বললেনঃ বসুন আপনারা। অনেক দূর থেকে এসেছেন—যা গরম! বসুন।

লোকদুটি ঘাব্ড়ে গেছল বলেই তিনি এমন সুস্পষ্ট শ্লেষকটু আপ্যায়ন করলেন। বার্তাবহদের একজনের বয়স আঠারো কি উনিশ বছর। রোগাটে অপর লোকটি ত্রিশ পেরিয়ে গেছে। দুজনেরই পরনে তাঁতে বোনা সাদা-মাটা পুরনো পাত্লুন, গায়ে সুতির শার্ট। পরিচ্ছদের রঙ্ এককালে সাদাই ছিল; ধুলোকাদা মেখে এখন হয়েছে ধুলোট। উভয়েই ক্লান্ত। নোংরা। দুজনেরই জড়সড় কাঁচু-মাচু ভাব। আপ্যায়নের নমুনা দেখে তারা আরও ভড়কে গেল।

বড় আদমী ভাবলেনঃ কাদের দিকে চেয়ে আছি আমি? লেফ্টন্যাণ্ট, ক্যাপ্টেন, মেজর না কর্ণেল?

এই তাঁর পল্টন! বার্তাবহ দুটি ইয়াংকি। আনাড়ীর মত চালচলন; কথা বলে নাকী সুরে নয়া ইংলণ্ডের ছাঁদে। বিরক্তি লুকোবার জন্য হেঁট-মাথায় তিনি কাঠের টেবিলটাব দিকে চেয়ে রইলেন। দৈহিক ভীতি দেখলে তাঁর পিত্তি জ্বলে যেত। এ বিরক্তি ওতপ্রোতভাবে তাঁর সমস্ত সত্তার সঙ্গে জড়িত। রোগ প্রায় তাঁর নিত্যসঙ্গী। মৃত্যুর বিভীষিকার সঙ্গে পরিচয় তাই ঘনিষ্ঠ। তাঁর দৃষ্টিতে ভয় তাই ভীষণ বিভীষিকাময় বাস্তব সত্য। আত্মবিশ্লেষণের বালাই তাঁর ছিল না: আর সেই জন্যই অন্যের ভয়কে তিনি বেদম ঘৃণা করতেন

জেনারেল পুটনামের বার্তাবহদুটির চেহারায় ভয় ফুটে বেরিয়েছিল দিবালোকের মত। বারবার এই ভীতি ধরা পড়েছে তাদের কথা বলবার সময়। ব্রুকলিন থেকে এসেছে ওরা। কেমন করে এলো?

বিস্ময়ে হতবাক বার্তাবহদুটি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। বুঝল না কি তিনি জানতে চান। খুঁটিনাটি? খুঁটিনাটি খবরে কি হবে?

হাজারো খুঁটিনাটি জোড়া দিতে হবে তাঁকে? দুনিয়ার সবকিছু যখন ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে তখন কি হবে নিরর্থক খুঁটিনাটি জেনে?

ডিঙি করে নদী পার হয়েছে তারা। মাঝি পাওয়া গেল না, নিজেরাই বেয়ে এসেছে। আমতা-আমতা ক'রে এই কথাটা বোঝাতে গিয়ে তরুণ বার্তা-বহটি সবকিছু গুলিয়ে বলে বসল উল্টোকথা। বড় আদমী অমনিই খেঁকিয়ে উঠ্‌লেনঃ কখন, কখন রওনা হলি তোরা, গবেট কোথাকার! জবাব দে! পকেট থেকে ঘড়ি বার করে দেখলেন ছ'টা বাজে।

ধমক খেয়ে ছোকরাটি আরও ভড়কে গেল। তারা নিজেরাই বেয়ে এসেছে এবং মাঝি যে তাদের দেওয়া হয়নি একথা প্রতিপন্ন করবার জন্য রোগাটে লোকটি হাতের চেটোর ফোস্কাগুলো দেখাল। কাঁচুমাচুভাবে বল্ল, কখনও নৌকা বায়নি' তারা। মাঝি বা জাহাজীও তারা নয়। আর মাঝিগিরি করবার জন্যও পল্টনে নাম লেখায় নি'। পারঘাটা থেকে এতটা পথ দৌড়ে আস্‌তে হয়েছে। মাঝিগিরি করা আর ভিরমি খেয়ে দৌড়োবার জন্যই কি তারা পল্টনে এসেছে?

—নিকালো, জলদি নিকালো। এখুনি দূর হয়ে যা'। গর্জে উঠলেন শিয়াল-শিকারী।

তারপর টেবিলের কাছে চুপ করে বসে রইলেন। বিলি প্রাতরাশ নিয়ে এল। খোলা জানালা দিয়ে তখন দূরে কামান দাগার গুড়ুম-গুড়ুম বাতাস-কাঁপানো শব্দ শোনা যাচ্ছে।

না, ওদের পর মেজাজ দেখিয়ে ভাল করি নি'—মনে মনে ভাবলেন। হেয়ার স্প্রিংয়ের উপর তাতান লোহা ঠেকালে যেমন ছ্যাঁক্ করে ওঠে, সমস্ত সমতা লণ্ডভণ্ড করে দেয়, তাঁর মেজাজটিও তেমনি। স্বভাবজাত সমস্ত নিষেধ তিনি নিজের মধ্যে কষে বেঁধে রাখতেন। কিন্তু মেজাজের ছোঁওয়া লাগলেই বাঁধন ছিঁড়ে সব তচনচ হয়ে যেত। আজীবন তিনি মেজাজটাকে ঠুকে-পিটে, ঘসে-মেজে পালিশ করে রাখবার চেষ্টা করেছেন। সৈনাপত্য নিয়ে উত্তরে আসবার পূর্ব পর্যন্ত ভেবেছেন, না, হাতুড়ি পিটে শায়েস্তা করে ওকে বশে আনা গেছে; যেভাবে কষে বাঁধা হয়েছে তাতে আর বেয়াড়াপনা করতে পারবে না।

প্রধান সেনাপতিত্ব গ্রহণ করবার পূর্বে শেষবার যেদিন তাঁর মেজাজ বিগড়ে যায় সেদিনকার কথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। বিকেল বেলা। পড়ন্ত

সিঁদুরে রোদে ভারনন পর্বত ঝলমল করছে। ঘোড়ায় চড়ে এক দঙ্গল কুকুর নিয়ে শিকারের খোঁজে বেরিয়েছেন তিনি। শিয়াল, হরিণ, নিদেন একটা খরগোস—যা পাওয়া যায়। কুকুরগুলো সামনে ছড়িয়ে আছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় সবুজের তাজা গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। অশ্বখুড়ে বাজছে সঙ্গীতের তাল। কিসের ঘ্রাণ শুঁকে কুকুরগুলো উতলা হয়ে উঠল ; কিন্তু তিনি রাশ টেনে ধরলেন। দৃষ্টি তাঁর আকাশের বুকে আঁকা এক ঝাঁক উড়ন্ত কালো-পাখীর দিকে। চোখ জুড়োন ছবি। একদৃষ্টে চেয়ে দেখছেন। সহসা নদীতীরে একটা গুলীর আওয়াজ হল। ঝাঁকের দুটো পাখী পাক খেয়ে পড়ে যাচ্ছে মাটিতে, সুনিশ্চিত মৃত্যুর কোলে। চন্ করে মেজাজ চড়ে গেল সপ্তমে আচমকা ব্যাপারখানা দেখে। কি বেআদপ শিকারী! রাগের মাত্রা ক্রমেই চড়ছে। এমনিভাবে হক্-না-হক্ গুলী করা কি শিকারের রীতি! ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ছুটে গেলেন নদীতীরে। খানিকটা দূরে একটা খাড়া পাহাড়ের কাছে ঢালু ডাঙায় ডিঙি রয়েছে একখানা। শিকার কুড়োবার জন্য লোকটি তখন চার হাত-পায়ে সন্তর্পণে চড়ছে ডিঙিতে। খাড়া পাহাড়ের উপর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া নিতান্ত বিপজ্জনক, আত্মহত্যার সামিল। কিন্তু অত কথা ভাব্‌বার সময় কোথায়? বিপদ-পিচ্ছিল ঢালু পথেই ঘোড়া ছোটালেন শিয়াল-শিকারী। লোকটি ততক্ষণে ডাঙা ছেড়ে যাবার চেষ্টা করছে। জলের কিনারে এসে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। বিরাট লম্বা একটা ক্রোধোন্মত্ত লোক রুখে তাড়া করে আসছে দেখে মরিয়া হয়ে লোকটি তাঁকে লক্ষ্য করে গুলী করল। লাগল না। পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে গিয়েই খপ করে তিনি উদ্যত বন্দুকটা ছিনিয়ে নিলেন। তারপর শুরু হল দমাদম প্রহার। আধমরা করে ফেললেন লোক-টিকে। তবুও গায়ের ঝাল মিট্‌ল না। হিড়হিড় করে ডিঙি থেকে টেনে নামিয়ে লোকটিকে জলকাদার মধ্য দিয়ে হেঁচড়ে নিয়ে এলেন ডাঙায়। ভীত ইঁদুর বাগে পেলে কুকুর যেমন তাকে ঝেঁকে-কামড়ে অস্থির করে তোলে গোটা-পথ এই বেচারীর উপরও তেমনি উত্তম-মধ্যম চল্‌তে লাগল।

অতীতের স্মৃতি আদৌ সুখকর নয়। বাগে পেলেই হক্-না-হক্ শিকার করা যাদের অভ্যাস তাদের তিনি ঘৃণা করেন। কিন্তু কারণে-অকারণে যারা মেজাজ হারিয়ে ফেলে তাদেরও তিনি ক্ষমা করতে পারেন না। এই ঘটনার পর সযত্ন পাহারায় অনেকদিন মেজাজ বাগে রেখেছেন। যতদিন পল্টনে যোগ দেন নি, লড়াইকে যতদিন জীবনের একমাত্র কর্তব্য বলে মেনে নেন নি, তত-

দিন এ সংযমের অপহ্নব ঘটেনি। যখন সেদিন এল, কর্ণেলের উর্দি চাড়িয়ে তিনি ভার্জিনিয়ার গণ-সেনাদলে ভীড়ে পড়লেন।

পল্টনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যতদিন হয় নি' সৈনাপত্য লাভের দেমাক তাঁর ঘোচেনি'। কর্তৃত্বের মোহ সবকিছু আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। আজও মনে পড়ে স্ত্রীকে তিনি বল্‌তেনঃ সমস্ত কর্তৃত্বই আমার ওপর ছেড়ে দিয়েছে, জানো পাত্‌সি! কি দেখে দিলো আমি বুঝে উঠ্‌তে পারি না। তবু দিয়েছে। আমার ওপরই সবকিছু ছেড়ে দিয়েছে, বুঝলে?

পরক্ষণে নিজেই আবার বল্‌তেন—না, না, আমি এ-কাজের যোগ্য নই পাত্‌সি! তবু কেন যে ওরা দিলো?

বহুবার এই জিজ্ঞাসা তাঁর মনে জেগেছে। কেন দিল, কেন, কেন?

তবু এই দায়িত্বের গর্বও তাঁর ছিল। আজ তিনি শুধুমাত্র শিয়াল-শিকারী নন—সম্পূর্ণ নতুন মানুষ। উত্তুঙ্গ তাঁর গরিমা। এত বড়, এমন শক্তিমান, এমন মহীয়ান তিনি যে আজ তাঁর ছ' ফিট আড়াই ইঞ্চি দীর্ঘ চেহারা, তাঁর ভাবলেশহীন প্রশান্ত কটা চোখের দিকে চেয়ে কেউ সংশয় প্রকাশ করবে না যে অবতারের মত তিনিই এই দায়িত্ব বহনের একমাত্র যোগ্যতম ব্যক্তি নন্। কথাবার্তা তিনি কমই বল্‌তেন। তবু হাবভাবের হাল দেখে মনে হ'ত, ঠিক্‌মত কাজ ক'রবার কায়দা তাঁর করায়ত্ত। সাধারণ লোকের এই প্রত্যয় তাই সংশয়াতীত। কল্পনাতীত বক্‌শিশ্ পেলে বালক যেমন আহ্লাদে আত্মহারা হয়ে পড়ে তিনিও তেমনি বারবার নিজের মনে আওড়েছেন—তাহলে আমার উপরই এই দায়িত্ব ছেড়ে দিলো? সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছে সেদিনকার কংগ্রেসের কথা। স্মরণীয় সে অপরাহ্ণ। প্রধান সেনাপতির কি কি গুণ থাকা দরকার জন আদম্‌স্ বোঝাচ্ছেন। সবাই ধরে নিয়েছে হানক্‌কই আদম্‌সের বক্তৃতার লক্ষ্য। আদম্‌সের মুখে নিজের গুণগাণ হচ্ছে মনে করে হানক্‌ক বেচারী সলজ্জ বিনয়ে বিব্রত বোধ করছে। কতকটা সঙ্কোচে, খানিকটা আনন্দে, হে'ট মাথায় এক একবার উস্‌পিস্ করছে; আবার অর্থ-হীন মুচকি হেসে ঠোঁট কামড়াচ্ছে মাঝে মাঝে। তারপর এল চরম মুহূর্ত। মোরগের মত ঘাড় বাঁকিয়ে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বল্লেন আদম্‌স্ঃ ভদ্রমহোদয়-গণ! আমি জানি এসব গুণপনা সুদুর্লভ। তবু আমরা এও জানি, আজ-কের এই সংকটে প্রধান সেনাপতির মধ্যে এই সব গুণাবলী থাকা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু কেউ যদি একথা বল্‌তে চান যে, এদেশে এমন গুণী মিল্‌বে না, তার জবাবে আমি বলি—অবশ্যই মিল্‌বে। আমাদের নিজেদের

'মধ্যেই তিনি রয়েছেন। আর আমি সেই লোক, ভার্জিনিয়ার জর্জ ওয়াশিংটনকেই মনোনীত করছি।'

সভায় যেন বোমা ফাটল। পলকের মধ্যে হানককের মুখ ভাব-ব্যঞ্জনাহীন জড়পিণ্ডে পরিণত হল। অমন চট করে কোন প্রতিক্রিয়া ভার্জিনিয়াবাসীর হল না। অপলক দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন তিনি হানককের বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখের দিকে। কয়েক মুহূর্ত পরে অস্পষ্ট অর্থহীন এক টুকরো স্মৃতির মত যেন তাঁর নাম উচ্চারিত হয়েছে বলে মনে হল। কোনমতে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তখনও চোখ তাঁর আশাহত বেচারী হানককের দিকে। তারপর পেছন ফিরে হল থেকে বেরিয়ে গেলেন অপরাধীর মত মাথা হেঁট করে।

এর খানিক পরে একটু একটু করে আত্মশ্লাঘা দানা বেঁধেছে তাঁর মধ্যে। যতদিন পল্টনের সঙ্গে দেখাশুনা হয়নি যতদিন চোখে দেখেননি বোস্টনের চারপাশে ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত নয়া-ইংলণ্ডের ঝগড়াটে আর কুচুটে লড়িয়েদের দেখেননি বৃটিশদের অবরোধকারী সংগ্রামীদের সব কিছুতে নাক গলাবার বদ্‌স্বভাব শোনেননি তাদের ইয়াংকি ছাঁদে ভব্যতাবর্জিত কথা বলার ঢং.. এই দেমাক তাঁর পুরাদস্তুর ছিল। যখন এই পরিচয় হল, মেজাজের দশা হল শতচ্ছিন্ন এক টুকরো কাপড়ের মত।

প্রাতরাশ খেতে খেতে তিনি পুটনামের সংবাদ পড়লেন। আজ ভোরেই শুরু হয়েছে লড়াই। গতিক মোটেই সুবিধার নয়। গতিক যে সুবিধার নয় পুটনাম শুধু সেইটুকুই জানিয়েছেন। অসুবিধা কতটা লেখেননি। নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে যতটা দেখা সম্ভব তার বেশীকিছু তিনি দেখতে পাননি। সমস্ত ব্যাপারটা তাই তালগোল পাকিয়ে দুর্বোধ্য ঠেকছে। তাহলেও গতিক যে ভাল নয়—এ জিনিসটা সুস্পষ্ট।

আরও লোক চেয়ে পাঠিয়েছেন পুটনাম। হতাশার ভাবে মাথা নাড়লেন ভার্জিনিয়ান। এমন দশা কি করে হয়? কেক আর মধুর দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে নিশ্চল পাষাণ মূর্তির মত বসে রইলেন ওয়াশিংটন। ওদিকে ব্রুকলিনে তাঁর সেনাদল লড়াই করছে। তেরটি উপনিবেশের সম্মিলিত বাহিনী পহেলা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছে; আর এদিকে তাদের প্রধান সেনাপতি ভিজা চটের বাণ্ডিলের মত অকেজো হয়ে বসে আছেন খাবার টেবিলে। কিছু করবার নেই কোন চিন্তা নেই. কোন সমাধান নেই। শুধু আছে এক বিভীষিকাময় আতঙ্ক—নিজের তৈরী ফাঁদে পড়ার নিদারুণ ভয়।

অসাধারণ তাঁকে বলা যায় না। আহা-মরি করবার মত যোগ্যতার অভাব ছিল। এমন কি কল্পনায় যে ছবি তিনি আঁকতেন তাও ছিল নিতান্ত আটপৌরে, গতানুগতিক। নিজের ফৌজ সম্পর্কে যে ধারণা তাঁর ছিল বাস্তবের সঙ্গে তার তফাৎ বহুত। উপনিবেশের আজাদীর জন্য যে ফৌজ লড়াই করবে আদপে সে ফৌজ যে কী, সে ধারণা তাঁর আদৌ ছিল না। এই আজাদী ফৌজের যা হওয়া উচিত ছিল, নিজের পল্টন সম্পর্কে তিনি সেই ধারণাই পোষণ করতেন। ভেবেছেন, সহস্র সহস্র একই ধাঁচের উর্দিপরা জওয়ানের এক সুশৃঙ্খল বাহিনী এঁকে বেঁকে মার্চ করে এগিয়ে যাবে—আক্রমণ করবে—দুশমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, আবার প্রয়োজন হলে পিছু হটে আসবে ; আর তিনি নিজে ঘোড়ায় চড়ে তাদের তদবির তদারক করে বেড়াবেন। একেই না বলে পল্টন!

কিন্তু কল্পনা আর বাস্তবে কি গুরুতর বৈসাদৃশ্য! বোস্টনে দেখেছেন গোটা ইয়াংকি রেজিমেণ্টের মধ্যে কারও উর্দি ছিল না। তারপর খাওয়া আর ঘুমানোর কুড়েমি ছাড়া সুবিধা পেলেই মিথ্যা কথা বলা এবং কুচুটেপনায় তারা অদ্বিতীয়।

অথচ পুটনাম আজ এই ইয়াংকিদেরই চেয়ে পাঠিয়েছেন। আরও ইয়াংকি চাই। উপায় কি? লড়াই শুরু হয়ে গেছে। কঠোর তার দাবী। যখন যা চাই দিতেই হবে। চুলচেরা বিচারের ফুরসৎ কোথায়?

হাঁ, লড়াই বেঁধেছে নদীর ওপারে ব্রুকলিনে। মানুষে মানুষ খুন করছে, মরছে, মারছে, আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করছে, অভিসম্পাত দিচ্ছে, খিস্তি-খেউড় করছে পরস্পরকে, কেউ মরেছে—কেউ মরছে—কেউ বা পালাচ্ছে প্রাণ-পণে। তবু ক্ষান্তি নেই। মরচে-ধরা গাদা বন্দুক উঁচিয়ে তথাপি হত্যা করতে চাইছে পরস্পরকে। কিন্তু প্রধান সেনাপতির প্রাতরাশের টেবিলে এই নির্মম হানাহানির বালাই নেই। শুধু কামানের গুড়ুম-গুড়ুম আওয়াজ যেন ক্রমেই এগিয়ে আসছে বলে মনে হচ্ছে।

বৃটিশ নৌবহর বোস্টন শহর ছেড়ে যাবার পর ওয়াশিংটন তাঁর পল্টন নিয়ে এসেছেন নিউইয়র্কে। তখন এ সিদ্ধান্ত খুব স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছে। বোস্টন থেকে ইংরেজদের যেভাবে খেদান হয়েছে তাকে মস্ত বড় জয় বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। তিনি সৈনাপত্য গ্রহণ করবার পর উল্লেখ-যোগ্য তেমন কোন লড়াই হয়নি। তাছাড়া শহরের আশেপাশে জমায়েৎ হাজার হাজার নয়া-ইংলণ্ডের চাষী আদবে কোন সৈন্যবাহিনী কিনা ইংরেজরাও

ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। যাহোক্, বোস্টনের জন্য এমন কোন গরজ ইংরাজ দেখায় নি—ছেড়েছুড়ে চলে এসেছে।

কিন্তু নিউইয়র্ক আলাদা জিনিস। হাড্সন নদীর মোহানার এই শহরটিতে রয়েছে গোটা ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের চাবিকাঠি। এ যেন সিংহ-দ্বার। আজ নিউইয়র্ক যার করায়ত্ত গোটা আমেরিকা তার হাতের মুঠোয় আস্‌তে পারে। অন্ততঃ ওয়াশিংটন তাই ভাবতেন। আর সবাই ভেবেছে অন্যকথা। তারা নিউইয়র্ককে মনে করেছে মরণ-ফাঁদ। মানচিত্র দেখিয়ে বলেছেঃ শহরের গড়নটা লক্ষ্য করুন! এর কোন্ দিক রক্ষা করবেন? মানহাট্টান? দুপাশে নদীঘেরা আঙুলের মত ঐ ফালিটুকু? মোহানার মুখে প্রতিরোধ করতে চান? নদীর উজানে জাহাজ নিয়ে এসে ইংরেজরা স্রেফ্ কেটে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। আর কোন্ জায়গায় প্রতিরোধ করবেন? লং দ্বীপে? ওই জলঘেরা আঙুলের ফালিরও ভরসা যতক্ষণ ইংরেজরা জাহাজ না নিয়ে আসে। স্ট্যাটেন দ্বীপের কথা ভাবছেন? তার বিপদ আরও বেশী।'

ওয়াশিংটন একমত হতে পারেন নি। মাথা নেড়েছেন। কংগ্রেস তাঁর পক্ষে। কংগ্রেস চেয়েছে শহরটি দখলে রাখা হোক্। কংগ্রেস যখন চেয়েছে তখন তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেই হবে! নিজেকে তিনি কংগ্রেসের অনুগত সেবক বলেই মনে করেন। এজন্য গর্বও আছে। তাঁর দৃষ্টিতে কংগ্রেস আর পুরাকালের রোমের সেনেট সভা অভিন্ন। তাছাড়া তাঁর হাতে বিশ হাজার সৈন্য আছে। হ'তে পারে তাদের অধিকাংশই ইয়াংকি—হতে পারে তারা গেঁতো কর্ম-ভীরু নামসর্বস্ব গণ-সেনা; তবু সংখ্যায় তারা বিশ হাজার। নিউইয়র্ক আসবার পথে মাইলের পর মাইল তারা খেয়াল খুশীমত বিক্ষিপ্তভাবে পথ চললেও তারা আর্মি, জনতা নয়।

আর আজ? পুটনাম আরও সৈন্য চেয়ে পাঠিয়েছেন; সংবাদ দিয়েছেন গতিক মোটেই সুবিধার নয়। সব কিছু বানচাল হবার উপক্রম হয়েছে। সর্বনাশ শিয়রে। লং দ্বীপ বরাবর আগু বেড়ে বৃটিশ নৌবহর ইতিমধ্যেই ব্রুকলিনে মোতায়েন আমেরিকান বাহিনীর অর্ধেক ঘেরাও করে ফেলেছে। বাকী অর্ধেকের অবস্থাও সঙ্গীন। নিউইয়র্কে যে অর্ধেক রয়েছে তারাও ফাঁদে পড়ল বলে। ইস্ট নদী ধরে বৃটিশের বাকী রণতরী ক'খানা এগিয়ে আস্‌তে যতটুকু দেরী। ব্যস্ তাহ'লেই দাম্ভিক হঠকারী এক ভার্জিনিয়ার ভদ্রলোকের নেতৃত্বে পরিচালিত এই বিপ্লবের প্রহসন খতম হয়ে যাবে।

পয়লা লড়াই

কখন আঘাত হানবে ইংরেজসেনা? কোথায় আক্রমণ করবে? কেমন-ধারা আঘাত হবে তাদের? কিছুই মগজে আস্ছে না প্রধান সেনাপতির। তিনি তো আর জেনারেল নন যে রণ-নীতির কায়দা-কানুন কূট-কৌশল বুঝবেন! সৈনিক হিসাবেও কাজ করেননি কোনকালে। লড়াই-এর কায়দা বুঝবেন কি করে? আসলে তিনি ভদ্দরলোক—শিয়াল-শিকারী প্লাণ্টার মাত্র। নিউইয়র্ক রক্ষার সামরিক কলা-কৌশলের কথা চিন্তা করতে গিয়ে তিনি হতভম্ব হয়ে যান—সব কথা গুলিয়ে যায়। হাজারো খুঁটিনাটি গেঁথে একটা কিছু গড়ে তোলবার কায়দা তাঁর করায়ত্ত। অবশ্য এই খুঁটিনাটির যদি সরল মিছিল থাকে, তার মধ্যে কোন জটপাকানো না থাকে। কিন্তু এ ব্যাপারে শৃঙখলা কোথায়? হরেক রকম হাজার গণ্ডা সমস্যা। একে জোড়া দেওয়া তাঁর এলেমের বাইরে।

বৃটিশরা লং দ্বীপ দখল করতে পারে অনুমান করে মানহাট্টানের ওপারে ব্রুক্লিন পাহাড়ে একদল সৈন্য মোতায়েন করেছেন। কিন্তু ইংরেজরা তো সরাসরি নিউইয়র্ক দখলের চেষ্টাও করতে পারে? মানহাট্টানে তাহ'লে এক-দল সৈনিক মোতায়েন করতেই হবে! তারা যদি উত্তর মানহাট্টান কিম্বা জার্সি কি হাইল্যাণ্ড দখলের চেষ্টা করে? সম্ভাব্য সব জায়গায় রেখে দাও কিছু কিছু রক্ষী। কিন্তু কত লোক অসুস্থ হয়ে পড়েছে? রোজ দল-ছেড়ে পালাচ্ছেই বা কতজন?

আগের মত, বিশ হাজার ফৌজের দেমাক এখন আর তিনি করেন না। প্রাতরাশ যেমন ছিল পড়ে রইল। ছুঁলেনও না। ঘর থেকে যখন বেরুলেন মনে হ'ল সর্বাঙ্গে শুধু আঘাতের বিষ-বেদনা ছাড়া অপর কোন অনুভূতি নেই। তবু তাঁর ভারিক্কি চাল-চলন, সুনিশ্চিত দৃঢ় পদক্ষেপ দেখে লোকে ভাবল—হাল-চাল সব কিছুই জানেন-শোনেন।

রাস্তায় এসে দাঁড়াতেই দেহরক্ষী ও ফৌজদারের দল ঘিরে ধরল তাঁকে। কেউ বল্লে—কামানের আওয়াজ শুনেছেন স্যর!

—নদীর ওপারে যাবো আমরা? আর একজন জিজ্ঞাসা করে।

—আমার রেজিমেণ্ট প্রস্তুত স্যর!

—আমারটাও তৈরী স্যর।

আঠারো-ঊনিশ বছরের ছেলেরা রেজিমেণ্টের বড়াই করছে। হাজারো শংকা ও দুশ্চিন্তায় প্রধান সেনাপতির মন তোলপাড় করছে। হাসি আসবে কোত্থেকে? তবু এদের কথা শুনে তিনি না হেসে পারলেন না।

বিপ্লবী তাকে বলা চলে না। মোটেই না। তাই সারাক্ষণ তিনি মনে মনে দেশের কথা জপ করতেনঃ 'আমার দেশ, আমার দেশ, আমার আমেরিকা!' অমনিই মনে পড়ত' নিজের খামারের পাশে শান্ত-স্নিগ্ধ নদীটির কথা। দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিত দেশের মাটির কথা—হাতের চাপে আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে যেত যে সোনার মাটি। মনে পড়ত ঘর-দোর ক্ষেত-খামার সবুজ ঘাস ও গাছপালার কথা। দেশের এই বাহ্যরূপ তিনি চেনেন, জানেন, বোঝেন। দেশের এই বাইরের চেহারার অর্থ তাঁর কাছে সুস্পষ্ট। এমনি বাস্তব জিনিসই তিনি চেয়েছেন। কিন্তু বিপ্লব ভিন্ন জিনিস। এমন বাস্তব রূপ তাব নেই। বিপ্লব যেন অরূপ এক অস্পষ্ট জ্যোতিচ্ছটার মত। তিনি দেখেছেন, এই বিপ্লবের ডাকে সাড়া দিয়েছে হাজার হাজার নোংরা গেঁতো তামাকখোর ইয়াংকি চাষী। বিপ্লবের এই বাইরের রূপ তিনি চেনেন—বোঝেন। তার বেশী নয়।

তাই বুলডগেব মত ধীরে ধীবে মাথা নেড়ে মনে মনে আওড়াতেনঃ 'আমার দেশ, আমার আমেরিকা।' হাঁ বুলডগের মতই বটে। একবার যখন দাঁত বসিয়েছেন, তখন যতদিন ঘাড়ে মাথা থাকবে ছাড়াছাড়ি নেই। আমৃত্যু কামড়ে পড়ে থাকবেন।

১৭৭৬ সালের ২৭শে আগস্ট সকালে তিনি বুঝলেন যে ব্রুকলিন রক্ষা করবার চেষ্টা করে মারাত্মক ভুল করা হয়েছে। চেহারাটা তাঁর কাটখোট্টা হলেও মনটা ছিল যেমন কোমল তেমনি উৎসুক। তাঁর চাইতে এলেম যাদের বেশী, শিশুর মত অকপটেই বিশ্বাস করতেন তাদের। নির্ভর করতেন তাদের উপব। এমনি লোকের সংখ্যাও ছিল বহু।

জেনারেল চার্লস্ লী এই বিশ্বাসীদের অন্যতম। লী পেশাদার সৈনিক। ওয়াশিংটনের সামরিক জ্ঞান-গম্যি যাদের জানা ছিল, সবাই তারা জেনারেল লীর গুণমুগ্ধ। ব্যর্থতার বোঝা টেনে জীবন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ এই ভাগ্যান্বেষী সৈনিক সহসা একদিন বিপ্লবের রথে চড়ে বসেন। সামরিক এলেম

বিচার করলে আজাদী ফৌজের নেতৃত্ব তাঁরই প্রাপ্য। কিন্তু পাননি। মানুষ হিসাবে, চালচলনে, ভার্জিনিয়ানের সঙ্গে তাঁর তফাৎ বিস্তর। লী কদাকার বে-আদপ ; আর শিয়াল-শিকারী সদালাপী ভদ্রলোক, চমৎকার তাঁর চাল-চলন আচার ব্যবহার। লী কপর্দকহীন ; কিন্তু শিয়াল-শিকারী সম্ভবত সেকালের আমেরিকার সব চাইতে তালেবর লোক। . লড়াই করবে অবশ্য চাষা-ভূষো ছোটলোকেরা ; তবু টাকাটাই তো আসল! ভার্জিনিয়ার চাষী এক পয়সা মাইনে নিতে অস্বীকার করেছেন শুনে লোকে 'ওহো-ওহো' করছে।

অত্যন্ত বিনীতভাবে শিয়াল-শিকারী জান্‌তে চাইলেন লী'র কাছে যে তিনি হ'লে নিউইয়র্ক রক্ষার জন্য কি করতেন। লীর জবাব এল। লী জানালেন যে তিনি ব্রুক্‌লিন পাহাড়ে ঘাঁটি তৈরীর ব্যবস্থা করতেন।

পাঁচদিন হ'ল ইংরেজরা স্ট্যাটেন দ্বীপ থেকে তাদের অধিকাংশ জার্মান সেনা লং দ্বীপের গ্রেভ্‌স্‌এন্ডয়ে নৌকা করে পার করেছে। ভার্জিনিয়ানের নৌবহর বল্‌তে আছে কিছু দাঁড়টানা নৌকা। তার চাইতে বড় কিছু নেই। তাই নিষ্ক্রিয় ক্লীবের মত তাঁকে শত্রু-সৈন্য পারাপার দেখ্‌তে হয়েছে। অবশেষে মরিয়া হয়ে যে পাল্টা চাল তিনি দিলেন তা আরও মারাত্মক। ব্রুক-লিনের মরণ-ফাঁদে পাঠালেন আরও ছয় রেজিমেণ্ট অশিক্ষিত তামাক-চিবানো গণ-ফৌজ।

তারপর দিন পাঁচেক সব চুপচাপ্‌। মাসের পর মাস দিবারাত্রি যে দুঃসহ শংকা তাঁকে তোলপাড় করেছে, জগদ্দল পাথরের মত সেই দুর্ভাবনা বুকে চেপে হাত-পা গুটিয়ে বসে রইলেন শিয়াল-শিকারী। তিনি যদি রণকুশলী জেনারেল হতেন, তাহ'লে কোনো এক অন্ধকার রাত্রির সুযোগ নিয়ে অবশ্যই তাঁর তামাম ফৌজ মানহাট্টানে হটিয়ে আন্‌তেন। আর তা না হয়ে যদি তিনি নির্বোধ গোঁয়ার হতেন, তাহ'লে রেজিমেণ্টের পর রেজিমেণ্ট পাঠাতেন ইংরেজদের সুচতুর ফাঁদে। দুয়ের কোনটাই তিনি নন ; তাই তামাম বাহিনীটাকে ছড়িয়ে রাখলেন খণ্ড খণ্ডভাবে এখানে সেখানে। ভাবলেন একটা তাজ্জব কিছু ঘটে আসন্ন সর্বনাশ এড়িয়ে যাবেন। কিন্তু তাজ্জব কিছুই ঘটল না। ১৭৭৬ সালের ২৭শে আগস্ট রাত গোটা তিনেকের সময় ইংরেজসেনা এগুতে আরম্ভ করল।

লং দ্বীপে হাজার বিশেক সৈন্য ছিল ইংরেজের। এর মোটা এক অংশ জার্মান ভাড়াটে সৈনিক। তাহ'লেও সব দিক বিচার করলে, সামরিক শিক্ষা

ও পরিচালনা গুণে এই বাহিনী ছিল তখনকার দিনে তামাম দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বাহিনী। এই সংগ্রামী ফৌজকে প্রতিরোধ করবার জন্য ব্রুকলিন পাহাড়ে জমায়েৎ হয়েছিল প্রায় হাজার দশেক মার্কিণ বাসিন্দা। সেই হাজার দশেক জনতার জমায়েৎকে কোন মতেই ফৌজ বলে অভিহিত করা যায় না। কি করে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরা যায়—এই একটিমাত্র সাধারণ চিন্তা ছাড়া আর কোন বিষয়েই মিল ছিল না তাদের।

জেনারেল নাথানেল গ্রীনের উপর যুদ্ধ পরিচালনার ভার দিয়েছিলেন ভার্জিনিয়ান। কিন্তু বেহুঁশ জ্বরে আজ তিনি শয্যাশায়ী। সরল অনাড়ম্বর জীবনে বিশ্বাসী শান্তিবাদী কোয়েকার (ধর্মভীরু) এই জেনারেলের বয়স মাত্র চৌত্রিশ বছর। বয়স অল্প হলেও লোকটি সৎ ধীর স্থির এবং নির্ভরযোগ্য। মগজে বুদ্ধি-শুদ্ধিও ছিল। গ্রীনের অল্প বয়সে অবাক হবার কিছু নেই। গোটা পল্টনই তো কম-বয়সী জওয়ান নিয়ে গড়া। আজাদীর স্বপ্ন-মুগ্ধ যুবসমাজ দুনিয়ার সামনে দেখাতে এসেছে তাদের আদর্শ। কিন্তু গ্রীন রুগ্ন। নিরুপায় হয়ে সুলিভানকে সৈনাপত্য দিলেন ওয়াশিংটন। ক্ষয়িষ্ণু মোম-বাতির মত সুলিভানের উপর আস্থা উবে যেতেও বিলম্ব হল না। তখনকার অবস্থা আরও সংকটাপন্ন। ডাক পড়ল পুটনামের। জেনারেলরা নিজেদের মধ্যে বাদ-বিতণ্ডা ঝগড়া-ঝাঁটি করতে লাগলেন। ক্রমে তাঁদের বিসম্বাদ পল্টনের মধ্যেও সংক্রামিত হ'ল।

ভার্জিনিয়ানের আদেশে কাঁচ-মুখো সেনানীচালিত বাজখাঁই গলার আরও গেঁতো ইয়াংকি সেনা দলে দলে বিরাট গাদা-বন্দুক কাঁধে এগিয়ে চলল কলরব করে। কিন্তু স্ট্যাটেন দ্বীপের ইংরেজ সেনাদল যে কোনও সময় ক্ষীণবল মানহাট্টান রক্ষীদের আক্রমণ করে বসতে পারে তো। সারাক্ষণ এই গোপন শংকায় তিনি তটস্থ হয়ে রইলেন।

প্রধান সেনাপতি জর্জ ওয়াশিংটনের আজ প্রথম পরীক্ষা। তাঁর নেতৃত্বে এই সর্বপ্রথম সংগ্রাম শুরু হতে চলেছে। বারবার তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন—এই পয়লা লড়াইতে যেন তাঁর জয় হয়।

লড়াইয়ের হালচাল সম্পর্কে যতটুকু খোঁজখবর তিনি জানতেন, জানতেন না তার চাইতে অনেক বেশী। তবে মারাত্মক যে ভুলটা হয়ে গেছে তার খোঁজ রাখতেন। প্রায় ইস্ট নদীর ডাঙা অবধি যে শৈলশ্রেণী ছিল, ব্রুক্‌লিন পাহাড়ের ঘাঁটি ছেড়ে আমেরিকানরা ছড়িয়ে পড়েছিল সেই নীচু টিলার আড়ালে। এই টিলাগুলোর মধ্য দিয়ে চলাচলের পথ ছিল মাত্র তিনটি। তার মধ্যে দুটি

পথের রক্ষাব্যবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল। কিন্তু তৃতীয়টি ছিল প্রায় অরক্ষিত। মারাত্মক ভুল হল সেইখানে।

সাতাশে আগস্ট সূর্যোদয়ের ঘণ্টা দুয়েক পূর্বে ইংরেজ সেনার আগুয়ান দল এই তৃতীয় পথ, জামাইকা গিরিপথের মুখে হাজির হল। ইংরেজরা ভেবেছিল জোর বাধা পাবে—জবরদস্ত লড়াই হবে। তাই এসেছিল সন্তর্পণে। কিন্তু পেঁাছে তো অবাক্। মাত্র গুটি পাঁচেক ঘুমন্ত অফিসার গিরিপথ পাহারা দিচ্ছে! স্কুলের ছেলেমেয়েরা যেমন যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলতে গিয়ে সবাই জেনারেল হতে চায়, তেমনিধারা এই বিদ্রোহী ফৌজেও সেনানীর অভাব ছিল না। কোন কোন রেজিমেণ্টে সৈনিক আর সেনানীর সংখ্যা ছিল সমান-সমান। যতজন লড়িয়ে ততজন পরিচালক। ভাবখানা এই রকমঃ আমি কম যাই কিসে? তুমিও মানুষ আমিও মানুষ। তুমি যদি নিজেকে ফৌজদার হবার মত হোমরা-চোমরা মনে করো, আমিই বা কমতি যাই কিসে?

সৈনিক বা সেনানীদের মধ্যে উর্দি ছিল না কারও। সেনানীরা তাই পদমর্যাদার প্রতীক হিসেবে টুপীতে পালক চড়াতেন। আমেরিকানদের এই পালক-প্রীতি দেখে মজার একটি ছড়া বেঁধেছিল ইংরেজরাঃ

'টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে ইয়াংকি বাবু এলেন শহরে;
মাথায় চড়ালেন পালক—বলেন ওটা ম্যাকারোনি।'

পাছায় বেয়নেটের খোঁচা খেয়ে ঘুম ভাঙল অফিসার পাঁচটির। চোখ মেলতেই ইংরেজ সেনা শাসিয়ে দিল—হাউমাউ চেঁচামেচি করলে গলায় কীরিচ সেঁধিয়ে ইহজীবনের মত চুপ করিয়ে দেবে।

--বেশ তো! ঘুমের ঘোরে একজন বলে উঠল। কিন্তু আর সবাই উচ্যবাচ্য করলে না, নীরবে পাছার আঁচড়ে হাত ঘষতে লাগল। মনে মনে ভাবল, হায় হায়, বাড়ীর কথা যখন মনে হয়েছিল কেন তখন ভেগে পড়লুম না; তাহ'লে তো আজকে আর এই বিপাকে পড়তে হ'ত না!

যেমন অবজ্ঞা ভরে শুয়োর গরু ছাগলের নাম উচ্চারণ করা হয়, কতকটা তেমনি ঘৃণা মেশান সুরে ইংরেজ অফিসার বল্লেন—বিদ্রোহী!

—হুকুম করুন! আমেরিকান সেনানীদের একজন জিজ্ঞাসা করে।

—ক্যা! খেঁকিয়ে ওঠে ইংরেজ সেনানী।

—কি হুকুম? হুকুম, প্রাণভরে ঘুমোও!

—আমরা গণসেনা, মশাই!—বছর সতেরোর একটি ছেলে দাঁত বার করে বলে।

—হাঁ, গণসেনা আমরা!—সমস্বরে বলে ওঠে আর সবাই।

—তা বুঝলাম, কিন্তু রেজিমেন্ট কোথায়? রেজিমেন্ট?

—আমরা গণসেনা মিস্টার, গণসেনা! —বারবার বল্‌তে লাগল তারা।

—হায় ভগবান! চাপা গলায় অফিসারটি বল্লে। তারপর বন্দীদের অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হল। ইংরেজ সেনা এগিয়ে চল্ল। বৃটিশ কমান্ড যখন দূত মারফতে সংবাদ পেল যে আমেরিকান ফৌজের বাঁ দিক অরক্ষিত, তারা ঠিক বিশ্বাস করতে পারল না। তবু এই ফাঁকের সুযোগ নিতেও ইতস্তত করল না। আমেরিকানদের ধোঁকা দেবার জন্য ডানপাশে মুখো-মুখি এক আক্রমণ চালান হল; আর সেই সুযোগে শতে শতে লাল-কোটয়ালা ইংরেজ সেনা সেই ফাঁক দিয়ে আমেরিকানদের পেছনে হাজির হ'ল।

—তারপর? গম্ভীরমুখে জিজ্ঞাসা করলেন শিয়াল-শিকারী। কোন কিছু যখন ঘটে যায়, তারপর সেজন্য অনুশোচনা তিনি কোনকালেই করেন না। এ অভ্যাস ও'র ধাতে নেই।

—তারপর? তারপর খুনে খুনে নরক সৃষ্টি হলো। ওঃ সে কি বিভীষিকা!

এমন শান্ত, এমন ভাবলেশহীন নিস্পৃহভাবে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন যে পাশের লোকে ভাবল—লোকটা মানুষ নয়! আবার কিছু বোঝেনি এমনও হতে পারে!

নদী পার হয়ে নিজে যতক্ষণ ব্রুকলিন যান নি' বিপদের পুরো গুরুত্ব তাঁর মালুম হয়নি। মানহাট্টান অরক্ষিত রাখলে আরও ঘোরতর বিপদ ঘটতে পারে এই শংকায় একদিকে যেমন মানহাট্টান ছেড়ে যেতে মন সরছিল না, অপরপক্ষে তাঁর সৈন্যেরা ব্রুকলিনে লড়াই করছে আর তিনি এখানে সরে রয়েছেন এজন্যও মনটা কেমন খুঁতখুঁত করছিল। অবশেষে ব্রুকলিনে যাওয়াই স্থির করলেন। কিন্তু তিনি নদী পার হতে না হতেই লড়াই প্রায় খতম হয়ে এসেছিল। জেনারেল স্টার্লিং ও জেনারেল সুলিভানের কথা যখন তাঁকে শোনান হ'ল মুখখানা তাঁর ছাইয়ের মত বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

জার্মান ভাড়াটিয়া ফৌজ যে অংশে মুখোমুখি আক্রমণ চালায় স্টার্লিং ও সুলিভান ছিলেন সেইদিকে। বাতাসহীন শোবার ঘরে বসে ভার্জিনিয়ান যে কামান-গর্জন শুনেছেন, এ তার পরেকার ঘটনা। কামান দেগে অবশ্য বিশেষ ক্ষতি করা যায়নি। কিন্তু বন্দুক শিয়রে দিয়ে সারারাত অনিদ্রায়

উস্‌পিস্‌ করবার পর মুহুর্মুহু কামান গর্জন ইয়াংকি চাষীদের ঘাবড়ে দেয়—তাদের মনোবল উবে যায়। এর পর এল রাইফেলধারী জার্মান জ্যাগার। একহাঁটু প্রভাতী কুয়াশার মধ্য দিয়ে গাছপালার সঙ্গে সবুজ উর্দির রঙ্‌ মিলিয়ে ঝলকান কীরিচ উঁচিয়ে এগিয়ে এল জার্মান পদাতিক রণভেরীর তালে তালে।

—হেসিয়ান্‌! কলরব করে উঠল ইয়াংকিরা। ক্ষেত-খামারে মানুষ সতেরো-আঠারো-ঊনিশ বছরের ছেলেরা ভিজা হাতে বন্দুক চেপে হাঁ করে চেয়ে রইল জার্মানীর হেস অঞ্চলের ভাড়াটে ফৌজের দিকে। জার্মানদের প্রতি অহেতুক ঘৃণার সঙ্গে একটা দুরন্ত ভীতিও মেশান ছিল ইয়াংকিদের মনে। বিশাল বপু অতসী রঙের গোমরা-মুখো কর্কশকণ্ঠ এই সবুজে উর্দিপরা জার্মান ভাড়াটে ফৌজ সম্পর্কে কোনও ধারনাই ছিল না তাদের।

—এরা হেসিয়ান! —পরস্পর বলাবলি করতে লাগল ইয়াংকিরা।

গোলাগুলী ছেড়ে তবু তারা প্রতিরোধ করত, অন্তত চেষ্টা করে দেখত আর কিছুকালের জন্য তাদের ভাঙাচুরা ব্যূহ আগ্‌লে থাকতে পারে কিনা। কিন্তু সব তচনচ হয়ে গেল পেছনে ইংরেজের রণভেরী শুনে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে যে তারা দুদিক থেকে আক্রান্ত। সাম্‌নে জার্মান পেছনে ইংরেজ। জার্মানদের প্রতিরোধ করবার জন্য রুখে দাঁড়াচ্ছে তারা ; কিন্তু পিছন থেকে লাল উর্দির দুম-দুম গুলী অস্থির করে তুলছে। হাউমাউ হা-হুতাশ করে উঠ্‌ল আজাদী ফৌজ। নিশ্চয় বিভীষণের কাজ করেছে কেউ। পালাবার চেষ্টা করল, কিন্তু পথ পেল না ; লাল উর্দি তাড়িয়ে নিয়ে গেল জার্মান-দের রাইফেলের ডগায়। আত্মরক্ষার জন্য তখন তারা দশ বারো-সেরী মরচে-ধরা মস্ত-লম্বা বন্দুক ঘুরাবার চেষ্টা করল' জার্মানদের দিকে। কিন্তু তার পূর্বেই হেসিয়ানদের ক্ষুরধার কীরিচের গুঁতোয় তাদের হিম্মৎ ধূলিসাৎ হয়ে গেল। তখন মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে তারা 'মাগো'-বলে কান্না জুড়ে দিলে ; আর সেই সুযোগে হল্‌দে রঙের জার্মান চাষীরা তাদের পিঠে সুতীক্ষ্ম ইস্পাত সেঁধিয়ে দিতে লাগল।

আমেরিকানদের মধ্যে অনেকেরই লড়াই'র প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। খুনোখুনি হানাহানি তারা কোনদিনই করেনি। কয়েকজন মাত্র বাংকার পাহাড়ে লড়েছিল। নয়া-ইংলণ্ডের শহরে-শহরে ধীরে বয়ে গেছে তাদের শান্তিময় আয়াসী জীবন বাক্সের মত চৌকো গড়নের সাদা পল্লী-গীর্জাকে কেন্দ্র করে। শুঁড়িখানায় বসে গুলতানি করতে করতে এতকাল যে আজাদী

সম্পর্কে তারা জল্পনা-কল্পনা আলাপ-আলোচনা করেছে, আজ তার জন্য বলি দেবার পালা।

সামনের ও পিছনের যুগপৎ আক্রমণে দিশেহারা ইয়াংকিরা তখন যেদিকে চোখ যায় পালাবার চেষ্টা করল। আর জার্মানরা হুংকার দিয়ে হাসিঠাট্টা করে তাদের তাড়া করলে। ক্লান্ত হয়ে যারা গাছের আড়ালে জড়সড় হয়ে হাঁপাতে লাগল, বেয়নেট দিয়ে গাছের সঙ্গে এফোড় ওফোড় করে জার্মানরা সেইখানেই তাদের সাবাড় করলে। কেউ বা লুকাল মাঠের মধ্যে। পাতি পাতি করে খুঁজে ধরে নিয়ে এল তাদের হিড়হিড় করে টেনে। উল্লসিত জার্মান ফৌজের 'ইয়ংকি! ইয়ংকি'! রবে মুখর হয়ে উঠল রণক্ষেত্র।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চল্ল' এই নারকীয় বীভৎসতা। জঙ্গল-ঘেরা যে ব্যূহ থেকে ইয়াংকিরা জার্মানদের রুখবার চেষ্টা করেছিল, সেই ব্যূহ আর আমেরিকান-দের মূল ঘাঁটির মাঝখানে জলকাদাভর্তি বিপজ্জনক এক বিলের মধ্যে ক্ষীণ-স্রোতা নদী ছিল একটি। ভীতত্রস্ত দিশেহারা আমেরিকানরা সেই ফাঁদে ধরা দিল। পিছনে তাড়া করে আস্ছে জার্মানদের ইয়ংকি-ইয়ংকি রব। ক্রমেই এগিয়ে আসেছ তাদের শেলবকটু কর্কশ আওয়াজ। বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে বিলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল দিশেহারা ঔপনিবেশিক সেনা—জলকাদায় ডেবে ডুবে যেতে লাগল।

জেনারেল সুলিভান একটা ভুট্টাক্ষেতের মধ্যে আত্মগোপন করবার চেষ্টায় অতি কষ্টে বুকে হেঁটে লম্বা ডাঁটার ফাঁকে লুকালেন। জার্মান সেনা তাঁর কাছ-ঘেঁষেই ফসল দলে-মচকে ছুটছে। চুপ করে পড়ে রইলেন সুলিভান। কিন্তু চোখ এড়াতে পারলেন না। জনা তিনেক হলদে-চুল জার্মান হিঁচ্ড়ে টেনে দাঁড় করাল তাঁকে। তারপর বোকার মত দাঁত বার করে খানিকটা হেসে মোটা বক্শিসের আশায় ধরে নিয়ে গেল।

জেনারেল স্টার্লিং একলা ছুটে পালাচ্ছেন। প্রাণের ভয়ে নয়। সব গেছে তাঁর। খড়কুটার মত সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছে; বহু নিহত হয়েছে। চারিদিকে শত্রুর বেষ্টনী। ঝাঁক ঝাঁকে গুলী ছুঁড়ছে ইংরেজসেনা তাঁকে লক্ষ্য করে। যেন হাঁস তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারেনি যে তাদের লক্ষ্য তামাক-চিবানো তক্মাপরা সখের অফিসার নয়—পুরাদস্তুর একজন জেনারেল—এককালে লাল-উর্দিয়ালাদের দলেও তাঁর কদর ছিল। ছুটতে ছুটতে পা দুটো সীসার মত ভারী অসাড় হয়ে এল। আর পারা যায় না। এমনি সময় স্টার্লিং পড়ে গেলেন এক জার্মান টহলদার দলের

সাম্‌নে। হিহি করে হেসে উঠল ভাড়াটে জার্মান ফৌজ। আর একজন আমেরিকান জেনারেলও তারাই বন্দী করল।

নদী পার হয়ে ভার্জিনিয়ান যখন রণক্ষেত্রের পিছনে এলেন, তাঁকে দেখে সেনানীরা ছুটে এল দুঃসংবাদ জানাবার জন্য। এল মেজর, এল কর্ণেলরা, এলেন জেনারেল একজন। এর চাইতে বিপদ আর হতে পারে না!—সবাইর মুখেই এক বুলি।

—আমরা গেছি। সব খতম হয়ে গেছে। কোন উপায় নেই। সেনানীরা বুঝাবার চেষ্টা করল তাঁকে।

একটা পাহাড়ের মাথায় চড়লেন প্রধান সেনাপতি। লড়াইর ময়দানের সবকিছুই দেখা যায় সেখান থেকে। তিনি জানতেন যে সেনানীরা ঠিক কথাই বলছে। সবই গেছে, কিছুই করবার নেই! তাঁর আজগুবি পরিকল্পনা একেবারেই ভেস্তে গেছে।

গোটা রণক্ষেত্রের বীভৎস ছবি তাঁর সামনে। জলকাদাভর্তি বিলটা তাঁর পায়ের তলায়। দেখলেন, ইয়াংকিদের কাকুতি-মিনতিতে কর্ণপাত না করে জার্মান সেনা কচাকচ্‌ কেটে যাচ্ছে কাদায় আটকা আমেরিকানদের। হেসিয়ান-দের ভ্রূকুটিকুটিল নিষ্করুণ মুখও তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন বলে মনে হল। পলায়নের পথ উন্মুক্ত রাখবার জন্য মেরিল্যাণ্ডের ব্রিগেডটি ইংরেজ ব্যূহের পাশে আক্রমণ চালাল। কিন্তু লাল-উর্দিয়ালাদের ঝাঁকে-ঝাঁকে গুলীবর্ষণে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। পোকামাকড়েব মত প্রাণভয়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে ইয়াংকিরা। জার্মানদের আজ পোয়াবারো। তাদের উল্লসিত ইয়ংকি-ইয়ংকি রব হাওয়ায় ভেসে এই পাহাড়ের উপরেও তাঁর কানে পৌঁছুল।

—জেনারেল, এখন আমরা কি করবো? পাশ্ব থেকে একজন জিজ্ঞাসা করল।

—কি করবে?

গোটা পল্টনের প্রধান সেনাপতি হবার ঝক্কি যে কী এখন তাঁর বেশ মালুম হচ্ছে।

—কি করবে? কি আছে করবার?

হতাশায় মাথা নেড়ে গুটি গুটি পা ফেলে বিড়বিড় করতে করতে হাঁটতে লাগলেন প্রধান সেনাপতি। কাণ্ড দেখে হতভম্ব হয়ে গেছেন। আজকের এই সর্বনাশের পেছনে নিজের যে ভুলচুক রয়েছে, একে একে তিনি সেগুলো

মনে করবার চেষ্টা করলেন। যুদ্ধ লড়াই পরাজয় সম্পর্কে কতটুকু তাঁর জ্ঞান? মাথার মধ্যে টন্‌টন্‌ করে উঠল। আর ভাবতে পারা যায় না। সারা গা ঘামে ভিজে চুপচুপ্‌ হল।

—ওরা যদি এখানেও আমাদের আক্রমণ করতে আসে?—জলকাদামাখা কর্ণেল হার্ট নামে একজন সেনানী জিজ্ঞাসা করল।

—তাহলে যতক্ষণ তারা কাছে না আসে অপেক্ষা করবে। গুলী চালাবে কাছে এলে। শান্ত সংযত কণ্ঠে জবাব দিলেন শিয়াল-শিকারী। মনে হ'ল যেন স্কুলের পড়া মুখস্থ বলছেন।

কিন্তু সব উপদেশই এখন অর্থহীন। সবই চুকেবুকে গেছে। তিনি জানতেন যে দুনিয়ায় এমন কিছু নেই, যা তাঁকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে। কাছে আসবার পর গুলী করবার পরামর্শই দিন আর যাই করুন, কিছুতেই কিছু হবার নয়। মৃত্যুভয়ে ভীত সৈনিকদের কাছে পরামর্শ, উপদেশ, উৎসাহ সবই নিস্ফল হতে বাধ্য।

মার্শসাহেবের জেলে

সৈন্যব্যূহের পশ্চাতে গুটি গুটি পা ফেলে শিরদাঁড়া টান করে পায়চারি করছেন প্রধান সেনাপতি। ভাবব্যঞ্জনাহীন মুখে কেবল ভুরু দুটোই সামান্য কুঁচকে ছিল। যে সেনাপতির গোটা বাহিনী ছিন্ন ভিন্ন টুকরো টুকরো হয়ে গেছে—ভবিষ্যতের সমস্ত আশাই যার নির্মূল হয়েছে, তাঁর এমনি আচরণ, এমনি নির্লিপ্ত হাবভাব অভূতপূর্ব। কোন কালে শোনেনি কেউ। তবু লোকে তাঁর তারিফ্ করতে লাগল। শ্রান্ত-ত্রস্ত বার্তাবহ, রেজিমেণ্ট-হারা কর্ণেল, ভগ্নোদ্যম সতেরো-আঠারো বছরের ক্যাপ্টেন এবং জীবনে প্রথম ও শেষবারের মত জেনারেলদের চেঁচামেচি হুটোপুটির মধ্যে প্রধান সেনাপতির উঁচু মাথা সত্যিই বিশিষ্ট মহিমা-মণ্ডিত দেখাচ্ছিল।

বেলা বাড়ছে। উদয়াচলের সূর্য এলেন মাথার উপর...হেলে পড়লেন বাঁয়ে অসহ্য গুমট অপরাহ্ণ...এবারে দিগন্ত পাড়ি দিয়ে ধীরমন্থরে ডুবে যাচ্ছেন। লড়াই তখনও শেষ হয়নি। সাময়িক বিরতি ঘটেছে মাত্র। নয়া-ইংলণ্ডের বাসিন্দাদের দিনভর ধাওয়া-ধাওয়ি, খুন ও বন্দী করার একতরফা খেল দেখিয়ে দম নিচ্ছে ইংরেজ সেনা। বিদ্রোহীদের গেঁড়াকলে ফেলেছে। ফাঁদ থেকে পালাবার জো নেই। তিনদিকে ইংরেজ সেনার বেড়া, বাকী দিকে জল। বৃটিশ সেনাপতি যখন বুঝলেন যে, শত্রু বাহিনী মুঠোর মধ্যে, ঝটপট লড়াই চুকিয়ে ফেলবার কোন আগ্রহই তিনি প্রকাশ করলেন না। তাতে অযথা সৈন্যক্ষয়ের সম্ভাবনা। চট করে তো আর বদলী পাওয়া যাচ্ছে না!

আমেরিকান ফৌজের পিছু-হটা প্রায় ছত্রভঙ্গ পলায়নের রূপ নিয়েছিল। বেনো জলের মত তার ধাক্কা প্রতিটি ঘাঁটিতে লাগল। ভীতিবিহ্বল পরাভূত সৈন্যদল সারা বিকাল টল্‌তে টল্‌তে জলাভূমি ও জঙ্গলের মধ্য থেকে বেরিয়ে আস্‌তে লাগল। সবাই ভীতিবিহ্বল হতভম্ব। সকলেই নিজ নিজ বিপদের চিন্তায় বাহ্যজ্ঞানহীন। সকলেরই ধারণা, গোটা বিপ্লবের দফা শেষ হয়েছে ; এখন ঘাড়ের উপর মাথাটা বজায় রাখাই একমাত্র কর্তব্য।

দলে দলে সৈনিক-সেনানী ধনী চাষীর পাশ কাটিয়ে গিয়ে খানিকটা দূরে

দূরে জটলা করতে লাগল। ভীতিবিহ্বল মানুষের সে এক অপরূপ মিছিল। প্রধান সেনাপতির চোখাচোখি তাকাবার ভরসা হয়নি কারও। কেউ কেউ পাশ কাটিয়ে গিয়ে পেছন ফিরে চেয়েছে তাঁর কাদামাখা বুটের দিকে।

প্রায় হাজার দুয়েক সৈনিক জল-জঙ্গলের মধ্য থেকে আর ফিরলই না। ভার্জিনিয়ানের জীবনে এইটাই প্রথম পরাভব নয়। ক্ষয়-ক্ষতি, ব্যর্থতা এবং অপূর্ণ কামনা দিয়ে বোনা হয়েছে তাঁর গোটা জীবন। খুঁটিনাটি জিনিস তাঁকে নিদারুণ মনকষ্ট দিত। কিন্তু অন্তরের দুর্বলতা বাইরে হীনমন্যতায় ধরা পড়ত না। অথচ সে সম্পর্কে নিজে ছিলেন সম্পূর্ণ সজাগ। সে দুর্বলতা তাঁর জীবনে তাই অস্তিত্বের মতই বাস্তব—জীবন্ত সত্য। নিজের কাপুরুষতা সম্পর্কে কোন ভ্রান্ত ধারণাই তাঁর ছিল না, তবু সাহসিকতাকে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ বলে সম্মান দিতেন। জীবনে ভালবাসার প্রয়োজন তাঁর দৃষ্টিতে প্রাণবায়ুর মত। অথচ যে নারীকে তিনি ভালবেসেছিলেন তাকে পাননি। সবাইর প্রীতি ও ভালাবাসা তিনি পেতে চেয়েছেন ; কিন্তু প্রকৃত সুহৃদ তাঁর ছিল না একজনও। শিশু দেখলেই স্নেহ-মমতায় উথলে উঠত তাঁর মন, কিন্তু নিজে তিনি নিঃসন্তান। নিজের অজ্ঞতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলে পাণ্ডিত্যকে তিনি পূজা করতেন। কি জটিল, কত বেদনাদায়ক তাঁর মনের গতি। একমাত্র জীবনের প্রতি অসীম ভালবাসার টানই তাঁকে জীবন-মৃত্যুর প্রান্তসীমায় বাঁচিয়ে রেখেছিল। কিন্তু এ দুয়ের যোগসূত্র এত ক্ষীণ ছিল যে আজীবন তাঁকে অন্ধকারের কোল ঘেঁষে শীর্ণদেহ বয়ে চলতে হয়েছে।

রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে এল, তবু তাঁর ক্লান্তিহীন পায়চারি থামছে না। ভগ্নোদ্যম যত লোক কাছে আস্‌ছে তাদের শুধু একটি কথাই জিজ্ঞাসা করছেন—কত লোক আমরা হারিয়েছি।

কেউই জানে না। ব্রুকলিনের পরিত্যক্ত রণভূমি তখনও এলোমেলো গোলকধাঁধার মত। তার পুরো ছবি আগামী বহু বছর, বহু পুরুষের মধ্যেও জোড়া দেওয়া সম্ভব হবে না। গোটা রেজিমেণ্টের পর রেজিমেণ্ট উধাও হয়ে গেছে। জেনারেল, কর্ণেল, মেজর, কুড়ি কুড়ি ছোটখাটো সেনানী এমন-ভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে যে, মনে হয় বসুন্ধরা তাদের গ্রাস করেছে। কেউ বল্লে, হাজার খানেক মারা গেছে। কারও মতে দেড় হাজার : আবার কেউ বল্লে হাজার তিনেকের কম নয়। —সংখ্যা যাই হোক্। প্রচণ্ড আঘাত আমরা পেয়েছি। —ওয়াশিংটনের কাছে এসে জেনারেল পুটনাম বল্লে।

প্রধান সেনাপতি মাথা নেড়ে সায় দিলেন। পুটনাম অবাক হয়ে ভাবলেন: —মানুষ এমন ইট-পাথর-ইস্পাত দিয়ে গড়া হয় কি করে? কি ক'রে ধমনীতে রক্তপ্রবাহ এমন নিস্তেজ হয়? চতুর্দিকে ইতস্তত ছড়ান ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি যদি খানিকটা গালাগালি করতেন তাহ'লেও ভাল হত।

—আর একটু পরেই অন্ধকার জমাট হবে। ধরুন, ওরা যদি অন্ধকারের সুযোগে আবার আক্রমণ করে?

—করতে পারে। শিয়াল-শিকারী সায় দিয়ে বল্লেন।

—কিন্তু স্যর, ভগবানের নামে হলপ করে বলতে পারি, আবার আক্রমণ করলে প্রতিরোধ করবার কোন ক্ষমতাই আমাদের নেই। —আর্তকণ্ঠে পুটনাম জানায়।

শিয়াল-শিকারী ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন জেনারেলের দিকে। তাঁর কটা চোখে বিন্দুমাত্র উত্তেজনা নেই। পুটনাম ঢোক গিলে হেঁট মাথায় বিড়বিড় করে কি যেন বল্লেন।

—যদি ওরা আবারও আক্রমণ করে, আমরা আবারও লড়বো। শিয়াল-শিকারী বল্লেন।

—আলবাৎ লড়বো।

—এটা ওদের ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে আমরা আবারও লড়বো। লড়াই এখনও শেষ হয়নি জেনারেল!

'লড়াই শেষ হয়নি,' 'লড়াই এখনও শেষ হয়নি'—মনে মনে বার বার এই কথা আবৃত্তি করে ভার্জিনিয়ান আবার পায়চারি আরম্ভ করলেন। কিন্তু মগজের মধ্যে খানিকক্ষণ হাতড়ে তিনি বুঝলেন যে, তাঁর পক্ষে, জর্জ ওয়াশিংটনের পক্ষে, অবস্থার পরিবর্তন ঘটান সম্ভব নয়। তিনি জানতেন যে আদব-কায়দা আর যোগ্যতা এক জিনিস নয়। বুঝতেন যে, নির্বোধ কতগুলো নাবালকের ভালবাসা অর্জন করার কায়দা আয়ত্তে রাখা প্রধান সেনাপতির একমাত্র গুণ নয়। আজ তাঁর পল্টন কুটিকুটি খানখান হয়ে জলে-জঙ্গলে পড়ে আছে। মনে হয়, তারা বুঝি তাঁর জীবনের দৃষ্টান্তই অনুসরণ করেছে। ব্রাডককের পরাজয়ের বিভীষিকার পর আজ অবধি উল্লেখযোগ্য যত কিছুতে তিনি হাত দিয়েছেন সবই ভেস্তে ছিঁড়ে তচ্‌নচ্‌ হয়ে গেছে। আনাড়ীর মত যাতে হাত দিয়েছেন তা-ই ভণ্ডুল হয়ে গেছে। বাঁশী বাজাবার এলেম তাঁর নেই। তবু যখনই সুর সাধবার চেষ্টা করেছেন, তখনই বারবার একঘেয়ে অশ্রাব্য শব্দের পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

তবু এখন একটা কিছু অবশ্যই বাৎলাতে হবে। সব কিছু শেষ হয়ে গেছে বুঝেও মরবার আগে তাঁর লোকজন শেষ চেষ্টা করেছে। না, একটা কিছু ভেবে চিন্তে বার করতেই হবে। কিন্তু চিন্তা-ভাবনা আর কেউই করবে না। মনের উদ্বেল অশান্তি-উদ্বেগের জন্য বাধ্য হয়ে তিনি পায়চারি করছেন; আর মগজে বুদ্ধির কোঠায় টোকা মেরে প্রাণপণে একটা পন্থা বার ক'রবার চেষ্টায় আছেন। বাহাদুরী দেখাবার মত বুদ্ধি তাঁর ছিল না। তা না থাক, চার-পাশে যারা ছিল, তাদের তো ও বালাই একেবারেই নেই। অগত্যা তিনি ছাড়া কে আর ভাব্‌বে?

সবাই অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তাঁর দিকে। গোধূলির আবছা আলোকেও তিনি স্পষ্ট লক্ষ্য করলেন যে, শত শত ভীতি-বিহ্বল সাদা-মুখ তাঁর দিকেই হাঁ'করে আছে। থেকে থেকে কামানের গুড়ুম্ গুড়ুম্ আওয়াজ হচ্ছে। তার ফাঁকেও তিনি ওদের ফিস্‌ফিসানি শুন্‌তে পেলেনঃ লোকটা যে-সে নয় তো—ভার্জিনিয়ার জেনারেল জর্জ ওয়াশিংটন! হাঁটা দেখ্‌লেই মালুম হয় যে মাথায় একটা কিছু রয়েছে—এখনও বলছেন্ না।

কাঁঠের একটা বেড়ার দিকে পিছন ফিরে একপাশে দাঁড়িয়েছিল নক্স আর পুটনাম। গোধূলির সিঁদুরে আকাশের পটভূমিতে প্রধান সেনাপতি তাদের কাছে বিশালকায় অতিমানব বলে প্রতিভাত হচ্ছিল। আমেরিকান গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান অধিকর্তা নক্স ছাব্বিশ বছরের যুবক, আনন্দদীপ্ত-চক্ষু, লাল টকটকে গাল, মোটাসোটা হোৎকা চেহারা। চারটি জিনিস তার পরম প্রিয়—বই, তার কামান, স্ত্রী আর প্রধান সেনাপতি। কিন্তু কি-ই বা এখন আছে তার বাহিনীর? লম্বা, অস্থিসার শিয়াল-শিকারীকে সে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করত। মনে করত সমস্ত ভয়-ভীতি অনিশ্চয়তার উর্ধে। দেহীর কামনা-বাসনা শোক-দুঃখ তাঁকে স্পর্শ করে এই ধারণাই ছিল না নক্সের। যুদ্ধের পূর্বে নক্স ছিল বই-বিক্রেতা। কিন্তু উচ্চাভিলাষ ছিল গগনস্পর্শী। শক্তি-শালী নতুন লেখকদের উৎসাহ দিয়ে বেন ফ্রাঙ্কলিনের মত ভাল ভাল বইয়ের হু-হু করে সংস্করণ বার ক'রবার স্বপ্নসাধ তার ছিল। পুস্তক-বিক্রেতা হিসাবে প্রথম সংস্করণের বই যে সমাদর তার কাছে পেয়েছে, আজ গোলন্দাজ দলের অধিকর্তা হিসাবে সে সমাদর পায় কালো, গোলমুখো কামানগুলো। আজ তার স্বপ্নের রূপ্ বদলে গেছে। সহস্র কামানের যুগপৎ অগ্নিবর্ষণের স্বপ্নে বিভোর নক্স।

কামানগুলোকে অদ্ভুত আদর-যত্ন করত সে। দিনে-রাত্রে পাঁচ দশ বার সেগুলো গুনে ঠিকঠাক করে রেখেছে। কামান নিয়ে ঘুমান প্রসঙ্গে বহু অশ্লীল ইঙ্গিত করেছে সঙ্গীরা। কিন্তু নক্স আমল দেয়নি। কামানের কাছাকাছি শুতে পারলে আর কোথাও সে যেত না। আজ প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে নক্স। প্রায় সন্তান হারাবার দুঃখ। দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে কুড়িয়ে, চাকা ঠেলে, টেনে যে ক'টি কামান সে জড়ো করেছিল আজ তা' শত্রুর দখলে! মহামূল্য সম্পদহারা নক্স আজ সর্বহারা ফকির। সর্বস্ব হারাবার শোকে মুহ্যমান। এই মনমরা অবস্থার মধ্যেও একটি লোক তাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, তাকে আত্মবিস্মৃত করতে পারে। সে ওই ম্লানায়মান গোধূলি দিগন্তের পটভূমিকায় দাঁড়ান শিয়াল-শিকারী।

—দেখুন, দেখুন। প্রধান সেনাপতির দিকে তাকান!—নক্স বল্লে জেনারেলকে।

কিছুই করবার নেই, তাই মনমরা ভাবে জবাব দিলেন পুটনাম—হাঁ, দেখেছি।

—কেমন ধীরস্থির দেখেছেন? বিস্মিত নক্স আবার বলে।

—হাঁ, খুব ধীরস্থির বলেই তো মনে হচ্ছে হ্যারি।

—মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লেও ঠিক অমনিভাবেই থাকবেন।

—ভেঙে তো পড়েছে। নক্সের হেঁয়ালী কথার ঢঙে বিষম চটে গেলেন পুটনাম। যখন তখন বাজে বইয়ের খেলো কথা কপ্‌চাবার বদস্বভাব কি ওর যাবে না?

সবাই যখন তাঁকে শুয়ে বিশ্রাম করবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল বড়-আদমী বুঝলেন যে তাঁর অমানুষিক স্থৈর্যের মুখোশ কাজ দিয়েছে,—অন্তত সাময়িকভাবেও এদের দুঃখদুর্ভোগ ও পরাজয়ের গ্লানি ভুলিয়ে আত্মবিস্মৃত করতে পেরেছে। তাঁর অভিনয় সার্থক। কিন্তু তিনি জানতেন, এ বিস্মৃতি সাময়িক। রাত্রির বিশ্রামান্তে বিজয়োল্লাসিত ইংরেজ ও জার্মান সেনা আবার আঘাত হানবে প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই। তখন এই পরাভূত ছত্রভঙ্গ আমেরিকান জনতা পালাবার পথ পাবে না। নদীর দিকে ঠেলে নিয়ে কচু-কাটা করবে তাদের—হাঁসের মত পুকুরে আট্‌কে সাবাড় করবে।

কেউই জানত না, সে-দিন বিকেলে স্থৈর্যের মুখোশ বজায় রাখতে কত

কষ্ট করতে হয়েছে তাঁকে। ভেতরে ঝড়-তুফান সত্ত্বেও বাইরে সংযম হারাননি। প্রাণপণ চেষ্টা করে, জোর করে, ধীরে-সুস্থে যুক্তি-তর্ক দিয়ে কর্তব্য স্থির করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সামনে তখন মাত্র তিনটি পথ খোলা ছিল। তার যে কোন একটি বেছে নিতে হবে। প্রতিটি পন্থা, প্রতিটি কার্যক্রম তিনি মনে মনে চুল-চেরা যুক্তিতর্ক দিয়ে পরখ্ করবার চেষ্টা করেছেন।

প্রথম পথ আত্মসমর্পণের পথ। সব চাইতে সহজ, সে অবস্থায় সব চাইতে স্বাভাবিক সিধান্ত। এক একবার মনে হয়েছে, ছেড়ে দিই এই ব্যর্থ-সংগ্রামের পাগলামি—ছেড়ে দিই পল্টনের নামে এই ভীরু ইতর লোকের সংশ্রব! সসম্ভ্রমে অস্ত্রত্যাগ করে চলে যাই পোটোমাক পাহাড়ের নিরালা গৃহকোণে! অনেকে হয়ত নিন্দা করবে—হয়ত কুৎসা রটনা করবে। কিন্তু অনেকে আবার প্রশংসাও করবে! আর পাত্‌সির মত যারা, তারা অন্তত ভুল বুঝবে না! কিন্তু এই চিন্তা কোনকালেই মনে তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। সংশয়ের অনিশ্চিত স্তর অতিক্রম করে সুস্পষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেনি। এমনি একটা পরিণতির কল্পনাও করা উচিত বলে মেনে নিতে তাঁর বেঁধেছে। কাজেই এ প্রস্তাব পুরোপুরি বিবেচনা করতে পারেননি। মৃত্যুও তো এমনি আত্মসমর্পণের সামিল। তাতেও এমনি শান্তিই আস্‌বে। কিন্তু মৃত্যুবরণ করা ছাড়া অপর কোন পথ নেই—এই গত্যন্তরহীন নিরুপায় অবস্থা শিরো-ধার্য করে নেবার মত নিরাশ তখনও তিনি হন্‌নি'।

দ্বিতীয় পথ সংগ্রামের পথ। আজ তিনি যদি সৈনিকদের জমায়েৎ করে বলেন যে শেষ লোকটি বেঁচে থাকা পর্যন্ত তিনি ইংরেজদের বাধা দেবার সিদ্ধান্ত করেছেন, তাহ'লে দেশের জন্য প্রাণ দেবার গর্বে তারা উল্লসিত হবে না। তাঁর উদাত্ত আহবান তাদের ভীতিবিহবল মুখে হাসি ফোটাতে পারবে না। বরং ম্রিয়মান চোখে হাঁ করে চেয়ে থাকবে তাঁর দিকে। আর নাবালক যারা—অধিকাংশই তো নাবালক, তারা নিরালা পল্লী-জীবন, প্রিয়-পরি-জনের কথা স্মরণ করে নীরবে চোখের জল মুছবে। কিন্তু ইয়োরোপের বস্তি-আস্তাকুঁড় থেকে যে আধা-বিদেশীরা এসে তাঁর দলে ভিড়েছে মনে প্রাণে বিপ্লবী তারা। তারা এই সিদ্ধান্তে উৎফুল্ল হতে পারে। কিন্তু সংখ্যায় তারা ক'জন? গোটা পল্টনের সামান্য অংশ মাত্র। ইংরেজী বল্‌তে পারে না তাদের অনেকেই। অধিকাংশই দুর্বল, রুগ্ন, শৃংখলাহীন।

নক্স, পুটনাম, কার্টার এবং ডী'র মত কিছু সুস্থ-সবল জওয়ান ফৌজ-

দার তাঁর আছে। দুনিয়ার কোন ভয়ই তারা পরোয়া করে না। বিপদকে বিপদ বলেই ভালবাসে। তাঁর সংগে নরকে যেতেও তারা প্রস্তুত। কিন্তু গোনা-গুনতির জনকয়েক সেনানী নিয়ে তো আর লড়াই জেতা যায় না! এক দুই করে মনে মনে তিনি তাদের সংখ্যা গুনতে লাগলেন। সংশয়, শংকা ও রোগক্লেশ-মুক্ত এদের দানবীয় দৈহিক শক্তিমত্তার কথা ভেবে তাঁর কেমন হিংসা হল।

তাছাড়া লড়াই করলেও এমন নতুন কিছু ঘটবার সম্ভাবনা নেই। ইংরেজদের প্রথম আক্রমণের মুখেই পরাভূত আমেরিকানরা ছত্রভংগ হয়ে জার্মানদের নিষ্করুণ কীরিচের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য আর্তনাদ করে পালাবার চেষ্টা করবে। লড়াই এবং আত্মসমর্পণের ফল হবে একই। লড়াই করলে শুধু আরও কয়েক শ' ইয়াংকি যুবক প্রাণ হারাবে ; আর কয়েক হাজার গ্যাংগ্রিনের বিষ-বেদনায় ছটফট করবে। তাছাড়া আবার যদি তারা লড়াই করেন, তাহ'লে আত্মসমর্পণের শর্ত মোলায়েম হবার কোন আশা নেই। মৃত্যু বরং সওয়া যায় ; কিন্তু ফাঁসির দড়ি অসহ্য।

—তাহ'লে বিপ্লবের কি হবে? আপনমনে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি। গোটা পল্টনের বাঁচা-মরার বাস্তব প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে, বিপ্লবের মত ধোঁয়াটে জিনিসের কথা এখন কল্পনা করাও অসম্ভব। আজ যদি রুখে দাঁড়িয়ে তাঁরা লড়াই করেন তাতে গোটা বিপ্লবের এমন ইতর-বিশেষ হবে না।

তাহ'লে আর পথ থাকে মাত্র একটি। সে পথ পলায়নের পথ—পশ্চাদ-পসরণের পথ। আজ যদি তাঁরা পিছু-হটে যেতে পারেন তবে গোটা পল্টন বেঁচে যায়। অন্তত আবার তোড়জোড় করে ইংরেজরা যতক্ষণ মানহাট্টান দ্বীপ আক্রমণ না করে সে পর্যন্ত তো বটেই। পিছু-হটে গেলে ভীত-ত্রস্ত সৈনিকদের সুসংবদ্ধ করবার আর একটা সুযোগও পাওয়া যায়—শহর রক্ষার জন্য যে পল্টন তিনি মোতায়েন করেছেন তাদের সংগে মিলিত হবার অবসর মেলে। তিনটি পথের মধ্যে একমাত্র পশ্চাদপসরণের পথই বিবেচনার যোগ্য : অথচ এই পথই সব চাইতে দুরূহ। প্রায় অসম্ভব।

একটা জিনিস খুবই স্পষ্ট। এখনও হাজার হাজার সৈনিক রয়েছে তাঁর দলে। এই বিরাট পল্টন হটিয়ে নিয়ে যাবার তোড়জোড় করবার মত সময় নেই একেবারেই। অন্ধকার হয়েছে। রণক্ষেত্রের কোলাহল হৈ-চৈ ছুটোছুটি থেমে গেলেও তার স্থান নিয়েছে ছাউনীর নিরাশ, ক্ষুব্ধ থমথমে ভাব। সকলেই জানে পেছনে খরস্রোতা নদী, পালাবার পথ নেই। এইজন্যই এখনও

তারা ছাউনীতে রয়েছে। কিন্তু একবার পশ্চাদপসরণের কথা কানে দাও; অমনিই আগে নদীর পাড়ে যাবার জন্য হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি পড়ে যাবে।

তাছাড়া নৌকা কোথায়? আর নৌকা যদি পাওয়াও যায়, গোলা-গুলী বর্ষণের মুখে মেজাজ ঠিক রেখে নৌকো বাইবার মত মাঝি-মাল্লা পাবে কোথায়?

ফৌজদাররা ঘিরেছিল তাঁকে। তাদের দিকে চেয়ে মনে পড়ল যে অনেকক্ষণ পায়চারি করেছেন।

—কিছু মুখে দেবেন না স্যর?—মিনতির সুরে বল্লে নক্স।

—হাঁ, নিশ্চয়ই খাবো! তুমি কিছু খেয়েছো হ্যারি?

—আমি স্যর? হাঁ, আমি খেয়েছি।

—কি খেলে? স্টু?

—কিন্তু স্যর, চমৎকার স্টু হয়েছিলো স্যর!—মাথা নেড়ে সায় দিয়ে হোৎকা বই-বিক্রেতা জানাল। —সঙ্গে মদও ছিলো। একটা বোতল আমি রেখে দিয়েছিলাম।

তা-ভাল! মাথা নেড়ে মুচ্‌কি হেসে জানালেন প্রধান সেনাপতি। তাঁর প্রসন্ন হাসির মধ্যে মানসিক শান্তির সংকেত পেয়ে ফৌজদাররা আরও কাছে ঘেঁষে এল এবং তাঁকে ঘরে নিয়ে গেল। তাঁর কাছে-কাছে থাক্‌তে, তাঁর সেবা-যত্ন করতে, তাঁর সুদর্শন দীর্ঘ চেহারা থেকে সান্ত্বনা লাভ করতে এরা যে কত ব্যাকুল তা আর একবার টের পেলেন প্রধান সেনাপতি। একে তো এরা নাবালক তায় আবার ভীত, আর তিনি ধীরস্থির। তাই এরা ধরে নিয়েছে যে তাদের সমস্ত দুর্দশা ও বিপদের আসান করবার দাওয়াই তাঁর হাতের মুঠোয়।

তাবুতে কোন আলো ছিল না। অন্ধকার থেকে ভালই হয়েছে। শিয়ালশিকারীর গলা আট্‌কে এসেছে। চোখের কোণে দেখা দিয়েছে অশ্রু। নিজে তিনি নিঃসন্তান। কিন্তু আজ এই কচিমুখো সেনানীদের নিজের সন্তান বলেই মনে হচ্ছে। একজন সযত্নে তাঁর বুট খুলে দিচ্ছে। আর একজন কোট খুলতে সাহায্য করছে। অপর একজনে কোমরের তরবারি খুলে দিচ্ছে। এত বিনযী, এত দরদী এদের আচরণ যে, এদের প্রতিটি স্পর্শ মমতা-মাখানো বলে মনে হচ্ছে। একা তিনি কেন, এরা সকলেও জান্‌ত যে, তাদের অসাধ্য সাধনের প্রয়াস বানচাল হ'য়ে গেছে। তবু এদের আজকের আচরণ দেখে তিনি বুঝলেন, এদের তিনি প্রতারিত করেননি।

আঠারো বছরের এক ক্যাপ্টেন বল্লেঃ স্যর, এখানে শুয়ে আপনি আরাম করুন ; আমি বালিশটা উঁচু করে দেবো'খন।

কার্টার সযত্নে তাঁর কোটটি ভাঁজ করে রাখ্‌ল।

মমতা-মাখানো স্বরে নক্স বল্লেঃ এই দেখুন স্যর, জুতোজোড়া বিছানার পাশেই রেখে দিলাম। পা দিলেই পেয়ে যাবেন।

প্রধান সেনাপতির চাইতে বয়সে বড় পুটনাম। তিনি তাঁকে নিশ্চিন্তে ঘুমোবার পরামর্শ দিলেন। চাপা গলায় বল্লেনঃ টেনে ঘুম দিন্, তাহ'লেই সকালবেলা সবকিছু নতুন করে ভাবা যাবে।

—তাঁবুর পরদা কটা ফেলে দিয়ে যাবো স্যর?—ফিস্‌ফিস করে জিজ্ঞাসা করল' ক্যাপ্টেন।

তাঁকে অন্ধকারে রেখে সবাই পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল। ঘণ্টাখানেক শুয়ে রইলেন তিনি। কিন্তু ঘুমোতে পারলেন না। বহু সপ্তাহ, বহু মাসের সঞ্চিত কথা ও কাহিনী ডিঙিয়ে তাঁর মনে পড়ল সেদিনের কথা, সৈনাপত্য গ্রহণের জন্য যেদিন ফিলাডেলফিয়া থেকে অশ্বারোহণে যাচ্ছিলেন তিনি উত্তরে বোস্টনের দিকে। এই দীর্ঘ পথ চল্‌তে গিয়ে কত শংকা, কত সংশয়, কত না আন্দোলন জেগেছে মনে। বহু জনপদ, বহু শহর থেকে লোকজন গিয়েছে পল্টনে। পথ চল্‌তে চল্‌তে বহু গণসেনার কোম্পানী পরিদর্শন করতে হয়েছে। এত বক্তৃতা করেছেন বড় চাষী যে শেষ পর্যন্ত তাঁর বক্তৃতা একটা বাঁধাধরা গৎ হয়ে ওঠেঃ 'আজিকার এই শুভদিনে আপনাদের সংগে মিলিত হবার সুযোগ পেয়ে আমি পরম আনন্দ লাভ করেছি।' কিন্তু এ সত্ত্বেও নয়া-ইংলণ্ডের ইয়াংকিদের অভ্যর্থনা সম্পর্কে সংশয় তাঁর কাটেনি। বাংকার পাহাড়ে লড়াই করেছে ইয়াংকিরা। এখন বোস্টনের কাছাকাছি তাঁর অপেক্ষায় আছে। কিভাবে তাঁকে গ্রহণ করবে ইয়াংকিরা?

তারপর একদিন অশ্বপৃষ্ঠে তাদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন নীল-কোট-পরা প্রধান সেনাপতি। এত দীর্ঘ এমন সুদর্শন অভিজাত চেহারা ইয়াংকিরা দেখেনি কোনকালে। নিজের পল্টনও দেখলেন প্রধান সেনাপতি। হাজার হাজার তাঁতে-বোনা পরিচ্ছদ-পরা গেঁয়ো ইয়াংকির মেলা বসেছে যেন। যার যেভাবে খুশী গাদা-বন্দুকটা ঝুলিয়ে কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে আছে, কেউ থুক ফেলছে, আবার কেউ বা মুখ গোমরা করে পুরু করে কাটা তামাক চিবোচ্ছে। তাঁকে দেখে সবাই প্রাণহীন কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল, ফিস-ফাস করে কি যেন বলাবলিও করল। এদের সামনে রয়েছে সেনানীরা।

শহর থেকে আরও সৈন্য আস্‌ছে আমাদের বলবৃদ্ধির জন্য! দম নিয়ে বল্লে ছেলেটি।

—জেনারেল মিফ্‌লিন আসছে? গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন শিয়াল-শিকারী।

—হাঁ স্যার, হাঁ! বড় আদমীর প্রশান্তভাব ছেলেটির উত্তেজনার 'পর যেন ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিল। —বলুন স্যার, এখন আমরা ওই ব্যাটাচ্ছেলে গল্‌দা চিংড়িগুলোকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিই? উত্তেজনা-চঞ্চল ছেলেটি স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না। —ভোর হলেই ওরা আমাদের আক্রমণ করবে, না স্যার? আজ্ঞে স্যার, আপনার কি মনে হয়? সহসা নিজের ধৃষ্টতা উপলব্ধি করে শেষের দিকে তার গলাটা শুকিয়ে গেল। —জেনারেল পুটনাম বল্লেন, আপনি যদি ঘুম থেকে উঠে থাকেন তাহ'লে খুশী হলে আপনি জলের কিনারে যেতে পারেন।

—একটু পরেই যাচ্ছি আমরা।—তেমনি ঠাণ্ডা মেজাজেই জানালেন ভার্জিনিয়ান।

—একটু পরে স্যার?

ছেলেটির উপর তাঁর কথায় প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে মাথা নেড়ে পুনরুক্তি করলেন প্রধান সেনাপতি। এ কথা যদি রটে যায় যে ওয়াশিংটন আদৌ বিচলিত হননি, এমন কি শহর থেকে শক্তিবৃদ্ধির সংবাদ শুনেও বিন্দুমাত্র উৎসাহ বোধ করেননি', কিছুই আসে যায় না তাতে। বরং একদিক থেকে ভালই হবে। নতুন যে ফৌজ আস্‌ছে শক্তিবৃদ্ধির জন্য একবার তারা যদি জানতে পারে যে মৃত্যুর ফাঁদে পা দিচ্ছে, যদি বোঝে যে, ইতিমধ্যে যে ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে তা সত্ত্বেও কাজ চালাবার মত মনোবল প্রধান সেনাপতির নেই তাই সুনিশ্চিত মরণের ফাঁদে টেনে আনছেন আরও সৈন্য, তাহ'লে যে অবস্থা দেখা দেবে তার চাইতে এ রটনা বরং ভাল।

মিনিট পাঁচেক তাঁর মনের মধ্যে আবার এক দ্বন্দ্ব দেখা দিল। ছেলেটির কাছে তিনি নিজেকে বীর বলে জাহির করবেন, না তার কাছ থেকে নদীতীরের ঘটনাটা জেনে নেবেন। দুটোর জন্যই প্রবল আগ্রহ হচ্ছিল। অবশেষে ঘড়ির দিকে চেয়ে বল্লেনঃ চলো লেফ্‌টেন্যাণ্ট, আমি এখুনি যাবো।

বুক চিতিয়ে সগর্বে আগে আগে চল্ল ছেলেটি পথ দেখিয়ে। প্রধান সেনাপতির সঙ্গে যাচ্ছে সে। ভাবলে, ব্যাপারটা বহু বন্ধুবান্ধবেরই চোখে পড়বে। পথেই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হল। বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে এক

নতুন আশায় চাঙা হয়ে উঠলেন প্রধান সেনাপতি। বৃষ্টি হলে বারুদ ভিজে তাল পাকিয়ে যাবে—চকমকি পাথরও জ্বলবে না। আশার আনন্দে এমন উত্তেজনা দেখা দিল যে তাঁর গোটা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। এত উত্তেজনা সত্ত্বেও ধীর-স্থিরভাবে তিনি বালকটির পাশাপাশি হেঁটে চল্লেন। নিতান্ত স্বাভাবিক গলায় তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমার নাম কি স্যর?

—আজ্ঞে স্যর! আমার নাম টম ল্যাক্ওয়ে।

—আজ্ঞে স্যর, আজ্ঞে স্যর বলবার কোন দরকার নেই। তোমার বয়স কত হলো?

—বয়স স্যর, সতেরো বছর।

ভুরু টান করে তাকালেন প্রধান সেনাপতি। ছেলেটি অমনিই ভেঙে বল্লেঃ আজ্ঞে, গত এপ্রিল মাসে আমি সতেরো পার হয়ে গেছি।

—ওঃ! কবে তুমি অফিসারের কমিশন পেলে?

—আজ্ঞে, ওটা শখ করে পরেছি। টুপীতে লাগান পালকের উপর হাত বুলিয়ে থতমতভাবে জবাব দিলে ছেলেটি। এবার কিন্তু তার স্যর সম্বোধন করতেও ভুল হয়ে গেল। ফের বল্লে সবিনয়েঃ ওটা গতকাল পরেছি।

—তোমার অফিসার কি মারা গেছে?

—না, তিনি ভেগেছেন। ছেলেটি জবাব দেয়।

ভার্জিনিয়ান নদীর কিনারে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই জোর বৃষ্টি এল। নিউইয়র্ক শহরের গীর্জার গম্বুজ এবং ত্রিকোণ দেয়ালের পর বসানো ঘরের চাল তখন কুয়াশায় আবছা হয়ে গেছে। তাঁর কক্-হ্যাট্ ভিজে ঝুলে পড়েছে, উর্দি ভিজে চুপ্চুপে হয়েছে; কিন্তু মুখের নির্লিপ্তভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি। ওটা ঠিক বজায় রেখেছেন। তবে মিফলিনের সঙ্গে করমর্দন করবার সময় তাঁর হাত কাঁপছিল।

—তিন রেজিমেণ্ট এনেছি স্যর! গর্ব ভরে জানাল মিফ্লিন। উচ্চাভিলাষী সে। ত্রিশ বছর বয়েসে কংগ্রেসে এসেছে। কিন্তু দু' বছর যেতে না যেতেই, বত্রিশ বছরে জেনারেল পদে উন্নীত হয়েছে। এই তো সবে শুরু। এখনও তো বলতে গেলে গোটা কর্মজীবন পড়ে রয়েছে। ক্ষমতা ও পদমর্যাদার উচ্চশিখরে উঠবার বিরাট সম্ভাবনা তার সম্মুখে! হামেশাই এইসব কথা যখন মনে পড়ে, অবাক হয়ে যায় মিফলিন। রয়ে-সয়ে কাজ করবার

ধাত তার নয়। তাছাড়া যে লোকটাকে সে নিতান্ত বোকা বলে মনে করে তাঁর সম্পর্কে সে ঈর্ষান্বিতও বটে।

—শুনলাম কালকের হাল-চাল ভাল যায়নি।

মাথা নেড়ে সায় দিলেন ভার্জিনিয়ান। মিফলিনের প্রচ্ছন্ন শ্লেষ বুঝতে বিলম্ব হল না। সমস্ত বুদ্ধিমান লোকই তো এমনি ছোট্ট খোঁচার মধ্য দিয়ে তাদের ঘৃণা প্রকাশ করে থাকে। তিনি জানতেন যে লোকজনসহ মিফলিনকে নিউইয়র্ক ফিরে যাবার কথা বলবার হিম্মত তাঁর নেই। কাজেই চুপ করে দাঁড়িয়ে সৈন্যদের তীরে অবতরণ দেখতে লাগলেন।

তাদের কাজকর্মের মধ্যে কেমন খানিকটা শৃংখলাবোধ চোখে পড়ে। ব্রুক্লিন আস্বার পর এই প্রথম তাঁর শৃংখলা নজরে পড়ল। যেমনটি হওয়া উচিত ঠিক তেমনিভাবে নৌকা আসা-যাওয়া করছে। কোন গোল-মাল নেই। মাঝিমাল্লাদের দেখেও বেশ ওস্তাদ বলেই মনে হয়। এই সুশৃংখল কাজকর্ম দেখে তিনি এত মুগ্ধ হয়ে পড়লেন যে মুহূর্তের জন্য তাঁর অবিচলিত স্থৈর্যের মুখোশ অন্তর্হিত হ'ল। প্রধান সেনাপতির এই ভাবান্তর মিফলিনের সতর্ক দৃষ্টি এড়াল না। মাঝিদের দেখিয়ে গর্বভরে বল্লেঃ বেশ ওস্তাদ মাঝি!

ওস্তাদ মাঝিই বটে! মনে মনে ভাবলেন শিয়াল-শিকারী। জলের মধ্যে তাঁর নিজেরও কোন দিক্-দিশা থাকে না। কাজেই কোনদিন তিনি নৌবহর, এমন কি জলের প্রতিবন্ধকের কথাও চিন্তা করেন না; আর সেইজন্যই ব্রুকলিনের মরণ ফাঁদে ধরা দিয়েছেন। মাঝিদের দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে, নিজেদের কাজকর্ম তারা বেশ জানে এবং বোঝে। এই রোদেপোড়া কড়া-চামড়ার লম্বামুখো মাঝিরাও ইয়াংকি। কিন্তু এদের মুখে চোখে যে আত্মবিশ্বাসের ছাপ রয়েছে, নয়া-ইংলন্ডের ইয়াংকিদের তা নেই। সবাইর পরনে নীল জ্যাকেট, গায়ে তেলো চামড়া। তাহ'লেও এদের পরিচ্ছদের মধ্যে একটা সমতা আছে। কিন্তু আরও পাঁচটা জিনিসের মত তাঁর পল্টনের মধ্যে এই সমতাটুকুও নেই। যাই হোক, এই মাঝিমাল্লাদের একটা বিশিষ্ট ধরন আছে স্বীকার করতেই হবে।

—এরা কারা? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

—গ্লোভারের রেজিমেণ্ট। মার্বলহেডের জেলে। মাঝিগিরির কাজে ভারি ওস্তাদ। আমার লোকজন দিয়ে পারাপারের কাজ না করিয়ে এদের

নিয়োগ করেছি। লড়াই ক'রতে না জানলেও মাঝিগিরিতে পাকা হাত এদের। হবেই বা না কেন? সারা জীবনই তো জেলের কাজ করেছে।

—জেলে? আস্তে বল্লেন শিয়াল-শিকারী। —কতজন আছে? বৃষ্টি বেড়েছে। হাতের পাতা দিয়ে জল ঠেকাবার চেষ্টা করছেন ভার্জিনিয়ান। এই অর্থহীন প্রচেষ্টার মধ্যেও খানিকটা আরামবোধ আছে। বেলা বাড়ছে; তবু ইংরেজদের আক্রমণের কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না।

—ছ' সাত শ' হবে। মিফলিন জানাল।

—ছ' সাত শ'! তাঁর মনে আবার এক দ্বন্দ্ব দেখা দিল। বৃষ্টি ছেড়ে একটা মাথা গুঁজবার জায়গায় দাঁড়াবার অনুরোধ করল মিফলিন। কথাটা তাঁর কানেই গেল না। এই সর্বনাশা কুহেলির জাল থেকে উদ্ধার পাবার চিন্তায় তিনি অনন্যমনা। —'এক্‌লাই আমাকে একাজ করতে হবে!' বারবার মনে মনে আওড়াচ্ছেন ওয়াশিংটন।

জীবনে এই প্রথম তিনি ভীত সাধারণ সৈনিকদের মনোভাব বুঝবার চেষ্টা করলেন। তাদের অন্তরে প্রবেশ করে তাদের মত বিচার-বিবেচনা করবার চেষ্টা করলেন। পশ্চাদপসরণের পথ তাঁকে বাৎলাতেই হবে। অপূর্ব সুযোগ দিয়েছে আজকের এই প্রভাতী বর্ষণ। বৃষ্টিই সফল হবার একমাত্র ভরসা। কিন্তু গোটা পল্টনের মধ্যে একথা কারও কাছে প্রকাশ করা চলবে না। তিনি ছাড়া আর কেউ যদি টের পায় তাহ'লে পরাভূত বাহিনীর পশ্চাদপসরণ ছত্রভঙ্গ পলায়নে পরিণত হবে। রুখ্‌বার কোন উপায় নেই। তিনি চেয়েছেন গর্বোন্নত সুশৃংখল এক বাহিনীর নায়ক হতে, কিন্তু আসলে তাঁকে নেতৃত্ব করতে হচ্ছে নাবালক আর মূর্খ নিয়ে গড়া এক ভীতিবিহ্বল জনতার। কিন্তু আজ তিনি তাদের ভুল বুঝলেন না—আত্মপ্রবঞ্চনাও করলেন না।

—স্যর! মিফলিন ডাকল।

প্রবল বর্ষণের মধ্যে মিনিট দশেক নীরবে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বড় আদমী। ক্লান্ত বৃদ্ধ পুটনাম অতি কষ্টে ঢালু পথ বেয়ে নেমে এলেন তাঁর কাছে। প্রধান সেনাপতি দেখতে না পান এমনিভাবে ঘাড় ঝাঁকানি দিয়ে মিফলিন ইংগিতে বোঝাতে চাইলেন পুটনামকে যে, ভার্জিনিয়ানের মাথা বিগড়ে গেছে।

—স্যর! মিফলিন আবার ডাকল।

যেখানেই প্রধান সেনাপতি দাঁড়ান একদল সেনানী এসে তাঁকে ঘিরে ধরে।

বৃষ্টির মধ্য থেকে তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য ব্যগ্রভাবে তারা ভার্জিনিয়ানের চারপাশে ভীড় করল। কিন্তু মুখ ফুটে সেকথা বলবার সাহস হল না কারও।

—আজ ওরা আক্রমণ করবে বলে মনে হচ্ছে না। পুটনাম বল্লেন। বাত ও কোমরের ব্যথায় তিনি এত অস্থির যে খুব হিসেব করে কথাটা বলেননি। —আবহাওয়া পরিচ্ছন্ন হ'লে যখন আক্রমণ করা যাবে তখন কেন কাদা বৃষ্টির মধ্যে লড়াই করবে?

পিছু হটবার প্রস্তাব করতে সাহস হচ্ছিল না কারও। অথচ সবাইর মনেই কথাটা আলোড়ন সৃষ্টি করছে। সকলেই আশা করছিল, প্রস্তাবটা প্রধান সেনাপতির কাছ থেকেই আসবে। সবাই উৎসুক আগ্রহে চেয়ে রইল ভার্জিনিয়ানের দিকে। গা-ঝাড়া দিয়ে টান হয়ে দাঁড়ালেন প্রধান সেনাপতি। বল্লেনঃ না, আমরা পিছু হটতে পারি না। কিছুতেই না!

সেনানীরা বিস্ময়ে হতবাক্। প্রধান সেনাপতি নিশ্চয়ই উন্মাদ হয়েছেন!

—আপনারা শুনুন! ধীর গম্ভীর ভাবে ভেঙে বল্লেন প্রধান সেনাপতি। —রুগ্ন আর আহতদের আমরা নিউইয়র্ক নিয়ে যাবো; আর সেখান থেকে নিয়ে আসবো নতুন সেনা বলবৃদ্ধির জন্য। আমি চাই, যেখানে যে নৌকো পান আজকের মধ্যে এই নদীর কিনারে এনে জড়ো করবেন। নৌকো, ডিঙি যা পাওয়া যায়! নর্থ নদী থেকে সব নৌকো নিয়ে আসুন। প্রণালী থেকে নিয়ে আসুন জেলে ডিঙি। যেখানে যা পান, আজকের মধ্যে এনে ব্রুকলিনে জড়ো করবেন। যেভাবে হোক সব নৌকো আমার চাই। আর কর্ণেল গ্লোভার, আপনার সব জেলেদের নিয়ে আসবেন এই নদীর কিনারে। এইখানে, এই নদীর কিনারে, বুঝলেন?

আদেশ-নির্দেশ দিয়ে ক্লান্ত দুর্বল পদে ভীড়ের মধ্য দিয়ে ডাঁটের মাথায় ঘাঁটিতে ফিরে গেলেন প্রধান সেনাপতি। বুঝলেন তাঁর চাল সফল হয়েছে। মানুষ-ঠকাবার ছলাকলা তিনি জানতেন না। আর যাই থাক, এ গুণ তাঁর ছিল না। কিন্তু কেমন করে আজ তিনি মনোগত অভিপ্রায় গোপন করতে পারলেন? নিজেই অবাক্ হয়ে যাচ্ছেন ওয়াশিংটন।

পশ্চাদপসরণ

তাঁবুতে ব'সে আছেন প্রধান সেনাপতি। অসাড়ে বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। এক একবার ঘড়ি দেখছেন আবার ক্যানভাসের পর বৃষ্টির টাপ্‌টুপ্‌ শব্দ কান পেতে শুনছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে এমনিভাবে। হাত পা' গুটিয়ে ভাবা ছাড়া কিছু করবার নেই। কমসে কম চব্বিশ ঘণ্টার আগে কাজ শুরু করবার মত নৌকো পাওয়া যাবে না।

খানিকটা বাদে এই পরিকল্পনার কথা সেনানীদের খুলে বলতেই হবে। না জানিয়ে কোন উপায় নেই। হাজার হাজার সৈন্যের পশ্চাদপসরণের বন্দোবস্ত করা এক্‌লা একটা লোকের অসাধ্য। বহুত ঝক্কি আছে। আর সে কারসাজিও নিশ্চয় ধরা পড়ে যাবে। তাছাড়া, যদি কোন একটা বিষয়ে গোলমাল হয়ে যায় তাহ'লে তাসের ঘরের মত গোটা পরিকল্পনা খান্‌খান্‌ হয়ে ভেস্তে যাবে।

তবু এখন এই মুহূর্তে কিছুই করবার নেই। সৈনিকেরা যদি টের পায় যে তিনি নিশ্চিন্তে তাঁবুতে বসে আছেন তাহ'লেও তারা খানিকটা আশ্বস্ত হবে। তাঁর ধৈর্যের সঙ্গে পাল্লা দেবার মুরদ কাঁচিমুখো সেনানীদের নেই। কিন্তু তিনি বসে থাকলেও তারা স্থির থাকতে পারছে না। উসপিস খুট্‌-খাট্‌ ফিস্‌ফাস্‌ করছে আর দু' পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর এক একজন তাঁবুর মধ্যে মাথা গলিয়ে উঁকি মারছে। ছোট্ট একটা টেবিলের কাছে বসে নীরবে লিখে যাচ্ছেন প্রধান সেনাপতি। ছেলেরা দেখছে আর শিশ্‌ দিয়ে ফিরে গিয়ে কি দেখল বলাবলি ক'রছে।

—আমার দিকে তাকিয়েছিলেন।

—সত্যি ?

—কথা বল্লেন না, কিন্তু তাকিয়েছিলেন।

—ভাব কেমন দেখ্‌লি ? বিরক্ত ?

—না, বিরক্ত বলে তো মনে হলো না।

—তবে কি হাসছিলেন ?

—হাঁ, বল্‌তে পারিস্‌! একটু খুশী খুশী ভাবই তো মনে হলো!

—উঃ! কি পাথরের মত মানুষ রে বাবা!

রাত বাড়ছে। বিছানায় শুয়ে গড়াগড়ি করছেন ভার্জিনিয়ান। চেষ্টা করেও চোখ বুজতে পারছেন না। শংকা ও সংশয়ের মিছিল চলেছে মনে। বৃটিশ নৌবহর একবার যদি ইস্ট নদীর উজানে পাড়ি দেয় তাহ'লে আমেরিকানদের পশ্চাদপসরণের পথ চিরকালের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। নক্সের ছয় এবং নয় পাউণ্ডার পট্‌কা কামান ইংরেজের বিশালকায় জাহাজের কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু একবার যদি বৃটিশ নৌবহরের একপাশের কামান গর্জে ওঠে, নদীবক্ষে মার্বলহেডের মাঝিমাল্লার টিকিও খুঁজে পাওয়া যাবে না!

কেন তাহ'লে ইংরেজ নৌবহর এগিয়ে আস্‌ছে না? কি বাধা আছে? কিসের অপেক্ষা করছে তারা?

কেন, কেন, কেন? বারবার প্রশ্ন করছেন নিজেকে। তন্দ্রাজড়িত আধ-ঘুমন্ত চোখে ছায়ামূর্তির মত ঘোরাফেরা করছে স্মৃতির মিছিল। তন্দ্রা কেটে গেল। চোখ মেলে ঘড়ি দেখলেন প্রধান সেনাপতি। মাত্র মিনিট কয়েক ঘুমের ঘোর এসেছিল!

মেঘাচ্ছন্ন ভেজা স্যাঁতসেঁতে প্রভাত। নক্স, পুটনাম আর মিফলিন এসেছে প্রধান সেনাপতির তাঁবুতে। সারারাত বৃষ্টি ভিজে তাঁবুটা ঝুলে পড়েছে, জায়গায় জায়গায় জল চোঁয়াচ্ছে। বাইরের টুপ্‌টাপ্ বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে ভেতরের ট্যাপ্‌ট্যাপ্ শব্দের কোন মিল নেই। তাঁবুর মেঝেয় চট্‌চটে কাদা। পুটনাম ও মিফলিন পাশাপাশি বসে আছে নড়বড়ে বিছানায়। শিয়াল-শিকারী বসেছেন তাঁবুর লিক্‌লিকে টেবিলখানার পর: আর দুই পায়ের মধ্যে পচা বিয়ার ভর্তি একটা দস্তার কলসী নিয়ে নক্স বসেছে নীচু একটা বারুদের বাক্সের 'পর। মদ ও ঝোলাগুড় পাশেই আছে। তাতানো লোহার শলা পেলেই দেগে ফ্লিপ তৈরী করবে।

—আর কি চাই আপনার? বসে আছেন কেন? মিফলিন জিজ্ঞাসা করে।

—লোহার শলাটা আসুক! বিয়ারের কথা ভেবে ভুঁড়ি টান করে নক্স জবাব দেয়।

—ততক্ষণ রাম্ আর ঝোলাগুড় ঢালুন না।

—আগে তাতানো লোহার শলাটা আসুক। রসিয়ে বলে নক্স।

—একটু আগে আর পরের মধ্যে কি প্রভেদ আছে?

—ঠিকই বলেছে নক্স। লোহার শলাটা না এলে হবে না। পুটনাম সায় দিয়ে বল্লেন।

—আছে হে, আছে। যা বল্লাম ঠিক সেইভাবেই মিশাল দিতে হবে। না হলে সব মাল নষ্ট হয়ে যাবে।

—ঠিক কথা! লোহাটা না তাতানো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। মাথা নেড়ে আবার সায় দেয় পুটনাম।

—দূর! যত বাজে বুজরুকি!—গড়গড় করে বলে মিফলিন।

চিন্তিতভাবে টেবিলের উপর টোকা দিচ্ছিলেন ওয়াশিংটন। সহসা বলে উঠলেনঃ শুনুন! ফ্লিপ একটু পরে বানালেও কিছু এসে যাবে না।

—মাফ করবেন স্যর! অমনিই বলে উঠল নক্স। পচা বিয়ারের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে অন্যমনস্কভাবে চাট্‌তে লাগল।

—আমরা পশ্চাদপসরণ করবো! ভার্জিনিয়ান বল্লেন নিতান্ত বিনয়ী অনুনয়ের সুরে। পশ্চাদপসরণ শব্দের যেন কোন ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, কোন অন্ত নেই।

তিনজনেই বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে রইল প্রধান সেনাপতির দিকে। নক্সই প্রথম মুখ ফেরাল। তার গোলগাল কচিমুখখানা ভয়ে-বিস্ময়ে কুঁচকে গেছে। ঝোলাগুড়ের একটা টিন তুলে নিয়ে সে বিয়ারের 'পর উপুড় করল। আস্তে আস্তে চুঁইয়ে পড়ছে ঝোলাগুড়, ঠিকমত পড়তে চায় না। টকটকে লাল তাতানো একটা লোহার শলা নিয়ে অস্থিচর্মসার মুখে ব্রণের দাগয়ালা একটি ছেলে এই সময় তাঁবুর মধ্যে উঁকি মারল।

—তাতানো শলা এনেছি স্যর! সভয়ে বল্লে ছেলেটি।

—আমাকে দাও। নক্স হাত বাড়াল।

—রাম ঢেলে নাও! পুটনাম স্মরণ করিয়ে দিলেন।

রামের একটা বোতল নিয়ে মিফলিন বিয়ারের কলসীর মধ্যে ঢেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে নক্স তাতানো লোহার শলাটা ডুবিয়ে দিলে কলসীর মধ্যে। গোটা কলসীর মাল ফচ্‌ফচ্‌ বুজবুজ করে উঠল। ধোঁয়া বেরুল এক ঝলক; সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুময় ছড়িয়ে পড়ল পচা চাম্‌সে একটা খোশ্‌বায়। হাঁ করে কর্তাদের কাণ্ডকারখানা দেখছিল ছেলেটি। পুটনামের সঙ্গে চোখা-চোখি হতেই চমকে বেরিয়ে গেল। নক্স ততক্ষণে শলাটা রেখে দিয়ে মাটির কাপে মাল ঢাল্‌ছে।

মাটির মগ থেকে একটু একটু মাল খাচ্ছেন প্রধান সেনাপতি। মদ্য-

পানের প্রচলিত রীতি মাফিক্ কেউই 'টোস্টের' প্রস্তাব করল না। সে আগ্রহও ছিল না কারও। মিফলিন, পুটনাম আর নক্স হাভাতের মত কলসীতে মগ ডুবাচ্ছে আর গিলছে—ডুবাচ্ছে আর গিলছে।

—মালটা একেবারেই রদ্দি হয়েছে। নক্স বলে উঠল।

মিফলিন বল্লেঃ আমি আপনার ঐ প্রস্তাবের অর্থ বুঝতে পারছি না স্যার। আমার লোকজন নিয়ে এলাম আর আপনি আমাকে পিছু হট্‌তে বলছেন! কেন আমরা পশ্চাদপসরণ করবো স্যার? কেন লড়াই করবো না?

—কারণ আমাদের লোকজন চায় না লড়াই করতে! জানি না কোন-কালেই এরা লড়াই করবে কিনা! কিন্তু এখন এ ছাড়া গত্যন্তর নেই। ইংরেজরা যদি নৌবহর নিয়ে এগিয়ে আসে তাহ'লে সব শেষ হয়ে যাবে। কোন পল্টন না থাকার চাইতে লড়াই-করতে-চায়-না এমন পল্টনও বরং ভাল।

—স্যার, আজ যদি এদের পিছু হটতে বলা হয় তাহ'লে আরও বিশ্রী অবস্থা দেখা দেবে। নক্স বলে।

ঘাড় নেড়ে সায় দেন প্রধান সেনাপতি। আগে নৌকোয় চড়বার জন্য হাজার হাজার ভীতিবিহ্বল লোকের দিগ্‌বিদিকহীন উন্মত্ত হুড়োহুড়ির ছবি গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কতবার তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠেছে!

—কিন্তু তাদের বলতে যাবে কেন? প্রধান সেনাপতি বলেন। —আজ রাত্রে, অন্ধকারের সুযোগে এক একটি রেজিমেণ্টকে ঘাঁটি থেকে নিয়ে আস্‌বে। কেউ যেন বুঝতে না পারে। এমনিভাবে আন্‌বে যাতে প্রত্যেকে মনে করে যে আর সবাই ব্যূহ আগলে আছে। এভাবে যদি কাজ করা যায় তাহ'লে. .

—কিন্তু আমি এত ক্লান্ত, এত অসুস্থ যে কোমর তুলবার ক্ষমতা নেই! বিড়বিড় করে বল্লেন পুটনাম প্রধান সেনাপতিকে বাধা দিয়ে।

অসমাপ্ত কথার খেই ধরে প্রধান সেনাপতি বলে যানঃ এভাবে যদি কাজ করা যায়, তাহ'লে প্রায় সবাইকেই পার করে দেওয়া যাবে। জেনারেল মিফলিন আমি চাই, প্রতিটি ঘাঁটিতে আপনি আপনার নতুন লোক মোতায়েন করবেন এবং যতক্ষণ আমি না যেতে বলবো, আপনার লোকজন ঘাঁটি আগ্‌লে থাক্‌বে!

—হুঁ স্টার্লিং ও সুলিভানকে যেভাবে বিদায় করেছো, আমাকেও সেই-ভাবেই বিদায় করতে চাও!—মনে মনে ভাবল মিফলিন।

—কিন্তু আমার কামানের কি হবে স্যার? প্রায় কাঁদ-কাঁদ ভাবে জিজ্ঞাসা করে নক্স।

—পঁুতে রাখবে।

—সবগুলো? কয়েকটাও কি নিয়ে যাওয়া যায় না স্যর?

বড় অদমী মাথা নেড়ে জানালেনঃ না।

—হায়রে, আমার এত সাধের কামান! ফিসফিস করে বল্লে নক্স। অনেকটা মাল গিলেছে সে। নেশার আমেজে তখন প্রায় কাঁদ কাঁদ অবস্থা। --আমার এত সাধের, এমন সুন্দর কামানগুলো সবই যাবে? দুঃখে-হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেল্ল নক্স।

একটানা বৃষ্টি পড়ছে। কাঁধের উপর ক্লোক্ চড়িয়ে শিবিরের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করছেন প্রধান সেনাপতি। বৃষ্টি, জল, কাদা, হতাশা আর ভয়ে সৈনিকদের দুর্দশা চরমে উঠেছে। অধিকাংশ সৈনিকেরই মাথা গুঁজবার মত তাঁবু নেই ব্রুক্লিনে। বৃষ্টিতে চুপ্চুপ্ ভিজে নিরুপায় হতাশায় এখানে সেখানে কাত হয়ে পড়ে আছে। প্রধান সেনাপতি পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন টের পেয়েও কেউ চেয়ে দেখল না। গাদা-বন্দুকগুলোও বৃষ্টি থেকে সরিয়ে রাখবার চেষ্টা করেনি। এক টুকরো শুক্নো জ্বালানি কাঠও অবশিষ্ট নেই শিবিরে।

যে কোন রকম আক্রমণ হলেই এরা পাকা গমের মত ঝরে পড়বে। এত-টুকু চাপ সহ্য করতে পারবে না। সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে কোন মিল নেই এই জনতার। নিরুপায় বলেই এখনো এরা পড়ে আছে। পালাবার সব পথ বন্ধ যখন, কি আর করা যায়? সতেরো আঠারো বছরের কিছু নাবালক এখনও ছত্রভঙ্গ-পলায়নের ধকল্ কাটিয়ে উঠ্তে পারেনি। আহত কুকুরছানার মত নাকীসুরে কঁকিয়ে কাঁদছে। মেরিল্যান্ড আর ভার্জিনিয়ার সৈনিকেরা খানিকটা আলাদা হয়ে আছে। তাদের মধ্যে এখনও কিছু শৃংখলা রয়েছে। লড়াইর ধাক্কার চোট্ এদেরই বেশী সামলাতে হয়েছে বলে মনে মনে তারা বিষম রেগে আছে ইয়াংকিদের উপর। সামান্য একটু কিছু ঘটলেই নয়া-ইংলন্ডের সৈনিকদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। কিন্তু বিপ্লবী ফৌজের পরাজয় এবং এই দুর্দশার কারণ নয়া-ইংলন্ডের ইয়াংকিরা খুঁটেখুটে বিচার-বিবেচনা করেছে অন্যভাবে। তাদের ধারণা, সেনানীদের স্বেচ্ছাকৃত গোঁয়ার্তুমি এবং বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই এই দুর্ভোগ ভুগতে হচ্ছে। সুযোগ পেলে এদের অনেকেই দল থেকে খসে পড়বে। একবার ব্রুকলিনের ফাঁদ থেকে বেরুতে পারলে, কি করে সরে পড়া যায় তার পন্থাও অনেকে মনে

মনে বাৎলাচ্ছে। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করুক্ কি না করুক্, ইয়াংকিদের মধ্যে এমন একদল ছিল যারা শেষ পর্যন্ত লেগে থাকতে বদ্ধপরিকর। কনকর্ড আর লেকসিংটনে তারা শুরু করেছে এই আজাদীর লড়াই। একটা শেষ না দেখে ছাড়বে না। কারণ স্বাধীনতাকে তারা অন্যান্য জৈবিক প্রয়োজনের মতই অত্যাবশ্যক মনে করে। স্বাধীন তাদের হতেই হবে। যুক্তি-তর্কের ধার তারা বড় ধারে না। স্বাধীনতা তাদের রক্তমাংসের সামিল। তাদের চোখে যে কোনরকম গোলামি, সে সাচ্চা হোক কি কাল্পনিক হোক, দগ্‌দগে ঘায়ের মত জ্বালাময়।

শিয়াল-শিকারীর দীর্ঘ টান চেহারার প্রতিটি ভাবভঙ্গী তাদের চোখের-বালাই। ইয়াংকিরা বরাবরই তাঁকে নির্মম প্রাণহীন ভার্জিনিয়ার অহঙ্কারী অভিজাত বলে গণ্য করত। আজ তাঁর ভাবসাব দেখে তাই বলেই গাল-মন্দ করতে লাগল।

সাধারণ কান্ড জ্ঞান তাদের বলে দিল যে, এই লড়াইতে তাঁর মত ধনী লোকের কোন খাঁটি স্বার্থ থাক্‌তে পারে না। আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী তিনি! তাঁর রূঢ় আচরণ এবং বদ মেজাজের কথা নিয়ে হামেশা আলোচনা করত ইয়াংকিরা। এমনকি তাঁর গাল-ভরা নাম শুনলেও কান জ্বালা করে ইয়াংকিদের। ওয়াশিংটন! সাত জন্মেও এমন বিদঘুটে নাম শোনেনি কেউ।

ওয়াশিংটনের পা'দুটো টন্‌টন্ করছে ব্যথায়। একটানা ষাট ঘণ্টা চোখ বুজতে পারেনি। সর্বাঙ্গ ব্যথায় জর্জর। কিন্তু তার মধ্যেও পায়ের বেদনাটাই কষ্ট দিচ্ছে বেশী। অপরাহ্ন শেষ হয়ে এল তবু ইংরেজরা তাঁবুতে বসে বৃষ্টি থামবার অপেক্ষা করছে। কিন্তু এখন আর তিনি এক পা'ও হাঁটতে পারছেন না। ঘোড়া আনিয়ে অশ্বারোহণে নদীর কিনারে গেলেন প্রধান সেনাপতি। ঘোড়ার পিঠেই ঝিম এল। বার বার গা' ঝাঁকানি দিয়ে তাঁকে জোর করে জেগে থাক্‌তে হচ্ছিল।

পশ্চাদপসরণের সমস্ত আয়োজনই সম্পূর্ণ হয়েছে। তবু তিনি আশ্বস্ত হতে পারছেন না যে নির্বিঘ্নে একাজ নিষ্পন্ন করা যাবে। কয়েকশ' গজ দূরেই রয়েছে ইংরেজরা। কিছুতেই তারা পরাভূত ছত্রভঙ্গ একটা বাহিনীকে নির্বিঘ্নে হটে যেতে দিতে পারে না। এ কল্পনা করাও অসম্ভব। তাঁর মানস চক্ষে ধ্বংস, লাঞ্ছনা ও ফাঁসের ছবি ফুটে উঠল। ক্লান্ত ব'লে মগজের মধ্যে বহু কাল্পনিক বিভীষিকার ছবি আনাগোনা করতে লাগল। অবাক হয়ে

ভাবলেন, কোনশক্তি বলে তিনি একটার পর একটা কাজ ক'রে যাচ্ছেন? কোন শক্তি তাঁর সামর্থ্য জোগাচ্ছে? শক্তিটক্তি নিয়ে কোনকালেই বড় বেশী মাথা ঘামাননি তিনি।

মার্বলহেডের মাঝি-মাল্লারা এত নৌকো জড় করতে পেরেছে দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। নৌকোগুলো সবেমাত্র ব্রুকলিনের নদী-কিনারে আসতে শুরু করেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার, হেলস্ গেট পর্যন্ত নদীবক্ষ হরেক রকমের নৌকায় থৈ থৈ করছে! অনুকূল হাওয়ায় বৃষ্টি ও কুয়াশায় আব্ছা নদীবক্ষ থেকে বেরিয়ে আস্ছে অজস্র নৌকা। নিশ্চিন্ত আনন্দে বাইছে বৃষ্টি-ভেজা জেলেরা। মোহানার মুখেই রয়েছে বৃটিশ নৌবহর। কিন্তু বৃষ্টি আর কুয়াশার জন্য নৌকোর আনাগোনা লক্ষ্য করতে পারেনি। মার্বল-হেডেব মাঝি-মাল্লারা একাজ পেয়ে খুশীই হয়েছে। কুচকাওয়াজ করে করে তারা হাঁপিয়ে উঠেছিল। এতদিন পরে একটা মনের মত কাজ পেয়েছে। তামাম পল্টনের মধ্যে একমাত্র এরাই চটপট সুষ্ঠুভাবে কাজকর্ম করছে। ওদের সেনানী, কর্নেল গ্লোভার, নিজেও সালেমের লোক। সে-ই জেলেদের এই রেজিমেণ্ট গড়ে তুলেছে। তার লোকজন কি করতে পারে আর কি পারে না—কেমন করে তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় ক'রে নিতে হয়, তা' ভালভাবেই জানত গ্লোভার।

একে একে নৌকা ঘাটে ভিড়ছে আর গ্লোভার সেগুলি নোঙগর করিয়ে রাখছে। খেয়াপারের জন্য নিদেন যা না হলে নয় তাছাড়া সব দড়ি-দড়া দাঁড় খুলে নিচ্ছে নৌকা থেকে। কোন নৌকায় কে কে মাঝি যাবে তাও ঠিক করে দিচ্ছে। প্রয়োজন হলে, পাল তুলে খুশীমত পথে যাতে যাওয়া যায় তার বন্দোবস্ত করে বড় বড় নৌকা, বাচারি এবং খানকয়েক যুদ্ধ-জাহাজের নৌকা আলাদা করে রাখা হল। গোধূলির সঙ্গে সঙ্গে নদীর ঘাটে খেয়া-নৌকার সার পড়ে গেল।

দাঁত কড়মড় করে ঢালু পাড় বেয়ে নক্স নেমে এল প্রধান সেনাপতির কাছে। ক্ষোভে ছেলেটির চাঁদপনা গোলগাল মুখখানা কুঁচকে আছে।

—আমি ঐ কামানগুলোর কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি স্যর!

—বলো!

—এগুলো সব পুঁতে রাখলে আবার কামান কোথায় পাবো?

বড় আদমী জবাব দিলেন না।

—কামান দিয়েই তো সৈন্যদল লড়াই করে! মিনতির সুরে বল্লে নক্স।

—হাঁ, কামান আর সৈনিক দিয়েই লড়াই করতে হয়; কিন্তু আমাদের কোনটাই নেই!

নীরবে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল দুজনে। একদিন যে বই-বিক্রেতা নাম-ডাকের প্রকাশক হবার স্বপ্ন দেখেছে, নীরবে হাঁ করে সে চেয়ে রইল শিয়াল-শিকারীর দিকে। মনের মত স্ত্রী আর সন্তান-সন্ততি নিয়ে সুখে-শান্তিতে ঘর-সংসার ক'রবার কল্পনা তাঁরও একদিন ছিল। ব্যর্থ উভয়েই।

—অন্ধকার হোক্, পুঁতে রাখবার বন্দোবস্ত করছি, নক্স বল্লে।

—কেউ যেন টের না পায়। যতটা চুপেচাপে পারো কাজ সারবে।

—চুপেচাপে কামান পুঁতবো কি করে স্যর? বিষণ্ণভাবে জবাব দেয় নক্স। —যা হোক, যতটা সম্ভব আমি ক'রবো।

—কাজ হয়ে গেলে তোমার লোকজন এখানে পাঠিয়ে দেবে পার হবার জন্য।

গোটা সাতেকের সময় গ্লোভার এসে খবর দিল যে প্রায় সব নৌকাই ঘাটে এসেছে, এখন আদেশ পেলেই সে খেয়া পার শুরু করতে পারে। ইতিমধ্যে জন বারো ফৌজদার এসে তাঁর পাশে ভিড় করেছে। প্রধান সেনাপতি বুঝলেন যে তিনি ছাড়া, এই শীর্ণ ক্লান্ত মানুষটি ছাড়া, ভগ্নোদ্যম বাহিনীকে উৎসাহিত করবার সাধ্য আর কারও নেই। রক্তচক্ষু ফৌজদারদের প্রত্যেকের মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে তিনি ভাবলেন, এরাই একদিন কর্নেল, মেজর, কিম্বা জেনারেল হবে। তার পর একটি কচিমুখো ফৌজদারকে ডেকে বল্লেনঃ তোমার রেজিমেণ্টকে এখানে এনে নৌকোয় চড়িয়ে দাও!

—পিছু হট্‌বো স্যর?

—না, মূর্খ না! আমি তোমার রেজিমেণ্টকে ছুটি দিচ্ছি। শহরে গিয়ে তারা বিশ্রাম করবে—পোশাক-পরিচ্ছদ বদলাবে। আর বাকী যারা আছো, যে যার ঘাঁটিতে চলে যাও।

দম ফেটে হাসি এল তাঁর। কি ছেলেমানষী বোকা-বোঝাবার চেষ্টা করছেন। কাছে থেকে নৌকা-চড়ার তদারকি ক'রবার জন্য ঘোড়াটা ঘাটের কাছে নিয়ে এলেন প্রধান সেনাপতি। নিভু নিভু একটা লণ্ঠনের আলো তুলে ধরেছিল জেলেদের একজনে। সেই টিম্‌টিমে আলোয় দেখা গেল, আবারও ঝিমোচ্ছেন তিনি।

—স্যর!

ঘুম-কাতর চোখ তুলে তাকালেন প্রধান সেনাপতি।

—আপনার অসুখ করেছে মনে হচ্ছে। দাঁত বার করে বল্লে জেলেটি।

—নিজের কাজ করোগে।

—এই যাচ্ছি স্যর!

—কাজে যাও বলছি! ধমকে উঠলেন শিয়াল-শিকারী। —গ্লোভার, তোমার লোকজন হাতের কাছে রাখো। এখনও একমাত্র এদেরই ধম্‌কে-ধাম্‌কে শৃংখলায় আনা যায়; বাকী আর সবাই শৃংখলার বাইরে চলে গেছে।

ক্লান্তিতে সর্বশরীর থরথর করে কাঁপছে, তবু তিনি নড়লেন না। কিন্তু ঝিমে চোখ জড়িয়ে আসছে। ঘুম তাড়াবার জন্য এত জোরে ঠোঁট কামড়ে ধরলেন যে ঠোঁট কেটে মুখের মধ্যে রক্ত গড়িয়ে পড়ল।

এমন সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ নিষ্পন্ন হবে, এ তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। তাই অবাক হয়ে গেলেন। পরিকল্পনাটি সোজা ছিল বলেই অত সহজে সুসম্পন্ন হয়েছে। প্রতিটি রেজিমেণ্ট ভেবেছে যে একমাত্র তাদেরই বরাত খুলেছে; তাই অতি সন্তর্পনে চুপেচাপে হামাগুড়ি দিয়ে পারঘাটায় এসেছে। হৈচৈ গোলমাল করলে শত্রুরা টের পেয়ে যাবে, এ ভয় তাদের কারও ছিল না। ওদিকটা তারা ধর্তব্যের মধ্যেই আনেনি। বৃটিশের চিন্তা বহুপূর্বেই তাদের মন থেকে উবে গেছে। তারা ভেবেছে, পেছনের মন্দভাগ্য সংগীরা টের পেয়ে যদি এ সুযোগ নষ্ট করে দেয় তাহ'লে জান-প্রাণ বাঁচাবার শেষ সুযোগও ভেস্তে যাবে। প্রকৃত ভয় সেইখানে।

প্রথম রেজিমেণ্টটি ব্রুকলিনের ঘাট ছেড়ে মানহাট্টানের স্তিমিত আলোর দিকে অগ্রসর হতেই ভার্জিনিয়ানের অবসাদ কেটে গেল। তাহ'লে এখনও সুযোগ আছে, আর সে সুযোগ বেশ ভালোই! ধীরে সুস্থে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চিংতা করা তাঁর স্বভাব। কিন্তু পরিণত বয়সে জুয়ার আড্ডায় বসে মোটা-বাজী রেখে জুয়া খেলবার এমন নেশা হয়ে গেছে যে, জুয়াড়ী অভ্যাস আজ তাঁর স্বভাবের সামিল হয়ে উঠেছে। ঘোড়া নিয়ে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছেন প্রধান সেনাপতি। সর্বত্র হাজির থেকে ভেড়ার পালের মত লোকজন নৌকোয় তুলে দিচ্ছেন। বহু নিত্য-রোগা লোকের মধ্যে মাঝে মাঝে অফুরন্ত কর্মশক্তির আভাষ পাওয়া যায়। এ জিনিসটি তাঁরও ছিল। পরে এজন্য পস্তাতে হবে। তা হোক, কিন্তু আজ তিনি বেপরোয়া; কার সাধ্য তাঁর সংগে পাল্লা দেয়?

আজ কারুককে রেহাই দিলেন না প্রধান সেনাপতি। তাঁর কথার চাবুকে জেনারেল-পদ-গর্বী বালকেরা মাথা হেঁট করে রইল। অমানুষিক মেহনৎ

করছে মার্বলহেডের জেলেরা; কিন্তু প্রধান সেনাপতির মন উঠছে না। যতটা করা উচিত, করছে না জেলেরা! ধৈর্যশীল গ্লোভারকে অকারণে দু'চারটে কড়াকথা শুনিয়ে দিলেন। কিন্তু সালেমবাসী যখন সবিনয়ে প্রতিবাদ করবার স্পর্ধা দেখাল, গর্জে উঠলেন প্রধান সেনাপতিঃ কোন সাফাই আমি শুনতে চাই না! নিজের কাজ করে যাও।

জিনের আঁতুরঘরে তাঁর জন্ম: চলতে-খেতেও শিখেছেন অশ্বশাবকের মত। আজ তাঁকে অশ্বপৃষ্ঠে দেখে মনে হচ্ছে, বাহনটি যেন শিয়াল-শিকারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সামিল, তাঁর দাসানুদাস।

ক্রমে রাত বাড়ছে, তবু পারঘাটায় নতুন নতুন রেজিমেণ্ট আসার বিরাম নেই। একটির পর একটি আসছে আর তিনি তাদের নৌকোয় চালান করে দিচ্ছেন। গুনতির হিসাবে ভুল হয়ে গেল। কত সল এ পর্যন্ত লাইন ছেড়ে এসেছে? পার্শ্বরক্ষীদের জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু তারাও সঠিক জবাব দিতে পারল না। প্রধান সেনাপতির কারসাজির সাফল্য দেখে-শুনে খুশীর আনন্দে সবাই আজ মশগুল। কত এল, কত গেল, এই গোনা-গুনতির ধার ধারে কে?

—আমি গিয়ে দেখে আসবো স্যর? পার্শ্বরক্ষীদের মধ্য থেকে স্কামেল নামে একজন অনুমতি চাইল।

—যাও। কিন্তু মিফলিনকে থাক্‌তে বল্‌বে।

—কি বল্লেন? স্কামেল ততক্ষণে ঘোড়ায় চড়ে বসেছে।

—বল্লাম, মিফলিনকে বাদ দিয়ে আর সবাইকে আস্‌তে বল্‌বে। সে যাবে সবার শেষে।

—আচ্ছা, স্যর! জোর কদমে ছুটল স্কামেল।

—ও আপনার কথা বুঝেছে বলে মনে হচ্ছে না স্যর। গ্লোভার বল্ল।

আর একটি রেজিমেণ্ট তখন হামাগুড়ি দিয়ে পার-ঘাটায় নাম্‌ছে। তাদের নৌকায় তুলে দেবার জন্য ভার্জিনিয়ান রেজিমেণ্টটির কাছে ছুটে গেলেন। কোন গোলমাল হবার সম্ভাবনা নেই এখন।

কিন্তু স্কামেল হন্তদন্ত হ'য়ে এমন এক কাণ্ড করে বসল যে গোটা পরি-কল্পনা ভেস্তে যাবার উপক্রম হল। প্রধান সেনাপতির নির্দেশ সে সত্যিই ঠিকমত বুঝতে পারেনি। অথচ আদেশ পালন না ক'রে হাঁদার মত তাঁর সামনে হাজির হবার সাহসও ছিল না। তাই চটপট কাজ সেরে ফিরবার আগ্রহে প্রথমেই সে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেল মিফলিনের কাছে। বল্লেঃ নিউইয়র্ক

যাবার জন্য লোকজনসহ এখনি আপনাকে পারঘাটায় যেতে বলেছেন্ প্রধান সেনাপতি।

—আমাকে, না এদের? নয়া-ইংলণ্ডের অবশিষ্ট ভীতিগ্রস্ত সৈনিকদের দেখিয়ে মিফলিন জিজ্ঞাসা করল। এদের তুলনায় মিফলিনের লোকজন অনেক সুশৃংখল।

—না, আপনার লোকজনকেই নিয়ে যেতে বলেছেন। স্কামেল জবাব দেয়।

—তুমি ঠিক শুনেছো তো!

—তাই তো যেন বল্লেন!

—ওরা কি করবে? নয়া-ইংলণ্ডের সৈনিকদের দেখিয়ে মিফলিন জিজ্ঞাসা করে।

স্কামেল ঘাড় নেড়ে জানালঃ ওদের যেতে বলেননি।

এ হুকুমের অর্থ কিছুই বুঝল না মিফলিন। অবাক হয়ে গেল। তবু কি আর করা যায়! নিজ নিজ ঘাঁটি ছেড়ে সৈনিকদের সারবেঁধে দাঁড়াবার আদেশ দিল। নয়া-ইংলণ্ডের সৈনিকেরা এতকাল হাঁ করে কাণ্ড-কারখানা দেখছিল। মিফলিনের লোকজন এই তো সবে এসেছে! নয়া-ইংলণ্ডবাসীরা এমন প্রাণপাত লড়াই করল, এত রক্তপাত করল তবু তারা বলির জন্য পড়ে থাকবে আর সদ্য আগতরা চলে যাবে? আসল ব্যাপারটা বুঝতে যতটুকু সময় লেগেছিল, ততক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছিল ইয়াংকিরা। কিন্তু যেই বিস্ময়ের চমক কেটে গেল, ব্যস, অমনিই দে' ছুট! কাছাকাছির মধ্যে যত বিগ্রেড্ ছিল অন্যের দেখাদেখি সবাই তখন পালাতে শুরু করল।

পারঘাটায় তখন বেনো জলের মত লোক ছুটে আস্ছে। ঠেলা-ঠেলি, হুটোপুটি ধাক্কা-ধাক্কি করে যে যে-ভাবে পারে আগে পৌছুবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কেউ আর একজনের ঘাড়ে চড়ে বসেছে, কেউ দু' পায়ের ফাঁক দিয়ে গলবার চেষ্টা করছে—আছাড় খাচ্ছে, আঁচড়ে যাচ্ছে, কেটে-ছিঁড়ে যাচ্ছে, কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। শুধু হন্যে হয়ে ছুট্ছে। ভয়ে দিক-দিশা হারিয়ে কেউ ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেল্ছে; আবার কেউবা ধাক্কাধাক্কি করে সংগীকেই ঠেলে ফেলে দিচ্ছে নদীর কালো জলে। নৌকায় চড়বার জন্য সে কি হুড়া-হুড়ি! মাঝিরা চ্যাপ্টা দাঁড় দিয়ে ঠেকাবার চেষ্টা করছে; কিন্তু কে শোনে বারণ? উল্টে মার্বলহেডেব জেলেদেরই খিস্তি-খেউড় করছে।

এই ডামাডোলের মধ্যস্থলে রয়েছেন প্রধান সেনাপতি। ক্রুদ্ধ জন্তুর মত রাগে ফোঁসছেন। এখানে-ওখানে সর্বত্র ছুটাছুটি করে দাবড়ে-ধম্কে তিনি

প্রতিনিবৃত্ত করছেন এই হন্যে জনতাকে। কাজ হ'ল। তাঁর ক্ষিপ্ত অগ্নিশর্মা মূর্তি প্রজ্বলন্ত অগ্নিশিখায় যেন জল ঢেলে দিল। মুহূর্তের জন্য শান্ত হল জনতা।

—যে যার দলে চলে যাও। গর্জে উঠলেন প্রধান সেনাপতি।

হেঁট-মাথায় জনতা তাঁকে পথ করে দিল। অনেকে ধপ্ করে মাটিতে বসে কম্পিত হস্তে মুখ চেপে কান্না জুড়ে দিলে। ডাইনে-বাঁয়ে না চেয়ে বড় আদমী তাদের মধ্যে ঘুরাফিরা করতে লাগলেন।

মিফলিনের সঙ্গে চোখাচোখি হবার পূর্বেই তিনি নিজের মেজাজ প্রায় বাগে এনেছেন। অন্তত জেনারেলের মুণ্ডপাত করবার মত রাগে টঙ্ অবস্থা নেই। এতটুকু সংযম ছিল বলেই অশ্বপৃষ্ঠে টান হয়ে বসে গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করতে পারলেনঃ তুমি ঘাঁটি ছেড়ে কেনে চলে এলে মিফলিন?

—আপনার আদেশ পেলাম বলেই এসেছি।

—কে বলেছে? কোন আদেশ আমি দিইনি।

—সেকি? আপনি স্কামেলকে পাঠাননি আমার কাছে? আমাকে পিছু হট্‌তে বলেননি? চেঁচিয়ে উঠল মিফলিন। ক্ষোভে-দুঃখে তার দু'চোখ ফেটে জল বেরুল। নিজের উরুতে কয়েকটা থাপড় মেরে অসহায়ের মত বলে উঠলঃ সত্যিই আপনি পাঠাননি স্কামেলকে? বলুন, পাঠাননি আপনি?

ঘোড়া থেকে নেমে মিফলিনের পাশে গিয়ে তার কাঁধের উপর হাত রাখলেন শিয়াল-শিকারী।

—বলুন, আপনি স্কামেলকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন কিনা? ফুঁপিয়ে কেঁদে বল্লে মিফলিন।

ভার্জিনিয়ানের মেজাজ ততক্ষণে সম্পূর্ণ শান্ত হয়েছে। মনে পড়ল যে স্কামেলের চোখে একটা জিজ্ঞাসুভাব তিনি লক্ষ্য করেছিলেন; কিন্তু ছেলেটি মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পায়নি।

—স্কামেল কি বলেছে তোমাকে? মিফলিনকে জিজ্ঞাসা করলেন।

—এখানে আস্‌তে বলেছে।

—আমারই ভুল হয়েছে। কিছু মনে ক'রো না! মাথা নেড়ে বল্লেন প্রধান সেনাপতি।

—স্যর?

—আমি দুঃখিত জেনারেল মিফলিন! বিশ্বাস করো, এ তোমার বা স্কামেলের ভুল নয়! কখন কি যে বলে ফেলি আমার নিজেরই খেয়াল থাকে না।

—কি আদেশ আপনার স্যর? ভাঙা-গলায় জিজ্ঞাসা করল মিফলিন। সেই মুহূর্তে তার মনে হয়েছিল যে, এই লোকটির জন্য যদি প্রাণ দেবার প্রয়োজন হয় তাহলেও সে হাসিমুখেই আত্মবলি দিতে পারে।

—আবার তোমার নিজের জায়গায় ফিরে যাও। যতক্ষণ আমি ডেকে না পাঠাবো ঘাঁটি আগলে থেকো।

—যদি মাথায় বাজ ভেঙে পড়ে তাহ'লেও আগলে থাক্‌বো। চাপাগলায় বলে মিফলিন।

ভোর হয়-হয় এমনি সময় কুয়াশা কেটে গেল। নক্স আর আলেক্‌সান্দর হ্যামিলটন নামে গোলন্দাজ বাহিনীর একটি স্কুলের ছাত্র-ক্যাপ্টেনকে সংগে করে ডিংগি নৌকায় বসেছিলেন ভার্জিনিয়ান।

—নৌকো ভাসাবো স্যর? হালধরা মার্বলহেডের মাঝিটি জিজ্ঞাসা করে।

—একটু রসো।

জনকয়েক হেসিয়ান কাদা ভেঙে নেমে আস্‌ছিল। গোলন্দাজ দলের ক্যাপ্টেন আঙুল দিয়ে তাদের দেখাল।

—এখন চলুন, স্যর! বিষণ্ণভাবে নক্স বল্লে। কামান হারাবার দুঃখ সে এখনও ভুলতে পারেনি।

—আচ্ছা চলো। মাথা নেড়ে বড় আদমী সম্মতি দিলেন।

মাঝিরা নৌকা খুলে দিল। ঝুপ ঝুপ দাঁড় পড়ছে জলে। লাইন করে দাঁড়িয়ে হেসিয়ানরা যুগপৎ গুলী ছুঁড়ল। কিন্তু নৌকা ততক্ষণে বন্দুকের পাল্লার বাইরে গাঙে বেরিয়ে এসেছে।

প্রধান সেনাপতি নড়লেন না। ইতিমধ্যেই তিনি ঝিমোতে শুরু করেছেন; একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লেন। নৌকোয় বসে চিন্তা করবার আগ্রহ তাঁর ছিল না। মুরদ যা-ই হোক্, এখনও একটা পল্টন তাঁর আছে। চিন্তা ভাবনার ঢের সময় পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয় পর্ব

মানহাট্টান দ্বীপ

আজাদী ফৌজ

ঊনত্রিশে আগস্ট নিউইয়র্কবাসী ভদ্রজন এই নিশ্চিন্ত সান্ত্বনা নিয়ে ঘুমোতে গেলেন যে আজাদী ফৌজ শহরের ত্রিসীমানায় নেই। সদাশয় শাঁসাল এই পুরবাসীদের পাটোয়ারী বুদ্ধি বেশ টনটনে ছিল। সারাক্ষণ নিজের কাজকর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাক্‌তেন। ঝামেলা ঝঞ্ঝাট এড়াবার জন্য বরাবর তারা আজাদী ফৌজকে শহর থেকে দূরে দূরে থাক্‌তে অনুরোধ জানিয়েছেন।

কিন্তু ত্রিশে আগস্ট ঘুম থেকে উঠেই তাদের চক্ষু ছানাবড়া! আবার আজাদী ফৌজ ফিরে এসেছে! শৃংখলার কোন বালাই নেই, রণভেরী বা বাঁশীর সাড়া শব্দ নেই, নেই ইয়াংকি চাষীদের সৈনিকের চালে কুচকাওয়াজ করবার হাস্যকর চেষ্টা ..টুপীতে লাগান পালকের বাহারই বা কোথায়? সেই চেকনাই আর বাহারের পরিবর্তে দুর্গত একটা আহত প্রাণী যেন পা টেনে টেনে হামাগুড়ি দিয়ে নীরবে শহর দখল করে ব'সেছে।

ভোরবেলা দোকানের দরজা-জানালার ঝাঁপ খুল্‌তে এসে দোকানীরা দেখল যে, উদভ্রান্ত-দৃষ্টি পরাভূত জলে-চুপ্‌চুপ আজাদী ফৌজ শহরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ভূগর্ভস্থ খাদের মত নিরন্ধ্র অন্ধকারে ঘুমোচ্ছিলেন প্রধান সেনাপতি। সেই নিশ্চিদ্র আঁধারে কেবলমাত্র বন্দুকের কীরিচে এখানে ওখানে দু'চারটে সূঁচিমুখী আলোর স্তিমিত চিক্‌চিকানি মালুম হ'চ্ছে। ক্লান্তির অবসাদে অসাড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছেন। কোন উস্‌খুস্‌ ভাব বা অস্থিরতা নেই। মড়ার মত পড়ে আছেন। যে মুহূর্তে নৌকাচড়ে ব্রুকলিনের পারঘাটা ছাড়লেন সেই থেকে সব কিছুর স্মৃতি অবসাদের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। পেছনে বন্দুকের গুলী তাড়া করে আস্‌ছে, তবু যে নৌকায় বসে কেমন করে ঘুমোলেন কিছুই মনে পড়ে না। কি একটা ফেলে এসেছি বলে বার বার জড়িত কণ্ঠে বিড়বিড় করেছেন। কি বলেছেন এখন মনে করতে পারবেন না। কে যেন তাঁর মুখের কাছে এক গ্লাস মদ ধরেছিল। খেতে খেতেই ঝিমিয়ে, পড়েছিলেন। কিন্তু এখন সেকথা মনে নেই। কখন পোশাক বদলেছেন, ক্ষীণ

জড়িত কণ্ঠে ফিস্‌ফিস্‌ করে কখন কি আদেশ দিয়েছেন, কিছুই মনে পড়ে না।

ঘুমের মধ্যে যুদ্ধের ছবি তাঁর কাছে আরও স্পষ্ট আরও বিভীষিকাময় হ'য়ে উঠল। একবার ইয়াংকি-ইয়াংকি-রব কানে শুনে তিনি চীৎকার করে লাফিয়ে উঠেছিলেন। তারপর অসাড় ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে আছেন।

দিনভর ঘুমোলেন প্রধান সেনাপতি। সকাল গেল—বেলা পড়ে এল—সন্ধ্যা হয়-হয়, তবু তাঁর ঘুম ভাঙ্গছে না। ফৌজদাররা তাঁর পরিকল্পনা জানবার জন্য খুবই উদ্‌গ্রীব। কিন্তু কেউ ঘুম ভাঙ্গাতে সাহস করল না। তার চাইতে কম বয়সী ফৌজদাররা কেউই অতক্ষণ জেগে কাটায়নি—অত কষ্টও হয়নি তাদের। এতক্ষণে সবাই ঘুম থেকে উঠে প্রধান সেনাপতির ঘরের চারপাশে জটলা শুরু করেদিল।

যুদ্ধ আর ব্রুক্‌লিন থেকে অপ্রত্যাশিত পলায়ন ছাড়া আর কোন বিষয়েই আলোচনা হচ্ছে না। ব্রুকলিন উপকূলে গোটা বাহিনীর এক-পঞ্চমাংশ খতম হয়ে গেছে। কিন্তু নিজেদের সংগ্রাম-শক্তির এই গুরুতর ক্ষতির পূর্ণ তাৎপর্য এদের কেউ উপলব্ধি করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। যৌবনের মাথা-গরম ভাব তখনও এদের মনে একটা নির্বোধ আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে রেখেছে। দোকান-খামার ছেড়ে তারা যোগ দিয়েছে এই বিরাট দুঃসাহসী অভিযানে। কিন্তু সে অভিযান যখন সহসা ভেস্তে যাবার উপক্রম হ'ল, প্রাণ নিয়ে পালাতে অসুবিধা হয়নি। কাজেই তাদের সুনিশ্চিত ধারণা হল যে, যেমন অবস্থাই দেখা দিক, পালাবার পথ অবশ্যই পাওয়া যাবে।

আজাদী ফৌজও ঘুমাল। যেখানে একটু ঘুপসি পেল সেইখানেই কাত হয়ে পড়ল। ক্যানাল স্টীটের উপরে ওলন্দাজদের বহু পুরনো খামার ছিল। দেশ-প্রেমিকের ভীড়ে এই খামারগুলো গিস্‌গিস্‌ করছে। কেউ নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে, কেউ কাতরাচ্ছে, কেউ জ্বরে ছটফট করছে, আবার কেউবা ভয়ে জড়-সড় হয়ে আছে। ইয়াংকিদের মধ্যে কেউ কেউ আস্তাকুঁড়ের মধ্যেই কাত হয়ে আছে; আর সবাই বন্ধ কবাটের সামনে কুঁকড়িসুকড়ি দিয়ে পড়ে আছেন। এদের জন্য খিল খুলবে কে? দু'জন লেফট্‌ন্যাণ্ট এবং জনাচারেক সৈনিক বাওয়ারি লেনের জলকাদার মধ্যে তাঁবুর একখানা ক্যানভাসের ঢাকনি বিছিয়ে পড়ে আছে। একটি গীর্জা আহতদের ভিড়ে গিস্‌গিস্‌ করছে, কিন্তু তাদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য কোন ডাক্তার বা নার্স নেই। পার্ল স্ট্রীটে একটি বালক কাদার মধ্যে মুখ থুবড়ে মরে পড়ে আছে। কিন্তু সদাশয় পৌরবাসীদের চোখে সে মড়া কুকুর-

বিড়ালের সামিল। মিল স্ট্রীটের য়িহুদী সিনাগগে রুগ্ন ও আহত সৈনিকের এত ভিড় হয়েছে যে, প্রাচীনদের উপাসনার তিলমাত্র স্থান নেই। বাইরে দাঁড়িয়ে তারা রুগ্ন ও আহত জনতার আর্তনাদ শুনছেন। একদিন তো এরাই তাদের পুত্র-পৌত্র ছিল! আধ-কোম্পানী ডেলাওয়ারে সুইডিস্ ফ্রন্সেস শুঁড়িখানায় ঢুকে আসবাবপত্র ভেঙে তচনচ করেছে, হাতের কাছে যতটা মদ পেয়েছে শেষ করেছে, তারপর শুঁড়িখানার মেজেতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। একটি পোল রেজিমেণ্টের জন-চৌদ্দ ফেরৎ এসেছে। বাওলিং গ্রীনে আগুন জেবলে তারা অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে বসে আছে। গা' হাত পা' গরম করবার চাড় তাদের নেই। নিঃসঙ্গ ভগ্নোদ্যম মনটা খানিক চাঙ্গা হলেই বেঁচে যায়! ইংরেজী একটি শব্দও তারা জানে না। বসে বসে শ্লাভ্ বিষাদ-সঙ্গীত গাইছে; আর মনে পড়ছে সেদিনের কথা, যেদিন জনপ্রাণীহীন প্রিপেট জলা-ভূমির মধ্যদিয়ে বুনো জানোয়ারের মত পালিয়ে তাদের প্রাণ বাঁচাতে হয়েছিল। আগুনের পাশে বসে আজ তাই বলাবলি করছে,—আজাদীর জন্য মানুষ যখন চেষ্টা করে সর্বত্র তাকে একই অবস্থার সম্মুখীন হ'তে হয়। ওল্ড স্লিপের উত্তরে ঝোঁপ-ঝাড়ের মধ্যে একজন ভার্জিনিয়াবাসী এবং রোড্ দ্বীপের একটি ইয়াংকি হিংস্র জন্তুর মত লড়াই করেছে। গলা কেটে ইয়াংকিটিকে সাবাড় করে বেরিয়ে এল ভার্জিনিয়াবাসী।

প্রায় দিনভর ঘুমাল আজাদী ফৌজ। সন্ধ্যার মুখে ঘুম ভাঙ্তে আরম্ভ করে। ঘুমের পর কিছু সাহসও যেন বাড়ল। আড়মোড়া দিয়ে ঘুপসি থেকে বেরিয়ে সবাই তৃষ্ণা নিবারণের জন্য খোঁজাখুঁজি শুরু করল। শুঁড়িখানা দেখ্লেই হুড়মুড়ি দিয়ে পড়ছে। দু' এক মগ ফ্লিপ্ পেটে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে এক একজন মস্ত বীরপুরুষ ব'নে গেল। সে কি আগাড়-বাগড়! দু'-চারটে ভীরু ইংরেজ খতম করেনি এমন একজনও ছিল না তাদের মধ্যে। আর হেসিয়ানদের যা করেছে, তা শুন্লে তাদের নাতি-নাতনিরা পর্যন্ত হা হয়ে যাবে। যত দোষ ওই ভার্জিনিয়ার বড়লোক বেয়াকুফ্টার। ওই ব্যাটাই তাল-গোল পাকিয়ে সব ভণ্ডুল করে দিয়েছে। এমন লড়িয়ে লোকজন পেয়েছিল তাই বর্তে গেল। কিন্তু তাতান লোহার সেঁকা দিয়ে যত ফ্লিপ্ তৈরী হচ্ছে ততই গিল্ছে সৈনিকেরা। বেশ কিছুটা পেটে প'ড়বার সঙ্গে সঙ্গে শুধু মুখের বড়াইতে আর মন উঠছিল না। তখন একটা কিছু করবার ইচ্ছা চাঙ্গা দিয়ে উঠ্ল। দলে দলে ইয়াংকি রাস্তায় বেরিয়ে প'ড়ল হতচ্ছাড়া ভার্জি-নিয়ানদের খোঁজে। মেরিল্যাণ্ডের দল বেরুল রোড্ দ্বীপের গোটা কয়েক

মাথা ভেঙে নিজেদের সঙ্গীদের মৃত্যুর শোধ তুলবার জন্য। হাত ধরাধরি করে মুখ-গোমরা পেন্‌সিল্‌ভানিয়াবাসীরাও রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছে। তারা চটা সবাইর উপর। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের বাসিন্দারা দিব্যি কেটে বল্‌ছে যে নিউ-ইয়র্ককে আজ তারা জাহান্নামে পাঠাবেই পাঠাবে...হঠাৎ ফাঁপা বড়লোক শালারা আর যাতে এখানে বসে মজা লুটতে না পারে!

দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হতে বিলম্ব হল না। পাথরের ডেলা আর বন্দুকের কুঁদোর বাড়িতে অনেক মাথাই ফেটে চৌচির হল। আসলে টোরী-সমর্থক এক জহুরী দেশভক্তদের প্রতি ভালবাসার ভান দেখিয়ে নিউইয়র্কেই ছিল। কনেক্‌টিকাটের একটি বিগ্রেড্‌ তার দোকান লুঠ-পাট করে ঘাড়ি পিন চড়িয়ে সদর্পে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

জহুরীর দোকান থেকে ছুটে বেরিয়ে দুটি যুবক কনেক্‌টিকাটের লুঠেরা-দের তাড়া করল। যুবক দুটির নাম আরন্‌ বার এবং আলেক্‌সান্দর হ্যামিল-টন। মেয়েলী বেগ্‌নী-চোখো হ্যামিল্‌টন অগ্নিশর্মা হয়ে হুড়মুড় করে পড়ল কনেক্‌টিকাট ব্রিগেডের মধ্যে। এই ঘূর্ণির মধ্যে আরও দু'চার বার জল ছিটে উঠ্‌ল। দু'টি মাতাল ভার্জিনিয়াবাসী একটি ওলন্দাজ তরুণীর জামা ছিঁড়ে ফেল্ল। নক্স মাতালদুটির মাথায় বেশ দু'চারটে গাট্টা বসিয়ে দিলে। প্রৌঢ় ইস্রায়েল পুটনাম খোলা তরবারি হাতে ইয়াংকিদের জল-কাদার মধ্য থেকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছেন আর এমন চেঁচিয়ে গালমন্দ ক'রছেন যে দূর থেকেও তাঁর কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। অন্যান্য সেনানীরাও তাঁর অনুকরণ ক'রল। সেনানীদের ধমকানি ও অনুনয়, সৈনিকদের মাতলামি, নাবালকের কান্না এবং পুরবাসীদের অনুযোগ-অভিযোগে নিউইয়র্ক শহর রাত্রির প্রথম যামে পাগলের আড্ডায় পরিণত হল।

ছেলেমানুষী ঝগড়া-ঝঞ্ঝাটেরও অন্ত ছিল না। বন্দুক, ন্যাপ্‌স্যাক, রুমাল, এমনকি রুটির টুক্‌রো নিয়ে পর্যন্ত মারামারি বাঁধছিল। ব্রুকলিন থেকে পালাবার তাড়াহুড়ায় যে যা হাতের কাছে পেয়েছে তুলে নিয়েছে। এখন সবাই অপরের জিনিস দাবী করছে। ব্রিগেড্‌গুলো অলিগলিতে ছড়িয়ে আছে। মাতাল সৈনিকেরা নিজেদের রেজিমেণ্টের নাম পর্যন্ত ভুলে পালাবার পথে নিহত সঙ্গীদের শোকে কাঁদতে বসেছে। শত শত দলত্যাগী উন্মাদের মত ছুট্‌ছে হারলেম্‌ পাহাড়ের বন-জঙ্গলের দিকে। চারিদিকের এই ডামা-ডোলের মধ্যে অবস্থা আয়ত্তাধীনে রাখা প্রায় অসাধ্য। তবু প্রাণপণ চেষ্টা

করছে কচিমুখো সেনানীরা। রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা শৃংখলা ফিরে এল। আরও খানিকটা পরে আজাদী ফৌজ আবার ঘুমিয়ে প'ড়ল।

বিলি বোতল ছয়েক মাদেরা মদ নিয়ে এল। —ফ্লিপের বদলে মন্দ হবে না। মুচ্‌কি হেসে ছাড়াছাড়া ভাবে বল্লেন শিয়াল-শিকারী। বহুদিন পরে তরুণ সেনানীরা প্রধান সেনাপতির মুখে হাসি ফুট্‌তে দেখল। মাদেরা তাঁর প্রিয় মদ। ঘুম হ'য়ে গেছে, বিশ্রাম করেছেন, পোশাক-পরিচ্ছদ বদ্‌লেছেন, চুল আঁচড়ান পর্যন্ত হয়ে গেছে —এখন আর কিছুই ক'রবার নেই।

জন বারো-তেরো ফৌজদার বসে আছে গোলটেবিলখানার চারপাশে। এদের নিয়েই সামরিক মন্ত্রণা-সভায় বসেছেন প্রধান সেনাপতি। পশ্চাদপসরণ, ভবিষ্যৎ ইতিকর্তব্য, বিপ্লব প্রভৃতি বিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য ডেকে পাঠিয়েছেন এদের। তাই নক্স, পুটনাম, মার্কার, মিফলিন, স্পেন্সার, ক্লিনটন সহ আরও কিছু জেনারেল, মেজর জেনারেল, কর্নেল, এমন কি নাবালক হ্যামিলটন পর্যন্ত এসেছে। ত্রিশের কোঠার কাছাকাছি এবং তারও দু'চার বছর বেশী বয়সী জ্যেষ্ঠদের সঙ্গে বস্‌তে হ্যামিলটনের কেমন ভয়-ভয় করত। তবু এই উনিশ বছরের বালকটি হাঁটুর উপর নোটবুক রেখে এমন স্বচ্ছন্দে লিখে যেতে পারত যে, তাকেও ডেকে আনা হয়েছে।

এরা যখন টেবিলের পাশে জমায়েৎ হ'ল প্রধান সেনাপতি তখনও আসেননি। শোবার ঘরে ছোট্ট একখানা টেবিলের পাশে ব'সে সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশে অতি কষ্টে এক বাণী লিখ্‌ছিলেন। স্বচ্ছন্দ সাবলীল লেখনী চালনার এলেম তাঁর ছিল না। বানান ভুলের জন্য আরও লজ্জা ক'রত। রচনা-শৈলীর সেই উৎকর্ষের যুগে তাঁর লেখনী প্রথমশ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত হবার দাবী করতে পারত না। এমন কতকগুলো শব্দ তিনি হামেশা ব্যবহার করতেন, যার ফলে গোটা লেখার মধ্যে একটা মিয়ান অনুনয়ের ভাব ফুটে উঠত। সাজিয়ে গুছিয়ে ঠিকঠাকমত লিখ্‌তে তিনি কোনকালেই পারেন নি। কোন কালেই তিনি চিঠির মধ্যে আবেগ-সঞ্চার করতে পারতেন না। মাথায় যদি আকাশ ভেঙে পড়ে তাহ'লেও তিনি হয়ত লিখতেন—কি একটা গোলমাল হয়েছে। বুক ফেটে যাচ্ছে তবু অকপটে সেকথা স্বীকার করতে লজ্জা করত। বড় জোর লিখতেন— মনটা ভাল নেই।

মনে মনে যা তিনি বিশ্বাস করেন, অকপটে তা লিখতে ভরসা পেলেন না। একঘণ্টা বসে যত কিছু তিনি লিখেছেন, মোদ্দা কথায় তার সবই সত্যের

অপলাপ মাত্র। যে লাইনটি দিয়ে বাণী শেষ করলেন নিজেরই তা পড়তে ভরসা হল না।

—শুনে ওরা হয়তো হাসবে! মনে মনে ভাবলেন প্রধান সেনাপতি। ঠিক করলেন, যদি কেউ হাসে কিম্বা বিদ্রূপ করে, তবে শুধু কথার পর নির্ভর না করে, সৌম্য শান্ত অবিচল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবেন তাদের দিকে।

শোবার ঘর ছেড়ে যাবার আগে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আর একবার নিজেকে ভালভাবে পরীক্ষা করে নিলেন। মুখে আনলেন শান্ত-সমাহিত পাথুরে ভাব। ভাবলেন, তাঁর এই নির্লিপ্ত পাথুরে ভাব দেখে লোকজন নিশ্চয় বলাবলি করবেঃ কি পাষাণের মত মানুষ! এতটুকু বিচলিত হয়নি! হয়ত সবই ভাঁওতা, কিন্তু তাহ'লেও লোকটা জানেশোনে! ব্রুকলিনের এমন দুর্বিপাকও তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি!

তারপর ঘর থেকে বেরুবার পূর্বে আবার পোশাকের পরিপাটির দিকে মন দিলেন। কোটটা টেনেটুনে সোজা করলেন। গোড়ালির কাছে হরিণ-রঙা ব্রিচেজ কুঁচকে ছিল, সেই ভাঁজ টান করে দিলেন। বিলি তাঁর কাফের জন্য দুটো লেস্ বুনেছিল। কব্জির পর আলগোছে ঝুলিয়ে দিলেন লেসদুটি। বুট না পরে পরলেন সাদা রেশমী মোজা আর কালো পাম্পসু। উদ্দেশ্য, যাতে লোকে মনে করে যে তিনি লড়াইয়ের পরিবর্তে নাচের জন্যই তৈরী হয়ে এসেছেন এবং তিলমাত্র বিচলিত হননি। ঘড়ির দিকে চেয়ে মনে পড়ল, ওদের আধঘণ্টার উপর বসিয়ে রেখেছেন। এরপর বন্দুকের গাদন-কাটির মত ছ'ফিট আড়াই ইঞ্চি লম্বা চেহারা টান করে ঢুকলেন অভিনয়ের ভঙ্গিতে।

পাত্রে পাত্রে মদ ঢালা হল। প্রথম টোস্টের প্রস্তাব প্রধান সেনাপতিই করলেন। 'মহাদেশীয় কংগ্রেসের উদ্দেশে'—ধীরে ধীরে বল্লেন তিনি। মুখে বল্লেন বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবলেন, আর কত দিন কংগ্রেসের সম্মানার্থে মদ্যপান করা চল্‌বে? হয়ত কয়েক সপ্তাহ পরেই আবার হিজ ম্যাজেস্টির সম্মানার্থে পানপাত্র তুলে ধরতে হবে। তরুণ সেনানীদের চিন্তামগ্ন বিষণ্ন মুখ দেখে মনে হল যে, প্রধান সেনাপতির এই দুশ্চিন্তা তাদের মনেও ছায়াপাত করেছে।

দ্বিতীয় পাত্র খাওয়া হল আমেরিকার শুভ কামনা করে। পার্শ্বচরগণ কতকটা বিভ্রান্তের মত উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। এ কি রসি-কতা, চালাকি, না নির্বুদ্ধিতা? তিনি তো ভার্জিনিয়াবাসী, আর তারা অধি-

কাংশই ইয়াংকি। না, তারা কিছুতেই ভুল্‌তে পারে না যে প্রধান সেনাপতি ভার্জিনিয়াবাসী। আমেরিকা কথাটা তাদের কানে অপরিচিত বিদেশী শব্দ বলে মনে হল।

—ভদ্রমহোদয়গণ! আসুন আমেরিকার শুভকামনায় আমরা পান করি! তিনি বলেছেন।

বন্দুকের গুলীতে পদদলিত হয়ে কিম্বা সুতীক্ষ্ম কীরিচ বুকে-পিঠে বিঁধে যারা রণক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করেছে, তৃতীয় পাত্র পান করা হ'ল সেই বীর শহীদদের আত্মার কল্যাণে। ফৌজদারদের মুখের দিকে চেয়ে তিনি বুঝলেন যে, মৃত সঙ্গীদের চাইতে দলত্যাগী পলায়িত সৈনিকদের কথাই এরা বেশী ভাব্‌ছে। —যা ভাবে ভাবুক, ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। মনে মনে ভাবলেন।

চতুর্থ পাত্র খাওয়া হ'ল আজাদী ফৌজের ভাবী জয় কামনা করে। এইবার সেনানীরা এমন অবাক্‌-দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাল যে, তিনি যেন অন্যায়, অসঙ্গত এবং অসম্ভব একটা কিছু বলে ফেলেছেন, যেন ও কথা বলা তাঁর গর্হিত হয়েছে।

পঞ্চম পাত্র খাওয়া হল সেনানীদের সম্মানার্থে। এবারে তাদের মুখে খুশীর রাঙা-আমেজ দেখা দিল। সেনানীদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টির সামনে তিনি নিজে খানিকটা বিব্রত, কতকটা নিঃসঙ্গ বোধ করলেন।

বিলি আরও কয়েকটা মাদেরার বোতল দিয়ে গেল।

ষষ্ঠ পাত্র খাওয়া হল তাঁরই সম্মানার্থে—মহাদেশীয় বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিজ্‌ একসেলেনসী জর্জ ওয়াশিংটনের সম্মানার্থে।

—ধন্যবাদ! ধীর গম্ভীর ভাবে বল্লেন প্রধান সেনাপতি। যেমনভাবে এই দৃশ্য অভিনয়ের আয়োজন তিনি করেছিলেন এবং সে অভিনয় তাঁর মাথা-গরম অনুগামী ফৌজদারদের উপর যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ক'রেছিল, তা লক্ষ্য ক'রে নিজের উপর বিষম রাগ হল।

ফৌজদারদের খুশীমত কথা ব'লবার সুযোগ দিয়ে তিনি একরকম চুপ করেই রইলেন। তিনি কি চান এবং সে কাজ যে কত অসম্ভব, মনে মনে তা ভাল ভাবেই বুঝলেন। তিনি চান পশ্চাদপসরণ—একটানা পশ্চাদপসরণ।

তাঁর লোকজন যাতে মুহূর্তের জন্যও এক জায়গায় দাঁড়াতে না পারে... ভাববার সুযোগ না পায়. .দলত্যাগ করতে না পারে,...এমনি কঠোর অন্তহীন একটানা পশ্চাদপসরণ। ব্রুকলিনের ঘটনা অন্ততঃ একটি অতি-গুরুত্বপূর্ণ

বিষয় সম্পর্কে তাকে সচেতন করেছে। সেনাবাহিনী অটুট রাখার গুরুত্ব তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি ক'রেছেন। ভগবানের কৃপায় এখনও তাঁর একটা বাহিনী র'য়েছে। আর কিছুই তিনি পরোয়া করেন না। সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি চলে যাবেন। নিউইয়র্ক পুড়িয়ে ছাই করে দেবেন। বৃটিশেরা যখন শহর দখল ক'রবে, শীতাবাসের জন্য পাবে শুধু একমুঠো ভস্ম। তারপরও যদি প্রয়োজন হয়, মাসের পর মাস চলবে পশ্চাদপসরণ। এলিঘ্যানি শৈলশ্রেণীর দুর্গম কান্তার অতিক্রম ক'রে সরে যাবেন দূর দূরান্তরে। তবু অটুট অবিচ্ছিন্ন রাখবেন তাঁর সেনাবাহিনী।

কিন্তু এ যে অসম্ভব কল্পনা তা তিনি ভালভাবেই জানতেন। কংগ্রেস তাঁকে প্রধান সেনাপতি ক'রেছে সংগ্রাম ক'রবার জন্য, আর শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলার জন্য তাঁকে দিয়েছে ইয়াংকি নাবালকের এক পল্টন!

—এই দ্বীপে এখন আমরা নিরাপদ। নক্স ব'লছিল। —দ্বীপ তো কেল্লারই সামিল। চিরকাল এ-দ্বীপ আমরা দখলে রাখতে পারি।

—হাঁ, চিরকালই আমরা থাক্‌তে চাই এখানে।

—আমি বলি ওসব বাজে কথা ছেড়ে দাও। শহর পুড়িয়ে ছারখার করে, এসো ইংরেজদের জন্য কিছু ছাই রেখে আমরা খ'সে পড়ি।

—পুড়িয়ে দেবেন?

—হাঁ, পুড়িয়ে দেবো। আমার মতে পুড়িয়ে দেওয়াই উচিত।

—আমি যে এই শহরেরই বাসিন্দা স্যর!

কথা কাটাকাটি, রাগ-দ্বেষ-ঈর্ষায় পানপাত্রের গোলাপী আমেজ উবে গেল। উত্তেজনাবশে কেউ কেউ পেছনে চেয়ার ঠেলে ব'সল। সামরিক কৌশলের চুলচেরা তর্ক-বিতর্কে সভা ক্রমেই গরম হ'য়ে উঠল। এমনি সময় বড় আদমী বাধা দিয়ে বল্লেনঃ ভদ্রমহোদয়গণ!

প্রধান সেনাপতির সম্বোধনে সভা নীরব হ'ল। তিনি বুঝিয়ে বল্লেন যে, নিজেই তিনি নিউইয়র্ক পুড়িয়ে দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস নিষেধ ক'রেছে। কংগ্রেসের নীতি ভাল কি মন্দ সে সম্বন্ধে কোন আলোচনাই তিনি শুন্‌তে রাজী নন্।

—তাহ'লে আমাদের আবার পিছু হট্‌তে হবে স্যর?

মাথা নেড়ে সায় দিলেন প্রধান সেনাপতি। বল্লেন—শহরের কোনো কোনো অংশে আমরা বাধা দেবো।

বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে সেনানীরা তাকাল প্রধান সেনাপতির দিকে। একি তাঁর নতুন চাল নাকি? ব্রুকলিনে তো বেশ কারসাজি দেখিয়েছেন।

—কিংস্‌ব্রিজের পথ আমাদের রক্ষা করতেই হবে। কণ্ঠস্বরে ক্ষীণ হতাশার ভার ফুটে উঠলেও জোর দিয়েই বল্লেন তিনি। স্পয়তেন দয়ভিলের উপর দ্বীপের উত্তর প্রান্তের এই সাঁকোটি মানহাট্টান থেকে নির্গমনের একমাত্র পথ।

বৃদ্ধ পুটনামের কেমন ভয় ভয় করছিল। তিনিও মাথা নেড়ে সায় দিলেন। এই মাথা-গরম ছেলেদের দলে নিজেকে তাঁর কেমন সেকেলে, বেমানান, কেমন বোকা-বোকা মনে হচ্ছিল।

ব্রুকলিনের ঘটনা এবং অন্যের ভুলের জন্য নিঃস্বার্থ ত্রুটিস্বীকার, এই দুটি জিনিস মিলে শিয়াল-শিকারীর প্রতি মিফ্‌লিনের শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেছে। নেশার আমেজে সে বল্লেঃ যাই হোক্‌, ওয়াশিংটন কেল্লা আমরা রক্ষা করবোই। দুনিয়া রসাতলে গেলেও আমরা দুর্গ রক্ষা করতে পারবো।

এই কথা শুনে সবাই চুপ করল। প্রধান সেনাপতির নাম অনুসারেই কেল্লাটির নামকরণ হয়েছে। তাঁকে স্মরণীয় এবং বরণীয় করবার জন্য, যে কংগ্রেস তাঁকে নির্বাচিত করেছে তার মর্যাদাবৃদ্ধির জন্য বিশাল আমেরিকায় সর্বপ্রথম যে স্থানটি তাঁর নামাঙ্কিত হল, সে এই কেল্লাটি। কিন্তু তার সামনে কেউই কেল্লাটির নামোচ্চারণ করত না। ইঙ্গিতে-ইশারায় বোঝাত। বল্‌ত 'ওই কেল্লাটি'—'হাইট্‌সের উত্তরের ঐ পাহাড়টি'।

—হাঁ, ওয়াশিংটন কেল্লা আমরা রক্ষা করতে পারি। —নামটার পর জোর দিয়ে সসংকোচে বল্লে নক্স। আর সবাইও মাথা নেড়ে সায় দিল।

এ জাতীয় আলোচনা তাঁর অসহ্য বোধ হ'ল। ভার্জিনিয়ান এবং অভিজাত সমাজে, তাঁর নিজের সমাজে মানুষ তিনি। কোনদিনই ইয়াংকি বালকের সংসর্গে আসেননি। জীবনে শ্রদ্ধা পেয়েছেন, প্রশংসা শুনেছেন, কিন্তু ভালবাসা পাননি। তবু এরা অসংকোচে তাঁর অনুগমন করতে প্রস্তুত; এমনকি প্রয়োজন হলে জাহান্নামে যেতেও দ্বিধা করবে না—এ কথা শুনে স্বভাবতই মনটা কেমন প্রসন্ন হয়ে ওঠে। জ্ঞানতঃ এমন কিছু তিনি করেন নি, যার জন্য এদের এই একনিষ্ঠ ভালবাসার অধিকারী হতে পারেন। প্রথমে এরা তাঁকে ঘৃণাই ক'রত। কিন্তু ঘৃণার প্রতিদানে বারবার তিনি সমদর্শী ন্যায়বিচার করেছেন। এছাড়া এদের চোখে তাঁকে যদি নির্ভীক, সম্মানার্হ শ্রদ্ধেয় কি মহীয়ান বলে মনে হয়ে থাকে, তার কারণ তিনি জানেন না। এদের ভালবাসা তাঁকে মুগ্ধ করে, বিস্মিত করে। পুরো কারণ উপলব্ধি করতে পারেন না বলে আরও বিস্মিত হন।

—যা করা সম্ভব নিশ্চয় করবো। হতাশ্বার ভাবে বল্লেন তিনি।

—এখানে ওদের সঙ্গে লড়াই না করাই উচিত। বৃদ্ধ ইস্রায়েল সুপারিশ জানায়।

—যা করা সম্ভব অবশ্যই করা হবে!

—এ শহর আমাদের ছেড়ে যাওয়া উচিত!

—না!

গ্লাস ছয়েক মাদেরার নেশায় বিভোর স্পেন্সার চেঁচিয়ে উঠলঃ দোহাই ঈশ্বরের! শহর আঁকড়ে থেকে শুয়োরের বাচ্চাদের জাহান্নামে পাঠিয়ে দিন্।

—আপনার নেশা হয়েছে স্যর। বৃদ্ধ ইস্রায়েল শান্তভাবে বল্লেন।

—যাও যাও, বুড়ো মাগী কোথাকার! মাতাল হয়েছি! এখনো তোমাকে জাহান্নামে পৌঁছে দিয়ে আস্তে পারি, এ মুরদ আছে।

—মুখ সামলে কথা ব'লো স্পেন্সার! গুরুগম্ভীর কণ্ঠে ধমকে উঠলেন ভার্জিনিয়ান্।

এই ধমকের পর অনেকক্ষণ কারও মুখে রা' বেরুল না। সব চুপচাপ।

প্রধান সেনাপতি বল্লেনঃ পথঘাট থেকে সৈনিকদের ধরে এনে নিজের নিজের বিগ্রেড্ গড়ে তুলুন। চোরাই মাল যা পাবেন কেড়ে নেবেন। সাধারণ চোর-ছ্যাঁচোরের শাস্তি ত্রিশ ঘা' বেত। দলত্যাগের শাস্তি একশো ঘা', আর বলাৎকারের শাস্তি পাঁচশো' ঘা'। একথা ভাল করে সমঝে দিতে হবে। আমি চাই, সৈনিকদের আবার কুচকাওয়াজ করান। যারা বন্দুক ফেলে এসেছে, নতুন বন্দুক না পাওয়া গেলে তাদের হাতে একটা বর্শা কি একখানা ছোরা, কি নিদেন একটা পিচ্‌ফর্ক তুলে দিন। কেউ যেন খালি হাতে না থাকে। সৈনিকদের আনুগত্য ফিরিয়ে আনবার উদ্দেশ্যে এবং তাদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য আমি এক আদেশনামা লিখেছি। এখুনি আপনাদের প'ড়ে শোনাচ্ছি। কাল এই আদেশনামার নকল আমার সেক্রেটারী আপনাদের দেবে। নিজের নিজের বিগ্রেডকে এই আদেশনামা পড়ে শোনাবেন। আমি যা লিখেছি শুনুনঃ

> 'আমাদের তামাম সৈন্যবাহিনী আবার একস্থানে মিলিত হয়েছে। এখন আমাদের মধ্যে জলপথের কোন ব্যবধান নেই। শত্রুপক্ষ এখন তাদের রণতরীর খুব সামান্য সাহায্যই পাবে। এখন তারা সৈন্য-বাহিনীকে বহুধা বিচ্ছিন্ন করতে বাধ্য। জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা এখন বেশ কষ্টকর হবে। পক্ষান্তরে আমাদের বাহিনী সুসংবদ্ধ, একজোট হ'য়ে কাজ করতে সক্ষম। বহু অসুবিধার মুখে

সৈন্যবাহিনী তীরে অবতরণ না করিয়ে তারা আক্রমণ করতে পারবে না। আমাদের ফৌজদার এবং সৈনিকেরা যদি সতর্ক থাকে, অতর্কিতে আক্রমণ যদি তারা রোধ করতে পারে এবং আগুয়ান শত্রুর সম্মুখে সেনাবাহিনীর মধ্যে সাহস সঞ্চার করতে পারে, তাহ'লে জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী।

'জেনারেল আশা করেন যে, পদনির্বিশেষে ছোট বড় সেনানীরা প্রাণপণ চেষ্টা করে, হয় জয় না হয় রণমৃত্যু—এই মহান শপথ গ্রহণ করবেন। আমাদের আদর্শের ন্যায়পরায়ণতা, বন্দরের অবস্থা এবং দেশের সন্তানদের শৌর্য-বীর্যে বলীয়ান আমেরিকা একমাত্র জয়-লাভের আশাই করে। প্রাণপাত চেষ্টার সুবর্ণ সুযোগ সমাগত। সমবেত কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা সবাইকে এখন জন্মভূমিকে মহিমামণ্ডিত করতে হবে। তা' না হ'লে আমাদের বাসভূমি ধিকৃত, চির-অবজ্ঞাত হয়ে থাকবে।'

আদেশনামা পড়া শেষ করে তিনি কারও দিকে তাকালেন না। সোজা সামনের দিকে চেয়ে রইলেন। ভাবলেন, এখুনি হয়ত ওরা হেসে উঠবে। কিন্তু কেউ হাসল না। ধীরে ধীরে চোখ ঘুরিয়ে তিনি নক্সের দিকে তাকালেন। তার চোখ অশ্রুভারে টলমল করছে।

ইতিমধ্যে কিংসব্রিজের প্রহরীরা হাজারো দলত্যাগীর মধ্যে একজনকে পাকড়াও ক'রে। ভারমন্টবাসী এই দলত্যাগীটি হাতছাড়িয়ে যাবার জন্য বেশ কিছুক্ষণ ঝাঁকাঝাঁকি দাপাদাপি করল; কিন্তু ছাড় পাবার আশা নেই বুঝে, শেষ পর্যন্ত নিস্ফল ক্রোধে হাত পা' ছেড়ে দিল। সৈনিকটির কাঁধে বিরাট বোঁচকা ছিল একটা। উৎসুক প্রহরীরা পুঁটুলিটা খুলে দেখল যে, তার মধ্যে শুয়োরের মাংস এবং একটি মেয়েদের সিল্কের পোশাকসহ নিউইয়র্কের ছ'সাতটি দোকানের পাঁচমিশালি মালপত্র রয়েছে। প্রহরীদের বুঝতে বিলম্ব হ'ল না যে লোকটি ওস্তাদ লুঠেরা। কিন্তু তার বোঁচকায় চারসেরী একটা কামানের গোলা দেখে তারা তাজ্জব হল।

—এটা কি হে? প্রহরীরা প্রশ্ন করে।

—হারে বোকা! এও বুঝলে না? এতো একটা বল!

—নিয়ে যাচ্ছো কেন? কিসের জন্য গোলাগুলি চুরি করলে?

—হায়রে পোড়া কপাল, এও বুঝতে পারলে না হাঁদারা! এটা নিয়ে যাচ্ছি সর্ষে ভাঙবার জন্য।

বিভীষিকাময় রবিবারের ভোরবেলা

তখনকার দিনে মানহাট্টান দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে যে কয়েকগুচ্ছ ঘরবাড়ী ছিল, তাকেই বলা হ'ত নিউইয়র্ক শহর। আদতে এই ক্ষুদ্র জনপদ ছিল পল্লী-গ্রামের সামিল। চৌদ্দুই সেপ্টেম্বর শনিবার কন্‌কনে অপরাহ্ণে এই শহর থেকে হার্লেমের হেড্‌কোয়ার্টার্সে অশ্বপৃষ্ঠে যাবার পথে ভার্জিনিয়ার ভদ্দর-লোক মনে মনে গত দুই সপ্তাহের ঘটনাবলী পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন।

মোটামুটি নেহাৎ আনাড়ীর মত গোলমেলে কিছু তিনি করেননি। বরং ব্রুকলিন পাহাড় থেকে অমন হুটোপুটি করে ছত্রভঙ্গ পলায়নের পর, পরাভূত জনতাকে আবার যে সেনাবাহিনীর ছাঁচে ঢালা গেছে, এ ভেবে তিনি খুশীই হলেন। দু' হপ্তা পূর্বে নিউইয়র্ক ফিরে এসে তিনি সম্পূর্ণ নিরাশ হ'য়ে পড়েছিলেন। দলে দলে সৈন্য পালিয়ে যাচ্ছে। এক দুইজন করে নয়, দশ-বিশ জন করেও নয়, বিগ্রেড্‌কে বিগ্রেড ফৌজ ভাগ্‌ছে। নিয়ম শৃংখলার কোন বালাই নেই; গোটা শহর উচ্ছৃংখল সৈনিকের লুঠতরাজ বলাৎকার দাঙ্গা-হাঙ্গামা খুনোখুনির ভয়ে তটস্থ। ভার্জিনিয়া ও উত্তর-ক্যারোলিনার বিগ্রেড্‌ এবং নয়া-ইংলণ্ডের সৈন্যদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ লেগেই আছে। গোটা বাহিনী ভেঙে পড়বার উপক্রম।

ভগবানের কৃপায় ইংরেজরা এই সময় মানহাট্টানে অবতরণের চেষ্টা করেনি তাই রক্ষে। আজ তিনি ভাবতে ভরসা পান যে, ইংরেজরা আর চুপ করে না থাকলেও দুশ্চিন্তার তেমন কিছু নেই। তিনটি ডিভিশনে সৈন্যবাহিনীকে ঢেলে সেজেছেন তিনি। বৃদ্ধ পুটনামের নেতৃত্বে একটি ডিভিশনের উপর দিয়েছেন শহর রক্ষার ভার। হীথের নেতৃত্বে আর একটি মোতায়ন করেছেন কিংসব্রিজের পথ আগলাবার জন্য। স্পেন্সারের অধীনে তৃতীয় ডিভিশনটি ভার পেয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তের ডিভিশন দুটির মাঝামাঝি মূল মানহাট্টান রক্ষার। স্পেন্সারকে ঠিক বিশ্বাস করতেন না ব'লে তার ওপর নিশ্চিন্ত নির্ভর করতে পারছিলেন না। প্রধান সেনাপতি তাকে মূর্খ বলেই গণ্য করতেন। কিন্তু কি করা যাবে? আর যে মেজর জেনারেলের উপর তিনি

নির্ভর করতে পারতেন, যাকে তিনি পছন্দ করতেন, বিশবাস করতেন, সেই নাথানেল গ্রীন এখনও সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌তে পারেনি। যাহোক জবর সেরে গ্রীন সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত স্পেন্সারকে দিয়েই কাজ চালিয়ে নেওয়া যাবে। মানসিক স্বস্তি আর আলো-ঝলমল প্রসন্ন শারদীয় অপরাহ্নের ঠাণ্ডা পরিবেশে দুর্ভাবনা কেটে গিয়ে ভার্জিনিয়ানের মনটা কেমন খুশীর তাতে চাঙ্গা হয়ে উঠল।

গত দুই সপ্তাহের মধ্যে মাঝে মাঝে হতাশায় তিনি এমন মুহ্যমান হয়ে প'ড়েছেন যে, দেহে এতটুকু বল আছে মনে হয়নি। তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা বিছানায় পড়ে রয়েছেন। শুধু নৈরাশ্য আর হতাশা। ঠিক এমনি একটা অবস্থা হয়েছিল যখন ব্রুকলিন পাহাড়ের বিপুল ক্ষয়-ক্ষতির সংবাদ শুনে সমস্ত আশা বিসর্জন দিয়ে কংগ্রেস ডাঃ ফ্রাঙ্কলিন এবং মিঃ জন আদম্‌সকে পাঠিয়েছিল জেনারেল হাউ'র সঙ্গে আত্মসমর্পনের আলোচনা চালাবার জন্য। কংগ্রেসের ভৃত্য তিনি। প্রতিবাদ করবার অধিকারী নন। সৈনিক হিসাবে আদেশ পালন করাই তাঁর কর্তব্য। কিন্তু তবু নিরুপায় হতাশায় প্রিয়-পরিচিত-পার্ষদদের কাছে, যাদের তিনি একান্তভাবে ভালবেসে ফেলেছিলেন সেই নক্স, পুটনাম, মিফ্‌লিনের কাছে বার বার ব'লেছেনঃ কেন, কেন, কেন? কেন এই আত্মসমর্পণের আলোচনা? তারা বলেছেঃ না, আপনি যে শংকা করছেন তা' হবে না। আত্মসমর্পণের কোন আলোচনাই হবে না।

—যারা আমাকে লড়াই ক'রবার জন্য পাঠালেন, এখন তাঁরাই আবার আদমস্‌ আর ফ্রাঙ্কলিনকে পাঠাচ্ছেন আত্মসমর্পণের কথা চালাবার জন্য! আর্তকণ্ঠে বল্লেন প্রধান সেনাপতি। —আজাদীর সংগ্রামে কিছু লোক প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু তাতে এমন কি হয়েছে বলো!

—প্রাণহানির গুরুত্ব আছে স্যর! ওরা বুঝাবার চেষ্টা করে।

—ফ্রাঙ্কলিন বুড়ো হয়েছেন, কোনো হিম্মৎ নেই তাঁর।

—না, তিনি আত্মসমর্পণ করবার পাত্র নন।

—আর আদমস্‌ই তো আমাকে নিয়োগ ক'রলেন! এখন তিনিই ভয় পেয়ে গেলেন! একটু থেমে আবার বল্লেনঃ না না, আসল কথা ওরা সবাই ভড়কে গেছেন আর সেই জন্যই আত্মসমর্পণ করতে চাইছেন। আমি বেশ বুঝতে পারছি, ভয় পেয়ে ও'রা আত্মসমর্পণ করতে চান্‌।

ইংরেজের সঙ্গে আলোচনা শেষ পর্যন্ত ফে'সে গেল। ডাঃ ফ্রাঙ্কলিন্‌ বেশ একদফা বুদ্ধির কসরৎ দেখালেন। ব্যস্‌, ঐ পর্যন্তই। ভার্জিনিয়ান

ভাবলেন, তাহ'লে তিনি অমন বিচলিত হ'য়ে প'ড়েছিলেন কেন? ব্রুকলিনের কেলেঙ্কারীর পর বিপ্লবের ফানুস হয়ত বা ফেটে গেল, এ শংকা কেন তাঁকে উদব্যস্ত করে তুলেছিল? আত্মবিশ্লেষণে বরাবরই তিনি আনাড়ী। অন্তর্দর্শনের চেষ্টা করলেও জুৎ হত না। তাই বরাবরই কেমন একটা বিতৃষ্ণা ছিল ও সম্পর্কে। অন্তর্দৃষ্টিকে কেমন জঘন্য জিনিস বলেই মনে হত। তবু মনে মনে যতোটুকু আত্মবিশ্লেষণ করেছিলেন, তাতে বেশ উপলব্ধি ক'রতে পারলেন, তিনি যে নির্বোধ নন, নেতা হিসাবে কিছু মুরদ যে তাঁর আছে, শুধু এই কথা প্রতিপন্ন ক'রবার জন্যই তিনি শংকিত হয়ে পড়েননি। এছাড়াও ভিন্ন কারণ ছিল। কিন্তু কি সে কারণ স্পষ্ট বুঝতেন না। সত্য বটে তাঁর নেতৃত্বাধীনে যে ইয়াংকি জনতা, বনবাদাড়ের দক্ষিণী কিংবা পরদেশী বিপ্লবীরা পরিচালিত হচ্ছিল, তাদের সংগে কোন আত্মিক যোগাযোগ তিনি অনুভব করতেন না। তবু সর্বক্ষণ মনে মনে কি যেন একটা প্রচণ্ড শক্তির দুর্নিবার আহ্বান শুনতেন। মনে হ'ত, বিরাট এক চুম্বক-শক্তি যেন তাঁকে প্রতিনিয়ত সবলে আকর্ষণ করছে।

অন্তর্দর্শনের ক্লেশকর দুর্ভাবনা আজ তিনি চুকিয়ে ফেলেছেন। সমস্ত শংকা সংশয় আর দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে প্রাণ-জুড়ান হাওয়ায় পথ-চলার আনন্দে নিজেকে স'পে দিয়েছেন। চট্‌চটে কাদাভরা পিছল পথে কদমে ছুটেছে ঘোড়া। ডাইনে-বাঁয়ে মধ্য-মানহাট্টানের মনোরম প্রাকৃতিক শোভা। আঁকা-বাঁকা পথ চলেছে নয়নাভিরাম বনানীর বুক চিরে...কখনও চলেছে সর্পিল শাখানদীর কোলঘেঁষে...কোথাও বা শান্ত বক্ষ রূপালী ছোপমাখা সরোবরের পাশ দিয়ে...আর না হয় পাথরের আল-দেওয়া ক্ষেতের মধ্য দিয়ে। প্রকৃতির এমন প্রশান্ত সুন্দর চোখ-জুড়ান রূপ তিনি জীবনে দেখেননি। এমনকি তাঁর প্রিয় পোটোমাকের তীরেও প্রকৃতি এমন নয়নাভিরাম বলে মনে হ'ল না। গাঁয়ের মানুষ তিনি। চাষী। বহু পুরুষের চাষীর সংসারে তাঁর জন্ম। চাষীর সহজবুদ্ধি তাঁর মর্মে মর্মে গাঁথা। কোন কিছু দর্শনে স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবেই তাঁর মনে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ঘনশ্যামল দিগন্ত-ঘেরা গোলাপী আকাশের বুকে উড়ন্ত পাখীর কালো ঝাঁক...সোণার-বরণ ঢেউ-খেলান ওলন্দাজ গমের ক্ষেতের পরিচ্ছন্ন শোভা...মেপ্‌ল গাছের অনুপম রক্ত-রাঙা রঙ্‌...নীল-নির্মল পূর্ব আকাশের বুকে ঝুলান উইণ্ড-মিল...পথের ধুলা-বালির মধ্যে পাটকেল-রঙা গিরিগিটির সার...সান্ধ্য-শিকারের জন্য উদ্‌গ্রীব

কুকুরের ঘেউ ঘেউ...বেড়ার ফাঁকে উঁকিঝুঁকি-মারা ছোট্ট শিশুর লাল টুক্‌টুকে মুখের উৎসুক চাহনি...ডুবন্ত সূর্য...ফুরফুরে হাওয়া...উড়ো-মেঘ—পল্লী-জীবনের এই সমস্ত ছবিই আপনা থেকে তাঁর মনে স্বতোৎসারিত ভাবাবেগ সৃষ্টি করে।

এই শীর্ণদেহ মানুষটি জীবনকে ভালবাসতেন ভোগের জন্য। এই মুহূর্ত তাই কেমন মধুময় মনে হ'ল। খুশীর আনন্দে মন কানায় কানায় ভরে উঠল।

সামান্য কয়েকটি ঘোড়সওয়ার দল ছিল তাঁর ফৌজে। তার মধ্যে একটির জন বারো অশ্বারোহী চলেছে প্রধান সেনাপতির সঙ্গে। নাদুস-নুদুস নক্স যাকে পূজা করে সেই মানুষের কাছে কাছে থাক্‌তে পেয়েই খুশী। তরুণ বারকে পাঠিয়েছেন পুটনাম প্রধান সেনাপতিকে হার্লেম পাহাড়ের সদর ঘাঁটিতে পেঁৗছে দেবার জন্য। এছাড়া অশ্বারোহী দলে আছে আর দু'জন ফৌজদার—লেফট্‌ন্যান্ট গ্রেশন আর ক্যাপ্টেন হার্ডি। কিন্তু দেহরক্ষীদল বেশীক্ষণ অশ্বারোহী সৈন্যের কায়দায় দু' দু'জন পাশাপাশি চলতে পারল না। মিছিলটি খানিকটা পথ চলবার পরেই তারা জটলা করে দড়ির মত লম্বা হয়ে গেল। সেনানীরাও খোস মেজাজে ছিলেন বলে আপত্তি করলেন না।

খানিক পরে পার্শ্বরক্ষী দল সমস্বরে গান ধরে দিল—ইয়াংকি বাবুর টাটু ঘোড়ায় চড়ে লণ্ডন শহরে যাবার উপর বাঁধা তাদের চিরন্তন সঙ্গীত। অফুরন্ত এ গানের পদ। অধিকাংশই অশ্লীল। কিন্তু পদের অশ্লীলতা ভার্জিনিয়ার ভদ্দরলোককে পীড়িত করল না। তিনি নাক সিটকালেন ভিন্ন কারণে। গানটিকে তিনি জঘন্য সঙ্গীত বলে গণ্য করতেন। মোজার্ট ও বাকে-এর ভক্ত তিনি। এ গান তাঁর ভাল লাগতেই পারে না। অমনিই মনে প'ড়ল, একটা কঠিন সুর ফ্লুটে তুলবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা কি অক্লান্ত ব্যর্থ চেষ্টাই না তিনি করেছিলেন। সঙ্গীত বিষয়ে তাঁর অবস্থা অনেকটা শিশুর মত। শিশুর মতই ভালবাসেন সঙ্গীত, কিন্তু গাইবার বা বাজাবার মুরদ নেই। লণ্ডন থেকে কোন নতুন সংগীত আসামাত্র তিনি মুগ্ধ হ'য়ে শোনেন...ঘরে খিল দিয়ে প্রাণপণে বাজাবার ব্যর্থ প্রয়াসও করেন। কিন্তু ব্যর্থ সুর-সাধা যখন অর্থহীন দুর্বোধ্য ঝংকারে বন্ধঘরের বায়ুতরঙ্গ বার বার অনুরণিত ক'রে তোলে, লজ্জায় হতাশায় মনে হয়, অন্যান্য সব কিছুর মত এ বিষয়েও তাঁর এলেম বড় জোর চলনসই মাঝারি ধরণের। তার বেশী নয়।

নদীর পাড় বরাবর ব্লুমিংডেল রোড থেকে ডাইনে মোড় ঘুরে একটানা উত্তরমুখো চলেছে মিছিলটি। আঁকাবাঁকা পথ কখনও গেছে গন্ধ-মধুর

ক্ষেতের বুক কেটে, কখনও বা উত্তর-দক্ষিণ দীঘল গোটা দ্বীপটির পিঠের উপর কতকটা শিরদাঁড়ার মত একটানা বৃক্ষ-প্রাচীরের ফাঁক দিয়ে সুতোর মত সরু হ'য়ে। পথের পাশে একটা খামারে থেমে তারা জল খেয়ে নিল শেওলাভরা কাঠের গামলা থেকে। তারপর সন্ধ্যার মুখে মর্নিসাইড পাহাড়ের কোল ঘেঁষে আবার মোড় ঘুরল উত্তর দিকে। সদর ঘাঁটির জন্য নতুন সে স্থানটি নির্বাচন করা হয়েছে, এখান থেকে তার দূরত্ব মাইল কয়েক মাত্র।

জর্জিয়ান কায়দায় তৈরী এই মনোরম সাদা বাড়ীটি থেকে মাউণ্ট ভারননের আদল আসে। মানহাট্টানের ওলন্দাজ-খামারে সেরা যত কুঠি আছে, ক্যাপ্টেন রোজার মরিশের এই বাড়ীটি তার অন্যতম। অবিশ্যি ওলন্দাজ মহল্লায় এমনি ধাঁচের বাড়ীর অভাব নেই। ক্যাপ্টেন মরিশ পাকা হিসেবী লোক। বিপ্লবের হাঙ্গামা হুজ্জোৎ এড়াবার জন্য ইংলণ্ডে পাড়ি দিয়েছেন। বিপ্লবের পাগলামি কেটে গেলে দেশে ফিরবেন। শ্রীমতী মরিশ আছেন ইয়োংকার্সে এক টোরী বন্ধুর বাড়ীতে। ইয়াংকি হাঙ্গামার হরেকরকম আলোচনায় জমে ওঠে তাদের সান্ধ্য মজলিস্। কর্তা-গিন্নির অনুপস্থিতিতে ভার্জিনিয়ান বাড়ীটি দখল করে নিয়েছেন। দু'টি কারণে বাড়ীটি পছন্দ হয়েছে তাঁর। কিংস ব্রিজের মাইল তিনেক দক্ষিণে খোদ শহর থেকে ন' মাইল উত্তরে এই বাড়ীটি মোটামুটি মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত। সদরঘাঁটির উপযুক্ত স্থান। কিন্তু আসল যে কারণে বাড়ীটি তাঁর মনে ধরেছে তা কেউ জানত না। হার্লেম নদীর কিনারে সবুজ ঘাসের গালিচার পর এই মরিশ কুঠি যেন দ্বিতীয় ভারনন পাহাড়। এই সৌসাদৃশ্যই তাঁকে প্রলুব্ধ করেছে।

সদরঘাঁটিতে পৌঁছুতে অনেক রাত হ'ল। প্রায় তৃতীয় প্রহর। সেক্রেটারী রবার্ট হ্যারিশন তাঁর আসার প্রতীক্ষায় জেগে ছিল। তাকে দেখে খোসমেজাজে বলে উঠলেন ভার্জিনিয়ানঃ কাল রবিবার। ভালোই হ'ল। একটা দিন অন্ততঃ ছুটি পাওয়া যাবে।

কিন্তু বিশ্রাম তো দূরের কথা, দম ফেলবার অবকাশ জুটল না। জামা-পোশাক ছাড়তে না ছাড়তেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে একটি বার্তাবহ হাজির। হাঁপাতে হাঁপাতে লোকটি প্রধান সেনাপতির সংগে দেখা ক'রবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

—তিনি শু'তে গেছেন। হ্যারিশন বল্‌লে। কথাটা ভার্জিনিয়ানের কানে এল।

—তাহ'লেও তিনি একবার উঠে এলেই ভালো হয়!

—মুখ সামলে কথা কইবে বেয়াদপ কোথাকার!

সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে ভার্জিনিয়ান বল্লেনঃ ঠিক আছে হ্যারিশন! আমি আস্‌ছি।

আঁটসাট ব্রিচেজ পরা প্রধান সেনাপতির অস্থিসার গা'-খোলা চেহারার দিকে চেয়ে বার্তাবহটি হাঁদার মত ফিক্ করে হেসে ফেল্ল।

—হাঁ, কি বলবে বলো!

—লং দ্বীপ থেকে প্রায় চার পাঁচ হাজার ব্রিটিশ ওই দ্বীপের দিকে আসছে।

—কোন দ্বীপের দিকে?

—মনট্রেশর। ঢোক গিলে বল্লে বার্তাবহটি।

—কে পাঠিয়েছে তোমাকে?

—স্পেন্সার।

—জেনারেল বলো, বেয়াদপ কোথাকার!

—আজ্ঞে হাঁ, জেনারেল। —আবার ফিক করে হাস্‌ল বার্তাবহটি।

রাগে গড়গড় করে বড় আদমী সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে কোটটা পরে নিলেন। মনে মনে বল্লেন—মুখখানা চিনে রাখ্‌তে হবে। সুযোগমত ভাল শিক্ষা দিয়ে দিতে হবে বেয়াদপ পাজীটাকে। কোন কথা না বলে হন হন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন প্রধান সেনাপতি। এক লাফে ঘোড়ায় চড়ে জোর কদমে ছুটলেন অন্ধকারের মধ্যে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই স্পেন্সারের শিবিরের অগ্নিকুণ্ড দেখা গেল।

কোটের ফাঁকে প্রধান সেনাপতির খালি গা' দেখে ভুরু টান করে অলসভাবে টেনে টেনে বল্লে স্পেন্সারঃ সব ঠিক আছে। নদী বরাবর আমি পরিখা কাটবার ব্যবস্থা করেছি। ওরা এখনও ঐ দ্বীপে রয়েছে। যে আয়োজন আমাদের আছে তাতে আজ রাত্রে কি কাল ওরা হানা দেবে বলে মনে হয় না। কোন চিন্তা করবেন না। সব ঠিকই আছে।

ধীর মন্থরে বড় আদমী মরিশ কুঠিতে ফিরলেন। তাঁর উত্তেজনার ভাব কেটে গেছে। গা' হাত পা' এখন কনকন করছে। আসন্ন ঝড়ের মুখে ভার্জিনিয়ার মাঠ-ঘাটে চলবার সময়ও তিনি এমনি পেশীর বেদনা অনুভব করতেন।

পরে শুনলেন ব্যাপারটা কিছুই নয়। অবতরণের মুখে ইংরেজদের বাধা দেবার জন্য স্পেন্সার কিছু বাছাইকরা কনেক্‌টিকাট্ সৈন্য পাঠিয়েছে। সেদিন শনিবার সন্ধ্যায় তারাই ইস্ট নদীর পার বরাবর মার্চ করে যাচ্ছিল পারঘাটার

দিকে। কিন্তু পারঘাটা রক্ষার জন্য এদের পাঠিয়ে স্পেন্সার ভাল কাজ করেনি। কনেক্‌টিকাটের সৈনিকেরা নিউইয়র্ক বা পেন্‌সিলভানিয়ার লোকজনের চাইতে সৈনিক হিসাবে নিকৃষ্ট না হ'লেও এই ব্রিগেডগুলোর দিকে তেমন নজর কেউ দেয়নি। ফলে হাজার ছয়েক সৈনিকের মধ্যে চার হাজারের মত ইতিমধ্যেই সট্‌কে পড়েছে; বাকী হাজার দুয়েক চরম অসন্তুষ্ট, ক্ষুব্ধ। ইস্ট নদীর পার বরাবর আঁকাবাঁকা সরু পথে মাইলের পর মাইল ঘুটঘুটে অন্ধকারে মার্চ করতে বাধ্য হয়ে তাদের মনোবল মোটেই বাড়েনি বরং অসন্তোষ আরও বেড়েছে।

কনেক্‌টিকাট্‌ দলের নেতা মেজর গ্রে নিজেও ক্ষুব্ধ। যে পল্টনে বিশ কি ত্রিশের কোঠায় গণ্ডায় গণ্ডায় লোক জেনারেল হচ্ছে, সেখানে চল্লিশের কাছাকাছি বয়সেও সে মেজরই রয়ে গেল! একি কম আপসোসের কথা!

মানহাট্টানের দক্ষিণ প্রান্তের মাইল চারেক উত্তরে একটি জায়গা আগলাবার জন্য এদের পাঠান হ'য়েছিল। সেখানে পৌঁছে আদেশ দেওয়া হলঃ রোখো! ন্যাপ্‌স্যাক্‌ খুলে ফেলো। পরিখায় লোকজন মোতায়েন করো। পরিখা মানে এক ফুটের মত গভীর তাড়াহুড়া করে কাটা একটা গর্ত। আবার আদেশ দেওয়া হলঃ আরও খানিকটা গর্ত কেটে কাটা-মাটি, গাছের গুঁড়ি আর ডালপালা দিয়ে বুক-সমান পরিখা বানাও। গুঁড়ি ডালপালা পেছনের বনেই আছে।

কিন্তু আদেশ পালনের তেমন চেষ্টা কেউ করল না। সৈনিকেরা সবাই যেমন শ্রান্ত তেমনি ক্ষুব্ধ। ভাবলে, ঐ এক-ফুট-গর্ত পরিখায় চল্‌বে না এমন কিছুই ঘটবে না। ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে তারা হয় পরিখার মধ্যে, না হয় সামনে কি পেছনে চিৎপাত হয়ে শুয়ে প'ড়ল। অধিকাংশ সৈনিকই ঘুমাল। কিন্তু ফৌজদারদের কর্তব্যবোধ তখনও একেবারে লোপ পায়নি; তাই প্রহরী নিয়োগ করে তারা খানিকটা সতর্কদৃষ্টি রাখবার ব্যবস্থা করল।

প্রহরী মোতায়েন ক'রলে কি হবে! ঘুটঘুটে অন্ধকারে কিছুই মালুম হয় না। এমন কি হাতখানেক দূরে ইস্ট নদীর জল পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না এমনি জমাট নিকষকালো অন্ধকার। কিন্তু এই মসীকৃষ্ণ অন্ধকারেও প্রহরী-দের 'সব ঠিক হ্যায়' ধ্বনি খানিকটা আশার সঞ্চার করে।

প্রহরীদের 'সব-ঠিক-হ্যায়' ধ্বনি ছাড়া ঘণ্টাখানেক কোন সাড়াশব্দ ছিল না। তারপর সহসা একসঙ্গে কতকগুলো অপরিচিত আওয়াজ শোনা গেল

—ক্যাঁচ-কোঁচ, কড়-কড়, ছপাৎ-ছপ্‌। থেকে থেকে কানে আস্‌ছে শব্দগুলো। একবার হচ্ছে—থাম্‌ছে—আবার শুরু হচ্ছে। এই আচমকা শব্দ কানে শুনে ঘুমন্ত ইয়াংকিরা হক্‌চকিয়ে উঠল।

এই সময় শান্ত্রীদের 'সব-ঠিক-হ্যায়' ধ্বনি যেন অন্ধকার নদীবক্ষ থেকে প্রতিধ্বনিত হলঃ সব ঠিক নেহি হ্যায়!

প্রতিধ্বনি শুনে শান্ত্রীরা থমকে দাঁড়াল। হাঁকলঃ হ্যালো!

নদীবক্ষ থেকে বিদ্রূপের সুরে প্রতিধ্বনি উঠলঃ হ্যা—লো!

—নদীতে কারা যেন রয়েছে। নিরুত্তেজ কণ্ঠে একটি প্রহরী বল্লে।

ক্যাচ্‌কোচ্‌ ছপাৎ ছপ্‌ আওয়াজের মধ্যে হাসির হিহি-হাহা শব্দ শোনা গেল।

—না, সব ঠিকই আছে। ছাড়া ছাড়া ভাবে বল্ল আর একটি শান্ত্রী।

—কিছুই ঠিক নেই, সব বেঠিক! নিকষকালো নদীবক্ষ থেকে জবাব এল।

ক্যাপ্টেন এবং লেফট্‌ন্যাণ্টরা সলাপরামর্শে ব'সল। কয়েকজন পা টিপে সন্তর্পণে নদীর কিনারে গেল। কালো জমাট অন্ধকারে কিছুই মালুম হ'ল না।

—এক নৌকো বৃটিশ আস্‌ছে। ক্যাপ্টেনদের একজন মেজরকে সংবাদ দিল।

—আমারও তাই মনে হয়।

—ওদের দিকে গুলী চালাবো স্যর?

—কিসের জন্য? ওদের তো আর দেখ্‌তে পাচ্ছো না!

—তা' বটে! আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে সায় দিলে লেফট্‌ন্যাণ্টটি। তার-পর কতকটা আত্ম-সন্তুষ্টির ভাবে বল্লেঃ ওরাও দেখতে পাচ্ছে না আমাদের!

—ধ্যেৎ, যত সব—! যাও ঘুমোওগে'। মেজর বল্ল।

ক্যাপ্টেন ফিরে এসে শুয়ে পড়ল। কিন্তু শান্ত্রীরা যখন বুঝল, নদীবক্ষের কণ্ঠস্বর ভৌতিক কিছু নয়, তখন ইয়াংকি চুটকি ও রস-রঙ্গ করে বাকী রাত-টুকু গরম করে তুল্‌ল। সারারাত চল্ল রস-রঙ্গের তরজা।

ভোরের আলোয় অন্ধকারের অবগুণ্ঠন ক্রমে খুলে গেল। কুয়াশার ঢাক্‌না পাত্‌লা হবার সঙ্গে সঙ্গে কনেক্‌টিকাটবাসীরা দেখ্‌লে যে দু'চারখানা ইংরাজ-বোঝাই নৌকার বদলে চার-চারটে অতিকায় যুদ্ধ-জাহাজ আড়াআড়ি ভাবে মাঝ-দরিয়ায় নোঙর করে আছে। জাহাজ চারটির এক পাশের কামান-শ্রেণীর মুখ তাদের দিকে উদ্যত, পাশে গোলন্দাজরাও প্রস্তুত। এই উদ্যত কামানশ্রেণীর নীচে নদীবক্ষে সাজান রয়েছে সারি সারি বৃটিশ নৌ-সেনা-বোঝাই নৌকা। ইয়াংকিরা তো তাজ্জব। এক একবার চোখ রগড়াচ্ছে আবার বিস্ময়-বিমূঢ় চোখে দেখছে। ইয়াংকি ব্যূহে শংকিত উত্তেজনায় কথাবার্তা

শুরু হ'ল। তখনও যে সব সৈনিক ঘুমিয়ে ছিল ফৌজদাররা ছুটাছুটি করে তাদের জাগিয়ে তুল্‌ল।

কিন্তু কেউ গুলী ছুঁড়ছে না। চুপে চাপে কয়েক মিনিট কেটে গেল। কুয়াশার বুক চিরে প্রভাতী কিরণ যুদ্ধ-জাহাজের মাস্তুলে নয়নাভিরাম রোশনাই সৃষ্টি করল। তবু কেউ গুলী ছুঁড়ছে না। এ এক অদ্ভুত অবিশ্বাস্য অসম্ভব কাল্পনিক অবস্থা,—এক অস্বাভাবিক ভীতিপ্রদ অথচ বর্ণরাগরঞ্জিত ছবি। অতিকায় যুদ্ধজাহাজবহরের শত শত কামান অনল উদ্গীরণের জন্য মুখ হাঁ করে রয়েছে; পাশেই গোলন্দাজরা কেউ বারুদ নিয়ে কেউ অগ্নিসংযোগের শলাহাতে প্রস্তুত। কোয়ার্টার ডেকে এবং সর্বোচ্চ ডেকের উপর দাঁড়িয়ে ফৌজদাররা নিরুত্তেজ দৃষ্টিতে আমেরিকান সৈন্য-শ্রেণী দেখছে। নৌকা বোঝাই নৌ-সেনারাও প্রস্তুত। কিন্তু যন্ত্রের মত সবাই স্থির চুপচাপ সুশৃংখল। আগুনের মত টক্‌টকে লাল ওদের উর্দির চেকনাই চোঁখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে—কিরীচগুলো মনে হয় শূন্যে খাঁজ কাটছে।

আমেরিকানরা তখনও ভয়ে-বিস্ময়ে হাঁ করে দেখ্‌ছে এই দৃশ্য।

তারপর আচম্‌কা বৃটিশ জাহাজের ডেকে বাঁশী বেজে উঠল। মনে হল এই শান্ত-স্নিগ্ধ প্রভাতে কতগুলো চড়ুই একসংগে বুঝি কিচিরমিচির জুড়ে দিয়েছে। বংশীধ্বনির সংগে সংগে ঝপাঝপ্‌ নৌ-সেনা-বোঝাই নৌকার বৈঠা পড়তে লাগল। জাহাজ চারখানার পাশে সাজান বিরাট নৌকার বহর এগিয়ে আস্‌ছে পাড়ের দিকে।

খেড়ে গলায় মেজর গ্রে চেঁচিয়ে কি আদেশ দিল। ইয়াংকিদের গাদা বন্দুকে একটা ঘর্ষণের শব্দ হ'ল কিন্তু গুলীর আওয়াজ শোনা গেল না। কেন না একজন বৃটিশ ফৌজদার ঠিক সেই মুহূর্তে নীরব ইংগিতে তার হাতখানা নামাল এবং সংগে সংগে উড়ন্ত-অগ্নিগোলকের বিকট শব্দ ও ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে দুনিয়ার বুকে এক বিভীষিকাময় নরক সৃষ্টি হল। মুহুর্মুহু যুগপৎ কামান গর্জনে জাহাজ চারখানা এক লহমায় যেন মৃত্যুবর্ষী ধ্বংসকুণ্ডে পরিণত হল। এদের মিলিত অনলবর্ষণে যে কোন জাহাজ নদীবক্ষ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অবিশ্রান্ত সেই সর্বনাশা আগুন ছুটে আস্‌ছে আমেরিকান ব্যূহের দিকে ধ্বংস ও মৃত্যুর তাণ্ডব সৃষ্টির জন্য।

একটু পরেই রণতরী চারখানি কনেক্‌টিকাটবাসীদের চোখের অন্তরালে অদৃশ্য হ'ল। নদীবক্ষে সৃষ্টি হল নিরন্ধ্র ধোঁয়ার পাক-খাওয়া প্রাচীর। মাঝে মাঝে ধূম্রজালের বুক চিরে ছুট্‌ছে উড়ন্ত আগুনের সর্পিল ফিতা। ইয়াংকিরা

বন্দুক তুলে তাক করবার চেষ্টা ক'রল। সঙ্গে সঙ্গে কামানের গোলার ঝাপ্‌টায় হাত থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে গেল বন্দুক। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল; কিন্তু গোলার আঘাতে টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে ছিঁড়ে গেল। তখন চেঁচিয়ে ডাক্‌ল বন্ধুদের; কিন্তু দেখলে, ছিন্নমুণ্ড বিকলাঙ্গ সাথীরা মাটিতে পড়ে আছে মহাঘুমে।

তবু তারা উঠে দাঁড়াল, মরল কিন্তু ছত্রভঙ্গ হল না। কিন্তু যেই দেখা গেল ইংরেজ নৌসেনার নৌকা ধূম্রজাল থেকে বেরিয়ে এসেছে, লাল উর্দি ঝুপঝাপ্‌ জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে সার বেঁধে যন্ত্রের মত নিখুঁত ভাবে এগিয়ে আসছে পাড়ের দিকে—অমনিই শুরু হল পলায়ন। পরিখা থেকে লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল বনের দিকে। লাল-উর্দিয়ালা নৌসেনার মাথার উপর দিয়ে তবুও কামানের গোলা ধাওয়া করছে কনেক্‌টিকাটের নাবালক ও তরুণদের।

দৌড়োতে দৌড়োতে হাতের বন্দুক ফেলে দিয়ে শ'দুয়েক হাত পালাবার পর একটু হাঁফ্‌ ছাড়ল ইয়াংকিরা। প্রাণের ভয় তখন কিছুটা কেটেছে। কামানের গোলা আর এতদূর ধাওয়া করছে না। সামনে সবুজ ক্ষেত প্রভাতী আলোয় স্নান ক'রে ঝলমল করছে। দূরে দেখলে একদল সৈনিক ক্ষেতের মধ্য দিয়ে গা' ঘেঁষে ঘেঁষে মার্চ ক'রে আস্‌ছে। নিশ্চয় তাদের দলের লোক! খোদ নিউইয়র্ক শহরে আর কাদের সৈনিক থাক্‌তে পারে? ফুঁপিয়ে কেঁদে সাদর অভ্যর্থনার জন্য ছুটে গেল কনেক্‌টিকাটের ভয়ার্ত সৈনিকেরা।

খানিকটা এগিয়েই থম্‌কে দাঁড়াল। আগুয়ান সৈনিকদের গায়ে সবুজে উর্দি কেন? কে একজন পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—'ওরা হেসিয়ান্‌!'

আবার পলায়নের জন্য হুড়াহুড়ি পড়ে গেল। যে যেদিকে পারে বেপরোয়া হয়ে দৌড় দিল। সামনে জার্মান পেছনে ইংরাজ নৌসেনা!

রণতরীর অতিকায় কামানগুলো এখন আর গর্জে উঠ্‌ছে না। রণক্ষেত্রে একটা অদ্ভুত থম্‌থমে স্তব্ধতা দেখা দিল। মাঝে মাঝে শুধু শেলযকটু কর্কশ কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছেঃ ইয়ংকি! ইয়ংকি! ইয়ংকি!

হন্যে হ'য়ে ছুট্‌ছে ইয়াংকি সেনা প্রাণপণে। তবু তাদের প্রায়-বেহুঁস অবস্থার মধ্যেও নিজেদের আর্ত-চীৎকারের ফাঁকে ফাঁকে কাণে আস্‌ছে এক ভয়াল হুংকারঃ ইয়ংকি! ইয়ংকি! ইয়ংকি!

খোদ নিউইয়র্ক শহর গড়ে উঠেছিল মানহাট্টান দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে।

ইণ্ডিয়ানদের রুখবার জন্য ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকেরা কাঠের বেড়া দিয়ে যতটুকু স্থান ঘিরেছিলেন, এখন সেই প্রাচীরের ওধারেও নতুন বস্তি গড়ে উঠেছে। তবু তখনকার নিউইয়র্ককে শহর না বলে জনপদ বলাই ভাল। প্রাচীরের ওধারের রাস্তাটিকে তখনই লোকে ওয়াল স্ট্রীট বলে ডাকত। খোদ শহরটি আঁকাবাঁকা সরুপথে ভরতি। রাস্তার দু'ধারে ওলন্দাজদের খাড়া চালের লাল-ইটের বাড়ী। অন্যান্য মধ্য-অতলান্তিক উপকূলের উপনিবেশের মত এখানকার ঘরবাড়ীও হালে জর্জিয়ান কায়দায় তৈরী হ'তে শুরু করেছে। ছোট্ট ঝরঝরে সুন্দর শহর নিউইয়র্ক। মানহাট্টান দ্বীপের বিস্তীর্ণ সবুজ ক্ষেত এবং পাহাড়িয়া বনভূমির সম্পদ-সমৃদ্ধ তার পশ্চাদভূমি।

ওয়াশিংটনের পরিকল্পনা অনুসারে প্রবীণ ইস্রায়েল পুটনামকে দেওয়া হয়েছে মূল শহর রক্ষার ভার। প্রধানতঃ নিউ জার্সি ও পেন্‌সিলভানিয়ার হাজার পাঁচেক সৈনিক আছে তার অধীনে। জার্সি ও পেনসিলভানিয়ার এই সৈনিকেরা নয়া-ইংলণ্ডের ইয়াংকিদের চাইতে লড়াইয়ের ময়দানে খানিকটা বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছে, তাই মাসাচুসেট্‌স্‌, কনেক্‌টিকাট্‌ ও রোড্‌ দ্বীপের সৈনিকদের এরা বেশ ঘৃণা ক'রত। তা ছাড়া, মধ্য-দেশের সৈনিকদের আর ইয়াংকিদের আলাদা রাখা নীতি হিসাবেও সমীচীন। কেননা দু'দলের দেখা সাক্ষাৎ হ'লে নির্ঘাত দাঙ্গাহাঙ্গামা হবে।

এই পাঁচ হাজার গণসেনা শহরের বাইরে ছাউনী ফেলেছে। অধিকাংশই রয়েছে শহরের উত্তর প্রান্তে এবং উভয় দিকের নদীর পাড়ে। শনিবার বিকেলেই পুটনাম মোহানার দিকে বৃটিশ জাহাজের চলাফেরা লক্ষ্য করেছিলেন। রাত্রির অন্ধকারে উভয় পার্শ্বের নদীতে কয়েকটা শব্দ শুনে তিনি বুঝতে পারেন যে, দুই একখানা অতিকায় জাহাজ নিশ্চয় নদীর উজানে নিয়ে আসা হচ্ছে। কিন্তু হার্লেম থেকে ফিরে এসে তরুণ বার্‌ তাকে ভরসা দিয়ে জানায় যে, স্পেন্সার গোটা ইস্ট নদীতীর বরাবর পরিখা কেটে রেখেছে এবং প্রহরীরা হাড্‌সন নদীর মুখোমুখি মানহাট্টান দ্বীপের উপকূলে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। খানিকটা আশ্বস্ত হ'য়ে পুটনাম শু'তে গেলেন; কিন্তু তেমন ভাল ঘুম হ'ল না। তবু বৃটিশ কামানের বজ্র-নির্ঘোষে ঘুম না ভাঙা পর্যন্ত তিনি শুয়েই ছিলেন।

ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে, তাড়াহুড়া করে কোন মতে পোশাক গায়ে চড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে এলেন পুটনাম। বাইরে এসে দেখেন, তার পেনসিলভানিয়া ও নিউ জার্সির লোকজনের মধ্যে ইতিমধ্যেই সোরগোল বেধে গেছে।

কামানের শব্দে তাঁবু থেকে ছুটে বেরিয়ে ভয়ে জড়সড় গিরগিটির মত তারা শহরের সরু পথ ও জংলা অলিগলিতে জটলা ক'রছে।

সারারাত চোখ বুজতে পারেনি' আরন্ বার্। এ দুঃসংবাদ তার কানেও পেঁাছেছে। পুটনামের সদরঘাঁটির সামনে ক্লান্ত বাহনটির পিঠে কোলকুঁজো হয়ে ব'সে সে যা-শুনেছে বৃদ্ধকে জানাল।

—ওরা নেমেছে।

—শুধু ব্রিটিশরা?

—না, জার্মানরাও নেমেছে। দ্বীপের দুই প্রান্তেই নেমেছে।

—আন্দাজ কত জন হবে?

—ব'ল্‌তে পারি না। শুক্‌নো গলায় বার্ বল্লেঃ কি করে বল্‌বো কত জন নেমেছে? তা কয়েক হাজার হবে নিশ্চয়!

বৃদ্ধ পুটনাম চিন্তিতভাবে মাথা নাড়লেন। কোমরে ঝুলান তরবারির উপরে রাখা হাতখানা থর থর করে কাঁপছিল।—কিছুতেই ওরা অবতরণ করতে পারে না। জোর দিয়ে বল্লেন বৃদ্ধ।

—আমি বল্‌ছি কয়েক হাজার অবতরণ করেছে।

—যদি সত্যিই ক'রে থাকে তাহ'লে জেনো, আমরা ইঁদুরের মত খাঁচায় ধরা পড়েছি।

চম্‌কে উঠল বালকটি। উত্তেজনায় তার দেহ বেঁকে উঠল।

—আবার পলায়ন—!

—এখুনি! একদণ্ডও বিলম্ব করা উচিত হবে না। শুন্‌ছেন না, দ্বীপের দুই দিকেই ওরা নেমেছে!

—শুনেছি! বাঁধ-বাঁধ ভাবে বল্লেন পুটনাম।

—আমি বল্‌ছি এখুনি ভেগে পড়ি!

—যদি জেনারেলের সঙ্গে মিলিত হতে পার্‌তাম! —ছাড়াছাড়াভাবে বল্লেন পুটনাম।

—কিন্তু মাঝখানে দুশমন্ রয়েছে যে! মিনতির সুরে বলে বার্। —আপনি বুঝ্‌তে পারছেন না যে দ্বীপের দুই দিকেই তারা আছে। যদি ওদের দুই পাশের সৈন্যদল এক হ'তে পারে তাহ'লে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর থাক্‌বে না।

বৃদ্ধ জেনারেল কোন কথা বল্লেন না, শুধু চিন্তিতভাবে বার বার মাথা নাড়তে লাগলেন।

সেদিনকার পলায়নের মর্মান্তিক দৃশ্য বারের মনে এমন গভীর রেখাপাত করেছিল যে, বহুদিন পর্যন্ত কেউ যদি ব'লত, পশ্চাদপসরণ সহজ, তার প্রতি নীরব ঘৃণায় বারের মন বিদ্ধিষ্ট হয়ে উঠত। সে জান্‌ত যে এগিয়ে যাওয়া সহজ। মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সে উপলব্ধি করেছে, কোন লোক যখন পশ্চাদপসরণ করে তখন সে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। মৃত্যুবরণ করা তত সহজ কাজ নয়!

সেদিনকার ঘটনাও অত সহজ ছিল না। প্রভাতী সূর্যের উত্তাপে হৈমন্তিক বাতাসের সমস্ত স্পন্দন যেন শুষে স্তব্ধ হয়ে গেছে। মানহাট্টানের পাকা ফসলের ক্ষেতে লম্বা গমের ডাঁটাগুলো স্থির অচঞ্চল। শহরের ভদ্রজন দরজা-জানালা খুলে দেখলেন যে মহাদেশীয় গণসেনার উত্তরমুখো স্রোত ব'য়ে চলেছে অলিগলি দিয়ে। দাবানলের মত ইংরেজ ফৌজের অবতরণের সংবাদ রটে গেল। রটনার সঙ্গে সঙ্গেই পেনসিলভানিয়া ও নিউ জার্সির লোকজন ছাড়া আর সবাইর মধ্যে পলায়নের তাড়াহুড়া পড়ে গেল। কেবল এরাই মিনিট কয়েক তবু কিছুটা আত্মস্থ ছিল। তারপর তারাও উত্তর মুখো এগুতে শুরু করল। হাঁটা ক্রমে দৌড়ে পরিণত হ'ল। শহর পেরিয়ে যেতে বিলম্ব হল না; তারপর পাঁচ হাজার সৈন্য হন্যে হয়ে ছুট্‌ল উত্তরমুখো।

সৈনিকদের দিশেহারা দৌড়ে সেনানীরা অনেক পিছনে পড়ে গেলেন। সরু অলিগলিতে ভীড় ঠেলাঠেলি ক'রে কোয়েলের ঝাঁকের মত তারা ছড়িয়ে পড়ল মাঠের মধ্যে। ঝোঁপঝাড় ভেঙে ছুট্‌তে ছুট্‌তে কেউ কেউ দিশেহারা হয়ে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। যেদিকে তাকাবে দেখ্‌বে বৃটিশের ফাঁদ এড়াবার জন্য ভয়ে দিশেহারা আমেরিকান সৈন্য হন্যে হয়ে ছুটে পালাচ্ছে। আড়াআড়ি-ভাবে দ্বীপটির সর্বত্র এই মর্মান্তিক দৃশ্য।

নেহাৎ অভ্যাশবশত পলায়নের সময় কিছু সৈনিকের হাতে বন্দুকটা ছিল। কেউ কেউ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভার লাঘব করেছে। বে-দিশা হয়ে কেউ বা সঙ্গীদের লক্ষ্য করেই গুলী ছুঁড়ে ব'সল। নিজেদের কীরিচের খোঁচায় কারও কারও প্রাণ গেল। ফৌজদারদের মধ্যে যারা এই ছত্রভঙ্গ অবস্থা রোধ ক'রবার চেষ্টা করেছিল, সৈনিকদের গুলীতে তাদের কারও কারও প্রাণ হারাতে হল।

অধিকাংশ সৈনিকই ছুট্‌তে ছুট্‌তে ক্রমে পশ্চিম দিকে বাঁক ঘুরছিল ব্লুমিংডেল রোড্ থেকে কিংসব্রিজ যাবার ধূলো বালি ভর্‌তি পথের দিকে। বাকী আর সবাই বাঁকল পূবমুখো। ক্লান্তিতে আধমরা হয়ে হোঁচট খেয়ে টল্‌তে টল্‌তে, বুকে হেঁটে, আছাড় খেয়ে অবশেষে তারা স্পেন্সারের অবশিষ্ট

নয়া-ইংলণ্ডের সৈন্যদলের সঙ্গে মিলিত হ'ল। কিন্তু সেখানে ইয়াংকি, পেনসিলভানিয়া ও জার্সির ভয়ার্ত জনতা হেসিয়ানদের কীরিচের মুখে এক মর্মান্তিক বিভীষিকার সম্মুখীন হ'ল। অন্ধের মত টল্‌তে টল্‌তে শুক্‌নো জিভে অস্ফুট কাকুতি জানিয়ে ভয়ার্ত শিশুর মত তারা যে যে-ভাবে পারে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু জার্মান ভাড়াটে ফৌজ অকম্পিত দৃঢ়হস্তে তাদের খতম করে চল্ল। কীরিচের খোঁচায় এক একজনকে খতম করছে আর কর্কশ ইয়ংকি-ইয়ংকি-রবে তাড়া করে এই নাবালকদের ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে লাল-উর্দিয়ালা রাজকীয় নৌ-সেনার সুসংবদ্ধ ব্যূহের দিকে।

হেনরী নক্স পুটনামের সঙ্গেই ছিল। বাকী যে ক'টি কামান অবশিষ্ট ছিল পরমযত্নে সে-কটি শহরের বিভিন্ন এলাকায় সাজিয়ে রেখেছিল নক্স। কয়েকটি রাখাল মোহানার দিকে মুখ উঁচিয়ে। কয়েকটি ছিল তার ডাইনে-বাঁয়ে। সামান্য পেছনে উঁচু একটা মঞ্চের পর কয়েকটি রাখল মুখ নীচু করে। বাকী আর ক'টি সাজিয়ে রেখেছিল হাঁকডাকের জন্য হাড্‌সন্‌ ও ইস্ট নদীর মুখে। কিন্তু নক্সের এই সুবিন্যস্ত আয়োজন আসলে অর্থহীন। কারণ অতিকায় বৃটিশ রণতরী ঘায়েল করতে পারে এমন একটি কামানও তার ছিল না। ইংরেজদের অতিকায় কামানের তুলনায় তার কামান খেলনার মত। নক্সের চার বা ছয় পাউণ্ডার কামান দিয়ে বড়জোর দুড়ুম-দাড়ুম দু'চারটে আওয়াজ করা যায়—দু'চার ঝলক আগুন উগড়ান যায়। বৃটিশ কামানের কানফাটা তোপধ্বনি ভেদ ক'রে কোনকালেই এর আওয়াজ শোনা যাবে না। আধমণ খানেক গোলা ছুঁড়বার মত কামান অবশ্য তারও ছিল; কিন্তু এখন তা' ব্রুকলিনের মাটির তলায়। নিজের হাতে পুঁতে রেখে এসেছে।

ব্রুকলিনের ক্ষতির পর অবশিষ্ট কামান ক'টি আগলে ব'সে থাকার নেশা যেন নক্সকে পেয়ে ব'সেছে। তরুণ এই যুবকটি, যাকে অন্য যুবকেরা কর্নেল বলে ডাকতো, ছিল জন্ম-সংগ্রাহক। একসময় সে খনিজদ্রব্যসংগ্রহ ক'রত, তারপর করত' লতাপাতা, তারপর পোকা-মাকড়, তারপর বই, আর এখন মজুত ক'রছে কামান। গোলন্দাজ বাহিনীর প্রতিটি কামান তার চেনা। কানাডার সীমান্ত থেকে কয়েকটি কামান নিয়ে আস্‌বার জন্য বরফ-ঢাকা বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে শত শত মাইল সে হেঁটেছে। নিজ হাতে সে জলের মধ্য থেকে কামান তুলেছে,—পাহাড় থেকে নীচে নামিয়েছে। নিজ হাতে মেজে-ঘসে কামান পালিশ করেছে; আবার নিজেই কামান-টানা গাড়ীর নক্সা তৈরী করেছে।

নরহত্যার কোন আগ্রহই তার ছিল না। বহু পূর্বেই সে ভেবে স্থির করেছে যে, সে ন্যায়ের পক্ষে। তারপর ও সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা ছেড়ে দিয়েছে। কি করে আরও কামান জোগাড় করা যাবে এখন তাই তার একমাত্র ভাবনা। ভার্জিনিয়ার শিয়াল-শিকারী প্রায় সমস্ত বিষয়ে নক্সের বিপরীত চরিত্রের লোক হ'লেও তাঁর প্রতি তার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, তার চরম একনিষ্ঠা এবং নিঃস্বার্থপরতার দরুণ এই ছাব্বিশ বছরের যুবকটিকে বয়সের চাইতে অনেক বুড়ো দেখাত। তাছাড়া তার নাদুস-নুদুস হোঁৎকা চেহারা এবং ছলা-কলায় অনভিজ্ঞ অকপট সরল আচরণের জন্য অধীনস্থ লোকজনও ভালবাসত তাকে।

আজকের এই রবিবারের ভোরবেলা বৃটিশ তোপধ্বনিতে দ্বীপবাসীরা যখন ঘুম থেকে আঁতকে উঠ্‌ল, সবাই যখন হন্যে হয়ে দৌড়াচ্ছে উত্তরমুখো, নক্স তখন তাদের বিপরীত দিকে চল্ল তার কামানের কাছে। তাড়াহুড়া না করে বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে চলেছে সে। কাউকে তার সঙ্গে আস্‌বার আদেশ দিলে না। কামানের কাছে কাছে থাক্‌বার আগ্রহ এবং পালাবার অনিচ্ছা ছাড়া অপর কোন চিন্তা, কোন পরিকল্পনাই তার মগজে ছিল না।

গোলন্দাজ সৈনিকেরা কামানের পাশেই মোতায়েন ছিল। তারা কিন্তু পালাবার উৎকণ্ঠা গোপন করল না। দু'চারজন সরে পড়বার জন্য পা বাড়িয়ে দিল; কিন্তু কর্নেলকে বিমর্ষভাবে একটা কামানের পাশে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে তারা প্রতিনিবৃত্ত হ'ল। কোন নাবালক সহসা পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ হয়ে পড়লে তার যেমন অবস্থা হয়, নক্সের অবস্থাও অনেকটা সেই ধরণের। সে জান্‌ত যে অপেক্ষা করা অর্থহীন; তবু সে অপেক্ষা করছিল। গোলন্দাজরা থেমে একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে রইল। খানিক পরে কয়েকজন স্বস্থানে ফিরে গেল, তারপর দেখাদেখি আর সকলেও ফিরল। তখন ক্যাপ্টেন মিলার নামে একজন বল্লেঃ গোটা পল্টন পালাতে শুরু করেছে কর্নেল।

—জানি। সুপ্তোত্থিতের মত নক্স জবাব দিল।

—এখানে আমরা এখন আর কি করতে পারি?

—কামানগুলো এখনও রয়েছে যে! নক্স বল্লে। তার মনে হল যে কামানগুলো যদি এখানে ফেলে যাওয়া হয় তাহলে কোন সময়েই করবার মত কিছু থাক্‌বে না।

—এখানে থাকা নিরর্থক স্যার! ক্যাপ্টেন আবার জানাল।

—তোমাদের কাউকেই থাক্‌তে হবে না। ঘাড়-ঝাঁকানি দিয়ে নক্স বল্লে।

—দোহাই কর্নেল, এখানে থেকে কামান শুদ্ধ ইংরেজদের হাতে ধরা পড়ে কি লাভ হবে বলুন! ক্যাপ্টেন জোর দিয়ে বল্লে।

—বলছি তো তোমাদের, কাউকেই থাকতে হবে না এখানে। নক্স আবার বলে।

—কিন্তু কর্নেল, ওই বেজম্মারা পালিয়েছে বলে......

—হাঁ, অনেকেই পালিয়েছে। ক্ষুব্ধ রোষে শেষের কথা দুটো টেনে টেনে বল্লে নক্স।

গোলন্দাজরা হেঁট মাথায় এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে রইল মাটির দিকে চেয়ে; কিন্তু কেউ পালাবার চেষ্টা ক'রল না। বছর পনেরোর একটি বালক ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। উত্তর দিক থেকে পলায়নপর পল্টনের সোরগোল শোনা যাচ্ছে। আর তার সঙ্গে আছে বৃটিশ তোপধ্বনির বাতাস-কাঁপানো গুড়ুম-গুড়ুম শব্দ।

মিনিট কয়েক কারও মুখে কথা ফুট্‌ল না। অবশেষে বছর সতেরো বয়সের একটি প্লিমাথ্‌ বালক, পদমর্যাদায় লেফ্‌টন্যাণ্ট, এগিয়ে এসে প্রসন্ন-ভাবে বল্লেঃ দোহাই কর্নেল, সবাইকেই যদি মরতে হয় তাহলে এই ন'চ্ছার জায়গায় মরতে যাচ্ছি কেন? এখান থেকে মাইল কয়েক উত্তরে সুন্দর একটি ছোট্ট পাহাড় আছে। সেখানে কামানগুলো নিয়ে গেলে আমরা খানিকটা লড়তেও পারি। তাছাড়া সেখানে গাছের ছায়াও আছে! সাগ্রহে জানাল ছেলেটি।

—বাবাঃ! যে বিচ্ছিরি গরম! কে আর একজন বলে উঠল।

পল্টনের আর সবাই যখন ভেগেছে সেই সময় প্রতিরোধের এ'রকম আজ-গুবি প্রস্তাব শুনে কতকটা শংকায়, কতকটা উত্তেজনায় গোলন্দাজরা হেসে উঠল।

—কোন পাহাড়ের কথা ব'লছো? নক্স জোর দিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

ওটাকে তো লোকে বাংকার পাহাড় বলেই ডাকে।

গোলন্দাজদের প্রসন্নভাবটা নক্স লক্ষ্য করল। ভাল লক্ষণ বল্‌তে হবে। একটি মাত্র লড়াইতে এই জগাখিচুড়ি পল্টনের জিত হয়েছে। সে লড়াইও হয়েছিল আর একটি বাংকার পাহাড়ে। নক্স খানিকটা চাঙা হয়ে উঠল। গাড়ীতে গোলাবারুদ বোঝাই ক'রবার আদেশ দিয়ে সে ঘোড়ার খোঁজে লোক পাঠাল। খুঁজে পেতে তিনটি বুড়ো টাট্টু ঘোড়া পাওয়া গেল। তিনটি আট-পাউণ্ডার কামানের সঙ্গে ঘোড়া তিনটি জুড়ে দেওয়া হ'ল। বাকী কামান ও গোলা-বারুদের গাড়ী গোলন্দাজরা নিজেরাই টেনে নিয়ে চল্ল। খানিকটা পরে

আমেরিকান পল্টনের ফেলে-যাওয়া গাঁটরি, মরচেধরা কীরিচ ও পুরানো বন্দুক ছড়ান রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চল্ল পাঁচমিশালি মিছিলটি।

বৃটিশদের স্বাগত জানাবার জন্য শহরবাসী ইতিমধ্যেই উদ্যোগ আয়োজন শুরু করে দিয়েছে। মহাদেশীয় পল্টন চলে যাওয়ায় তারা আপদ গেল বলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। রাস্তার দুইপাশে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে মন্থর-গতি কামানের মিছিল দেখে দাঁত বার করে হাস্ছে। ছেলের দল মিছিলের পিছু নিয়ে কলরব করে বলছেঃ ওরে, আর একটা ঘোড়া নিয়ে আয় রে, ঘোড়া নিয়ে আয়! ডজন ডজন রঙ্চঙ্ মাখা রূপসীর জীবিকা খতম হয়েছে পল্টন শহর ছেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে। গোলন্দাজ মিছিলটি দেখে অশ্লীল অশ্রাব্য ভাষায় গলা ছেড়ে তারা গালি পাড়তে লাগল। ডাইনে-বাঁয়ে কোনদিকেই চোখ ফেরাচ্ছে না নক্স, আপন মনে কামানের চাকা ঠেলে যাচ্ছে। কপাল থেকে টুপ্টুপ্ করে গড়িয়ে পড়ছে ঘাম।

ঘামে-ভেজা মিছিলটি বাংকার পাহাড়ে পৌঁছে দেখে, স্থানটি ইতিপূর্বেই দখল হয়ে আছে। গোমরা-মুখো ভারিক্কি চেহারার মানুষ, জেনারেল সিলিমান তাব রেজিমেণ্টের বেশীর ভাগ সৈনিক একজোটে রেখে এই পাহাড়ে সরিয়ে নিয়ে এসেছেন। কতকটা ভীত, কতকটা তেরিয়াভাবে তারা শুয়ে আছে বন্দুক মাথায় দিয়ে। ত্রাসের প্রথম ধাক্কা কেটে যাওয়ায় এখন তারা এমন চটে আছে যে, খুন করতেও হয়ত পিছপাও হবে না।

—এখন কি করবেন ঠিক করেছেন? নিজের চোখকে বিশ্বাস ক'রতে না পেরে নক্স জিজ্ঞাসা করল।

—গলদাচিংড়ি শালারা আসুক এখানে! তখন দেখিয়ে দেবো কি করতে হবে। খেঁকিয়ে উঠল সিলিমান।

নক্স নীরবে মাথা নাড়ল। লোকটাকে সে ভালমত চিন্ত না; তা'ছাড়া কোনকালেই সে সিলিমানের প্রতি কোন টান অনুভব করেনি। তবু আজ তারা দু'জনে একসাথ হয়েছে। উভয়েরই এক চিন্তা। বিষণ্ণভাব কেটে গিয়ে নক্সের মনে এখন শংকা ও উত্তেজনার যোগাযোগে এক দোআঁশলা ভাব জেগে উঠ্ছে। পুটনামের পল্টন উধাও হয়ে গেছে। সূর্য-স্নাত পাহাড়ের মাথা থেকে একটি শীর্ণ নদী এবং সাদা শান্ত একটি খামার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না। নক্স জানত, সব খতম হয়ে গেছে। ত্রাস ও ছত্রভঙ্গ পলায়নের এঁদো ডোবার অতলে তলিয়ে গেছে তাদের বিপ্লব। নিউইয়র্কের বারবনিতারা

হয়ত মাস কয়েক ঠাট্টা-তামাসা ক'রবে, হয়ত কুৎসা রটনা করবে। তারপর তারাও ভুলে যাবে। কিন্তু সে কিছুতেই ফাঁসির দড়ি গলায় পরবে না, কিম্বা জেলে পচে মরবে না। বীরত্বের মিথ্যা-কাহিনী শুনিয়ে সুদূর কোন জনপদে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতেও সে প্রস্তুত নয়। সে লড়বে—প্রয়োজন হয় মরবে। প্রাণ মন দিয়ে যে আদর্শকে সে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে বরণ করে নিয়েছে, যার জন্য সে লড়াই করতে এসেছে, সেই আদর্শের জন্য সে এখানে প্রাণ বিসর্জন দেবে।

—দুই এবং পাঁচ নম্বর ব্যাটারি পাহাড়ের মাথায় সাজাও। হেঁকে আদেশ দিল নক্স।—তোপ দাগবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকো। এক, তিন আর চার নম্বর ব্যাটারি দুই আর পাঁচ নম্বরের ডাইনে-বাঁয়ে সাজিয়ে রাখো।

নক্সের আদেশে সিলিমানের লোকজনের মধ্যেও খানিকটা উৎসাহের ভাব দেখা দিল। ছুটে এসে তারাও কামানগুলো পাহাড়ের উপর ঠেলে তুলবার জন্য সাহায্য করতে লাগল। নক্সের হাত ধরে সিলিমান নীরবে মাথা নেড়ে তার তারিফ ক'রতে লাগল। একটু পরেই ভয় ও নৈরাশ্য ভুলে সৈনিকেরা উত্তেজনা ও কাজকর্মে এমন ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে, একজন ঘোড়সওয়ার জোর কদমে তাদের দিকে ছুটে আসছে তবু সেদিকে ফিরে তাকাবার মত খেয়াল কারও ছিল না।

উসকো-খুসকো পাগলাটে চেহারায় বার্ এসে হাজির হল। ক্লান্তিতে গলা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে। একটি গোলন্দাজ জলখাবার জন্য একটা মগ এগিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত বেচারী শুধু গাঁ গাঁ করছিল। থুক করে মুখ থেকে খানিকটা ধুলোবালি ফেলে দু'একটা ঢোক গিলে ক্রুদ্ধভাবে সে সিলিমানকে জিজ্ঞাসা করলঃ এ সব কি হচ্ছে জেনারেল?

– দেখতেই পাচ্ছো। আমরা পালাইনি।

- হায় ভগবান! সে তো দেখছি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বৃটিশরা যে আপনাদের ঘিরে ফেলবে সে খোঁজ রাখেন?

দৃঢ়ভাবে ঠোঁটে-ঠোঁট চেপে মাথা নাড়ল সিলিমান।

-- হায় ভগবান! কি বলবো! আপনি, আপনি কি আত্মহত্যা করতে চান? ভীরুর মত না পালাবার হিম্মৎ যে রেজিমেণ্টটি দেখিয়েছে তাকে এমনিভাবে ডুবিয়ে দিতে চান? এই করেই কি আমরা আজাদী পাবো? না, এই ভাবে বিপ্লব হবে?

—ঢের ঢের হটেছি আমরা।

—ঢের ঢের হটেছি, ঢের ঢের হটেছি! হাঁদার মত এখানে বসে বসে বারবার একই কথা শোনাচ্ছেন—ঢের ঢের হটেছি! ঢের ঢের হটেছি!

—খুব হয়েছে মেজর! তোমার মুখ থেকে এসব কথা শুনতে আমি রাজী নই।

—একশো বার বলবো। যেভাবে খুশী বলাবো!

—নিশ্চয় না! বিশ বছরের একটা ফাজিল ছোকরার পাকামো শুনতে আমি প্রস্তুত নই।

—নিশ্চয় শুনতে হবে! বাব্ প্রায় চীৎকার করে উঠল। —বিশ বছরের হই আর যাই হই, আপনিও মানুন! বুঝবার মত . . .

—বাব্। গর্জে উঠল নক্স।

দপ্ করে ছেলেটির উত্তেজনা নিভে গেল। ঘোড়ার পিঠে বসে তখন শুধু কাঁপছিল আর ঘামছিল। একটু পরে রুদ্ধ চাপা গলায় বল্লেঃ ঠিক আছে হ্যারি! আমি দুঃখিত। ঠিক কথাই বলেছি, তাহলেও দুঃখিত!

—কর্নেল নক্স বলুন! গোলন্দাজদের একজন স্মরণ করিয়ে দিলে।

ঠিক আছে, কর্নেল নক্স! কিন্তু দোহাই ভগবানের হ্যারি, এই বীরত্বের পাগলামি না দেখিয়ে চলে এসো আমার সংগে।

—না পালিয়ে এখানে ফিরে দাঁড়ানোকে তুমি পাগলামি বলো? দেখেছো ওই শহরে কি হয়েছে?

দেখেছি।

—তবু তুমি আমাদের পালাতে বলো?

আমি তোমাদের বেঁচে থাকতে বলছি!

—কিসের জন্য বেঁচে থাকবো? কি আশায়?

বিপ্লবের জন্য। মৃত্যুর চেয়ে সে অনেক বড়। কি লাভ মরে? তাতে কি হবে বলো? আমি হলপ করে বলতে পারি হ্যারি, আমার কথা শোনো।

—আমার কামান ছেড়ে আমি নড়ছি না।

বাব্ তখন সৈনিকদের দিকে হতাশ পাণ্ডুর মুখ ফেরাল। তীব্র কর্কশ কণ্ঠে বল্লেঃ যা বল্লাম শুনেছো? তোমরা কি শুধু মরতেই চাও? আত্মহত্যার জন্য তোমরা কি সব দিব্যি করে বসেছো? পেন্সিল্ভানিয়ার বেজন্মা ভূত যত! শোনো বলছি, কিংস-ব্রিজে লড়াই করবার জন্য সৈন্যদল তৈরী হয়ে আছে। তারা সেখানে দশ-বিশ-পঁচিশ বছর, দরকার হলে চিরকাল লড়াই করবে।

তারা লড়াই করবে, কিন্তু তোমাদের মত ভূত যারা, তারা চায় শুধু মরতে— লড়াই করতে চায় না।

বারের কথায় সৈন্যদলের মধ্যে ক্রোধ ফেটে পড়ল। নিজে শ্রান্ত বলে বালকটি তাদের মেজাজ বেশ ভালভাবেই আঁচ ক'রতে পারল।—আমার পেছু-পেছু এসো!—হেঁকে বল্লে বার্। সংগে সংগে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে উত্তর-মুখো ছুট দিল। সৈন্যদল হুড়মুড়ি খেয়ে কিভাবে তার পেছন পেছন ছুটছে একবার ফিরেও দেখল না। বারকে গলা ছেড়ে গাল দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত সুলিমানও এদের সংগী হ'ল।

গোলন্দাজরা পড়ে রইল—একপা' নড়ল না। নক্সের অনুগামী সংগী তারা। জীবন-মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নেবার ভার তার হাতে ছেড়ে দিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইল কর্নেলের মুখের দিকে। নক্সের মুখ দিয়ে কথা ফুটল না। নীরবে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে উত্তরমুখো হাঁটতে শুরু করল। হেঁট মাথায় গোলন্দাজরাও অবসন্নের মত তার অনুসরণ ক'রল। তাদের এত সাধের কামান, এত যত্নের সম্পদ পড়ে রইল নির্জন পাহাড়ের চূড়ায়। পেছন ফিরে সে দিকে তাকাবার সাহস কারও হল না।

বৃটিশ রণতরীর তোপধ্বনি একমাত্র যারা মহাঘুমে ছিল তারাই শুনতে পায়নি। সেদিন রবিবারের ভোরবেলা প্রধান সেনাপতি অন্ধকার থাকতে থাকতেই ঘুম থেকে উঠেছেন। রাত্রে ঘুম বেশ ভালই হয়েছিল। খানসামা বিলি ঘরের বাইরে শুয়েছিল। এত পাতলা ঘুম তার যে, প্রভু পাশ ফিরলে পর্যন্ত সে টের পেত। মোমবাতি জেলে সে কর্তাকে জামাপোশাক পরতে সাহায্য ক'রল।

—কালকের রাতটা ভালোই কেটেছে। কালো মাথা নেড়ে হাসিখুশিভাবে বিলি বল্লে।

—তা' অন্যান্য রাতের অনুপাতে ভালোই ব'লতে হবে!

—মিসেস্ পাত্সিকে ছেড়ে আসার পর যে চেহারা হ'য়েছিলো, তা' থেকে এখন ভালোই আছেন।

—খানিকটা ভালো তো বটেই! মুচকি হাসলেন ভার্জিনিয়ান। আজ সকালে বেশ খোসমেজাজেই আছেন।

—যাই আমি স্কিলেট্ ধরাই গে'। সিঁড়ি দিয়ে দুম্‌দুম্ করে নামতে নামতে বিলি বল্লেঃ স্কিলেট ধরিয়ে এখুনি জল গরম করে নিয়ে আসছি!

কেক্, মধু আর চা—এই তিনপদই ভার্জিনিয়ানের রোজকার প্রাতরাশ। আজকেও নতুন কিছু জুটল না। বেশ ক্ষিদে ছিল। তৃপ্তির সঙ্গেই খেলেন প্রাতরাশ। হ্যারিশন তখনও ওঠেনি। ঠিক করলেন হার্লেম-রক্ষী সৈন্যদল একবার পরিদর্শন করে আসবেন। বিলি কর্তার মনোগত ভাব বুঝতে পেরেছিল। মরিশ-কুঠির বাইরে এসে বড় আদমী দেখলেন যে নিগ্রোটি ঘোড়ায় জিন লাগিয়ে অপেক্ষা ক'রছে। এক লাফে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেশ কেতাদুরস্তভাবে কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন ওয়াশিংটন।

রাত্রে শান্ত্রীদের পাশ দিয়ে মিফ্লিনের তাঁবুতে যাবার সময় যে ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিল, ঊষার পাণ্ডুর আলোকচ্ছটায় তা' ফর্শা হ'য়ে গেছে। মিফলিনের রেজিমেণ্ট ক'টি স্পেন্সারের ডিভিশনের উত্তর প্রান্তে মানহাট্টানের মাঝামাঝি সামান্য রক্ষী নিয়ে গড়া একটি ব্যূহ আগলে ছিল। এই প্রত্যূষেও সাজ-পোশাক প'রে বেরিয়ে পড়েছে জেনারেল। প্রধান সেনাপতির দীর্ঘ চেহারা চিনতে পেরে তার মুখে প্রসন্ন হাসিরেখা ফুটে উঠল। হাত তুলে অভিবদান ক'রে যেই সে কথা ব'লবার জন্য হাঁ করল, অমনিই দূরে চার চারটে তোপধ্বনির গুরুগর্জন শোনা গেল। ভার্জিনিয়ান শিরদাঁড়া টান ক'রে কান খাড়া করলেন : তারপর সামনে একটু ঝুঁকেই ঘুম-ভাঙা শিবিরের মধ্য দিয়ে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। মিফ্লিনও ঘোড়ার খোঁজে ছুটল; কিন্তু সে রওনা হবার পূর্বেই ভার্জিনিয়ান অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

একটানা মাইল চারেক ছুটলেন ওয়াশিংটন। জোরে, আরও জোরে ছুট-বার জন্য নির্মমভাবে চাবুক পড়তে লাগল বাহনটির গায়ে। এই মাইল চারেকের মধ্যে লোকজনের সঙ্গে তেমন দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু তার-পরই পলায়নপর সৈন্যদলের সাক্ষাৎ মিলল। কুয়াশার ঢাকনি তখন অন্তর্হিত হয়েছে। ক্ষেত-খামার, ফলের বাগান ঝলমল ক'রছে প্রভাত কিরণের সোনালী প্রলেপে। বেপরোয়াভাবে ঘোড়া ছুটিয়েছেন প্রধান সেনাপতি। ছুটেছেন পথ ছেড়ে। লাফ দিয়ে টপকেছেন দেয়াল ও বেড়ার বাধা। পার হয়েছেন শীর্ণ একটি নদী। পলায়নপর সৈন্যদলের মধ্যে পড়ে চারিদিকে চেয়ে দেখ-লেন, যতদূর দৃষ্টি যায় শত শত দিগ্‌দিশাহীন পলায়নপর মানুষের মাথা ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না। কেউ ছুটছে, কেউ হামাগুড়ি দিচ্ছে, কেউ গা'ঢাকা দেবার চেষ্টা করছে, কেউ টলতে টলতে পড়ে যাচ্ছে।

ঘোড়া থামিয়ে তিনি এদের সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা করলেন।

আড়াআড়িভাবে এদের সামনে দিয়ে আস্তে আস্তে ঘোড়ায় চড়ে গেলেন ; কিন্তু কেউ তাঁকে চিনতে পেরেছে বলে মনে হ'ল না। ছুটছে তো ছুটছেই। কে একজন তাঁকে লক্ষ্য করে গুলীও ছুঁড়ল।

চীৎকার করে বল্লেনঃ হল্ট্!

তাঁর দু'পাশ দিয়ে অবিরাম ধারায় তারা ছুটে চল্ল।

—যা' ব'ল্লাম শুন্‌তে পাচ্ছো? হেঁকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তখন অনুনয় ক'রে বল্লেনঃ রোখো! জানো আমি কে? চিনতে পারো আমাকে? আমি তোমাদের কমান্ডার, তোমাদের জেনারেল। আমি বলছি, থামো! তারস্বরে চীৎকার ক'রে বল্লেন প্রধান সেনাপতি।

কিন্তু কে শোনে তাঁর কথা?

- আমি বল্‌ছি থামো। ঐ পাথরের প্রাচীরের পেছনে যাও। তোমাদের বন্দুক চালাও। দোহাই ভগবানের রোখো!

কিন্তু কেউ ভ্রুক্ষেপ ক'রলে না তাঁর দিকে। কান লম্বা শিকারী কুকুরের তাড়া-খাওয়া ইঁদুরের মত দলে দলে তারা প্রাণভয়ে ছুটে পালাল।

আবার তিনি পলায়নপর সৈন্যদলের মধ্যে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। হাতের চাবুক সপাসপ্ পড়তে লাগল সৈনিকদের উপর। চাবুক ছিঁড়ে গেলে তিনি পিস্তল টেনে বার করলেন। কিন্তু ঘামে ভিজে গেছল ব'লে পিস্তলের গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল। তখন তিনি পিস্তলটাই ছুঁড়ে মারলেন। তারপর টেনে বার করলেন তরবারি। উদ্যত তরবারি হাতে ছুটে বেড়াচ্ছেন প্রধান সেনাপতি। ভয় দেখাবার জন্য কখনও দু' একটা কোপ্ দিচ্ছেন, কখনও অনুনয় করছেন তারস্বরে নিষেধ করছেন কখনো ..তাতেও নিরস্ত হচ্ছে না দেখে আবার দু' চারটে কোপ্ দিচ্ছেন। মাঠের মধ্য দিয়ে অসুরের মত হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াতে লাগলেন। চীৎকার চেঁচামেচিতে গলা ভেঙে গেল। কিন্তু তাঁর সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হল। কেউ কর্ণপাত করলে না তাঁর ভীতি-প্রদর্শন, অনুনয় বা নিষেধ। অবিরাম ধারায় ছুটে চল্ল।

তখন হুটোছুটি বন্ধ করে তিনি এক জায়গায় স্থির হয়ে রইলেন। ভীত ত্রস্ত সৈনিকেরা ছুটে পালাতে লাগল প্রধান সেনাপতির দু'পাশ দিয়ে। তাঁর শিথিল মুষ্টি থেকে তরবারিখানা খসে পড়ল শিশির-ভেজা ঘাসের মত টলমলে ঘাসের মধ্যে। লৌহশলাকার মত শক্ত তাঁর শিরদাঁড়া নুয়ে পড়ল। গ্রন্থিহীন আলগা হাড়ের একটা লম্বা থলির মত তিনি বিবশ হয়ে বসে রই-

লেন ঘোড়ার পিঠে! চেয়ে দেখলেন, কয়েকশ' গজ দূরে এক-সার বৃটিশ সৈন্য। হাওয়া নেই, তবু উড়ন্ত লালফিতার মত সামরিক কায়দায় মার্চ করে এগিয়ে আসছে নৌ-সেনারা। তবু তিনি নড়লেন না। মনে হ'ল তিনি যেন শূন্যে ঝুলছেন। মনে হল তিনি বেঁচে নেই—মরে গেছেন। কিন্তু এখনও তিনি দেখতে পাচ্ছেন, শুনতে পাচ্ছেন, এখনও তাঁর বোধশক্তি আছে—একথা উপলব্ধি ক'রে নিজেরই কেমন অবাক লাগল।

আগুয়ান বৃটিশ সেনা তখন শ' খানেক গজ দূরে পেঁাছেছে। প্রধান সেনাপতি চেয়ে দেখলেন মিফ্‌লিন পাশে রয়েছে। মিফ্‌লিনের কথা দূর-আগত কণ্ঠস্বরের মত ক্ষীণভাবে তাঁর কানে এল। মিনতির সুরে সে ব'লছেঃ চলে আসুন স্যর! দয়া করে চলে আসুন!

আর কয়েকজনও ছিল তাঁর পাশে। তিনি যখন মরে গেছেন তখন এরা তাঁকে চলে আস্‌তে বলছে কেন?

আবার অনুনয় জানাল মিফ্‌লিনঃ স্যর। চলুন দয়া করে!

মিফ্‌লিনের দুশ্চিন্তা-কুণ্ঠিত মুখের দিকে তাকালেন তিনি। আবার সে মিনতি জানালঃ চলুন স্যর! নীরবে তিনি রাশটা মিফ্‌লিনের হাতে তুলে দিলেন তাঁর ঘোড়া চালিয়ে নেবার জন্য। ইংরেজরা ততক্ষণে তাঁকে তাক করে গুলী ছুঁড়তে আরম্ভ করেছে। কোন পরোয়া নেই। দুনিয়ার কোন কিছুতেই এখন কিছু আসে যায় না।

শ্রীমতী মারের আতিথেয়তা

লড়াইয়ের সব কিছুই শেখান হ'য়েছে বৃটিশ বাহিনীকে। ক্রমাগত কুচ-কাওয়াজ করিয়ে, লড়াইয়ের সমস্ত কায়দা-কানুন রপ্ত করিয়ে বাহিনীটিকে তৎকালীন দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সমর-যন্ত্রে পরিণত করা হয়েছে। একজন বৃটিশ জেনারেল গর্ব করে বলেছিলেন যে, মার্চ করে ইংলিশ প্রণালী পার হ'য়ে ফ্রান্সে পৌঁছুবার হুকুম দিয়ে সে হুকুম তিনি তামিল করাতে পারেন। সমুদ্রের অতলে শেষ সৈনিকটির মাথা অন্তর্হিত হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তারা সে আদেশ পালন করবে। এ অতিশয়োক্তি নয়। জেনারেল খাঁটি সত্য কথাই বলেছেন। প্রয়োজন হ'লে ঠিক এমনিভাবেই তিনি সৈন্যবাহিনীকে খাড়া পাহাড়ের শেষপ্রান্তে নিয়ে মার্চ ক'রবার আদেশ দিতে পারতেন ; এবং লাল-উর্দিয়ালা সৈনিকেরাও বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা বিরক্তি প্রকাশ না ক'রে নির্বিকার-ভাবে তাঁর হুকুম তামিল ক'রত।

লড়াইয়ের শিক্ষা বৃটিশ বাহিনী পেয়েছে ; কিন্তু কোন বাহিনী লড়াই ক'রতে একে যদি পালিয়ে যায়, তখনকার ইতিকর্তব্য যে কি, কোনকালেই সে শিক্ষা তারা পায়নি ! কোন বাহিনীর পশ্চাদপসরণ এক কথা। সে ক্ষেত্রে যে কোন কায়দায় পশ্চাদনুসরণ করে তাদের মনোবল ভেঙে দিয়ে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে হবে, তা তাদের জানা আছে। কিন্তু এ তো পশ্চাদপসরণও নয় !

নিউইয়র্ক শহরে বেশ কিছু সৈন্য অবতরণ করাতে যেটুকু সময় জেনারেল হাউ'র লেগেছিল তার মধ্যেই আমেরিকান ফৌজের সমস্ত সুস্থ সবল লোক সটকেছে। গীর্জা ও সিনাগগে শুধু আহত ও রোগীর ভীড়। প্রচণ্ড গরমে কেতাদুরস্ত হাউ বেশ অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন। আমেরিকার অনেক কিছুই তার দু'চোখের বিষ। আমেরিকার আবহাওয়া এই বিরক্তিকর জিনিসের অন্যতম। এদেশের ঋতু সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না হলপ করে। গ্রীষ্ম-কাল সহসা হয়ত শীতকাল হয়ে পড়ল—হেমন্ত হল গ্রীষ্মকাল। জানুয়ারী কিম্বা বছরের অন্য যে কোন সময় হয়ত বসন্তের স্নিগ্ধ আমেজ টের পাওয়া

গেল। আমেরিকানদের মত তাদের দেশের আবহাওয়াও হিংস্র, সামঞ্জস্যহীন,. বিরক্তিকর।

তাপমান যন্ত্রে বিরানব্বুই ডিগ্রী উঠেছে। লাল-উর্দিয়ালা সৈনিকেরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে পথে পথে। এই অবস্থায় ঘামে-ভেজা জিনের 'পর বসে জেনারেল হাউকে শহরের রাজভক্ত, কৃতজ্ঞ ও সম্পন্ন নাগরিকদের এক কমিটির অভিনন্দন গ্রহণ করতে হ'ল। নাগরিকদের মুখপাত্র হিসাবে ফিনিয়াস্ থ্যাচার নামে এক শস্যের বেপারী তাদের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করল।

থ্যাচার বল্লেঃ মান্যবর জেনারেল মহোদয়, এই চোর দাগাবাজ খুনী গুণ্ডা দলের হাতে যে নির্যাতন আমাদের ভোগ ক'রতে হয়েছে তার ইতিহাস বর্ণনা ক'রবার অভিপ্রায় আমার নেই।

—ঠিক আছে। অতিষ্ঠভাবে মাথা নেড়ে জানাল হাউ।

—মহামান্য সম্রাটের অনুগত প্রজা হিসাবে কি অসীম ধৈর্য আমাদের দেখাতে হয়েছে তার কাহিনী আপনাকে শোনাবার অভিপ্রায়ও আমার নাই।

—বেশ, তার পর?

—আমি শুধু আপনাকে আমাদের মুক্তিদাতা হিসাবে অভিনন্দিত করতে চাই। ..

—নিশ্চয়! নিশ্চয়! সায় দিয়ে হাউ বল্লেন। ভাবলেন, এই ভণিতা কি শেষ হবে না?

—আমাদের রক্ষাকর্তা হিসাবে স্বাগত জানাতে চাই।—ফিনিয়াস্ বলে চল্ল।

সৈন্যদল শেষ অবধি আবার চলতে শুরু করল। রণভেরী ও বাঁশী বাজিয়ে, সদর্পে রেজিমেণ্টের পতাকা উড়িয়ে অতিকায় রঙ-বেরঙের সাপের মত শহর পার হয়ে এগিয়ে চল্ল বৃটিশ ফৌজের দীর্ঘ সারি। তালে তালে একসাথে পা ফেলার খট্ খট্ শব্দের মাঝে মাঝে শোনা যায় গোলন্দাজ বাহিনীর ভারী আওয়াজ। সাদা ঘোড়ায় চড়ে জেনারেল হাউ এবং তার পার্শ্বরক্ষীরা চলেছে আগে আগে। মানহাট্টানের পল্লীপথ এমন মনোরম চোখ ধাঁধান মিছিল ইতিপূর্বে কখনও দেখেনি। আর এই আগুয়ান সেনাদলের চতুর্দিকে ছড়ান ছিল আমেরিকান পল্টনের পলায়নের নিদর্শন—ন্যাপস্যাক্, বন্দুক, বেল্ট, টুপী, গুলীভর্তি থলে, পুরনো কীরিচ, আরও কতো কি।

—খুব হন্যে হয়ে পালিয়েছে মনে হচ্ছে। পার্শ্বরক্ষীদের একজন বল্লে।

—হাঁ, খুব তাড়াহুড়া করেই ভেগেছে। হাউ বল্লেন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে।—অদ্ভুত কর্মশক্তি এই দেহাতী লোকের। পালাবার ব্যাপারেও কম যায় না।

—খুব বেশী দূর গিয়েছে বলে মনে হয় না।

—কেন? দেহাতী লোকেরাও অমন বক্‌বক্‌ করে নাকি? ঐ বক্‌-বকানির পাল্লায় না পড়লে, পাকা এক ঘণ্টা আগে আমরা রওনা হ'তে পারতাম।

বৃটিশ ফৌজ রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চল্ল। গরমও ক্রমেই বাড়ছে। ঘামে ভিজে তাদের পরিপাটি করে পাট করা রঙচঙা উর্দি চুপসে গেল। এই সময়ে একদল হেসিয়ানের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হয়। ইস্ট নদী থেকে দ্বীপটির আরও উত্তরে অবতরণ করছিল জার্মান ভাড়াটে ফৌজ। একদল নোংরা ভীত বন্দী আমেরিকান নাবালক নিয়ে সোল্লাসে ফিরছে। বন্দীরা এত ক্লান্ত যে হাঁটতে পর্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। জার্মানরা এই কৃতিত্বের জন্য গর্বিত, হাসিখুশী। কিন্তু লাল-উর্দিয়ালা ফৌজ নাক-সোজা মার্চ করে এগিয়ে গেল; তাদের দিকে ফিরেও তাকাল না।

—তোদের কমান্ডার কোথায়? জেনারেল হাউ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করলেন।

মাথা নেড়ে তারা বন্দীসহ এগিয়ে গেল।

—দুত্তোর, একরোখা জানোয়ার কোথাকার।

—তোদের কমান্ডার কোথায়? আবার জিজ্ঞাসা ক'রলেন হাউ। জার্মান উচ্চারণের ভঙ্গীতেই কথাটা বলেছিলেন, তবু এরা বুঝতে পারছে না দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

—এভাবে আদেশ লংঘন করা মোটেই ভাল নয়! পার্শ্বরক্ষীদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল।

—চুলোয় যাক। হাউ বল্লেন। যেমন বিরক্ত, তেমনি শ্রান্ত এবং ভেতরে ভেতরে গরম হয়েছিলেন বৃটিশ জেনারেল। তিনি বুঝলেন, আজকের দিনে কিছু আমেরিকান বন্দী কুড়ানোর বিরক্তিকর মেহনৎ ছাড়া আর কিছুই ঘটবার সম্ভাবনা নেই। তিনি ভেবেছিলেন, জোর লড়াই হবে, আমেরিকানরা প্রচন্ড বাধা দেবে। পরিখা রক্ষিত শত্রুব্যূহের প্রতিরোধের মুখে সৈন্য অবতরণের সেতুমুখ স্থাপনের চেষ্টা করে, সামরিক কলা-কৌশলের দিক থেকে এক দুরূহ কাজে নেমেছিলেন তিনি। প্রচন্ড প্রতিরোধ প্রত্যাশা করা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু কিছুই হ'ল না। ওয়াশিংটনের বাহিনী যেন শূন্যে মিলিয়ে গেল।

দীর্ঘকায় জেদী শিয়াল-শিকারীকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন তিনি। অনেকটা তাঁর গুণমুগ্ধও বলা চলে। আবার হুইগ-পন্থী হিসাবে বিপ্লবীদের আদর্শের প্রতিও খানিকটা দরদ তাঁর ছিল।

বিপ্লবীদের প্রতি কোন ঘৃণাই তিনি পোষণ করতেন না। লড়াইয়ের ময়দানে ইয়াংকিদের সঙ্গে ভালমত একটা মোকাবিলা ক'রবার অধীর আগ্রহ তাকে চঞ্চল করে তুলল। খেলোয়াড়ী মনোভাব নিয়ে বেশ কড়া ঠেংগানি দিয়ে লড়াই খতম করে দেবার জন্য তিনি উস্‌খুস্‌ করতে লাগলেন। তার মতে সমস্ত লড়াই এমনভাবে শেষ করতে হবে, যাতে উভয় পক্ষের সম্মানিত ভদ্রলোকেরা এক টেবিলে বসে খানাপিনা করে বিবাদ নিষ্পত্তি করে ফেলতে পারে। কিন্তু এই ছত্রভঙ্গ পলায়ন, এই কাপুরুষোচিত ভীরুতা দেখে তাঁর পিত্তি জ্বলে গেল। বিপ্লবের অপমৃত্যু হ'য়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত আদর্শও শূন্যে মিলিয়ে গেছে। সব আদর্শবাদের যে গতি হয় এই বিপ্লবী আদর্শেরও তাই হ'ল। কিন্তু উঃ, কি অসহ্য গরম।

শীগগিরই ইংলণ্ডে ফিরে যাওয়া যাবে ভেবে হাউ বেশ খুশীই হলেন।

একটি হালকা পদাতিক দলকে এখান থেকে আরও মাইল কয়েক উত্তরে নৌকা করে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই দলের একজন ফৌজদার ঘোড়ায় চড়ে এসে জেনারেল হাউকে সেলাম করে আমেরিকানদের পলায়ন সম্পর্কে আরও খোঁজ খবর দিল।

রাত হবার আগেই আমরা ওদের সবাইকে বন্দী করতে পারি। সাগ্রহে বলে ফৌজদারটি।

--ওদের সঙ্গে কতলোক যাচ্ছে মনে হয়? হাউ জিজ্ঞাসা করলেন; কিন্তু তাঁর প্রশ্নে তেমন আগ্রহের ভাব টের পাওয়া গেল না।

—তা এই দ্বীপেই হাজার দশেকের মতো হবে!

--তা' মন্দ নয়! টুপী তুলে কপালের ঘাম মুছে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বল্লেন হাউ।

—কিন্তু স্যর, তাহ'লে আপনাকে একটু চট্‌পট্‌ করতে হয়!

- কেন হে, ঢের সময় তো র'য়েছে!

--তা আছে স্যর। কিন্ত আমার ধারণা, ওদের কয়েক হাজার লোক এখান থেকে পশ্চিমে এই দ্বীপেই র'য়েছে। আমরা অনায়াসে তাদের ইঁদুরের মত খাঁচায় আটকে ফেলতে পারি।

– ঠিক আছে। কিন্তু কি জানো, এক চুমুক না খেয়ে আমি আর টিকতে

পারছিনা। প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে। হাঁ ভালো কথা, আমি চাই না যে জ্যাগাররা দল ভেঙ্গে এখানে সেখানে যায়। জানোয়ারের মত হাউ মাউ করে ওদের ভাষায় কথা বলতে পারে এমন একজন খুঁজে পেতে বার করো।

—যে আজ্ঞে! ওরা বন্দী কুড়োচ্ছে। প্রায় শ' পাঁচেক ধরেছে।

—তা' হলেও দল ভেঙ্গে যাওয়া অন্যায়! আচ্ছা, ওখানে ওটা কার বাড়ী হে? রাস্তা থেকে শ' দুয়েক গজ দূরে জর্জিয়ান কায়দায় তৈরী মনোরম একটি ঢাকা বারান্দাওলা বাড়ী দেখিয়ে হাউ বল্লেন। বাড়ীটির সামনে সবুজ ঘাসের গালিচাপাতা উঠান। দুটি কালো রঙের ভৃত্য খড়খড়ি খুলে দিচ্ছে। স্পষ্টই বোঝা যায়, তোপদাগার সময় খড়খড়ি বন্ধ করে দেওয়া হ'য়েছিল। পাখা-হাতে তিনটি মহিলা ব'সে আছে বারান্দায়।

—ঠিক বলতে পারবো না স্যর! আমার মনে হয় জার্মানরা শত্রু তাড়া করতে গিয়ে র‍্যাংক্ ভেঙ্গেছে।

--এ অভ্যাস শৃংখলার পক্ষে ক্ষতিকর। আচ্ছা, ঐ বাড়ীতে গেলে খানাপিনা মিলবে ব'লতে পারো?

জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে হাতের ইঙ্গিতে পার্শ্বচরদের অনুসরণ করবার নির্দেশ দিয়ে জেনারেল বাড়ীটির দিকে রওনা হলেন। পদাতিকদের প্রতি অপেক্ষা করার আদেশ দেওয়া হ'ল। স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল তারা। জার্মানদের আচরণ সম্পর্কে নানাভাবে জবাবদিহি করতে করতে হালকা-পদাতিক দলের ফৌজদারটিও তাদের সঙ্গী হল। ফৌজদারের রঙচঙা মিছিলটি কদমে এগিয়ে চল্ল মহিলা তিনটির দিকে।

মহিলা তিনটি উঠে দাঁড়াল। শংকার চাইতে উত্তেজনাতেই তারা বেশী অস্থির হয়ে প'ড়েছিল। কিন্তু জেনারেল হাউ এমন কেতাদুরস্তভাবে টুপী তুলে হাসিমুখে তাদের অভিবাদন ক'রলেন যে মহিলা তিনটিও না হেসে পারল না। তিনজনেরই বয়স ত্রিশের নীচে। আমেরিকার উপনিবেশে জেনারেল হাউকে যা সব চাইতে অবাক ক'রেছে সেই ঢলঢল লাবণ্য এদের তিন জনেরই ছিল। একজন নীলনয়না, ফর্শা রঙ্, শণের মত চুল, এককথায় রূপসী। আর দুজনের রঙ ময়লাটে.. শোভনা তারা।

—বেয়াদপি যদি কিছু করে থাকি মাফ্ করবেন। —হাউ বল্লেন। —আমি এবং আমার লোকজন তেষ্টায় মরে যাচ্ছি। তাই, মরুপ্রান্তরে মরূদ্যানের মত এই শান্তির নীড় দেখে......

মহিলা তিনটি মুচ্‌কি হাসছিল। ঘোড়া থেকে নেমে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে হাউ আত্মপরিচয় দিলেনঃ আপনাদের অনুগত উইলিয়াম হাউ।

—ওঃ আপনি! চম্‌কে উঠল মহিলা তিনটি; সঙ্গে সঙ্গে লীলায়িত ভঙ্গিমায় 'হিজ এক্‌সেলেন্সী'কে প্রত্যাভিবাদন জানাল।

—মাফ্‌ করবেন, এদের পরিচয় করিয়ে দেবার সম্মান এই দীন সেবকেরই প্রাপ্য। হাউ বল্লেন এবং একে একে কর্নেল বেণ্টলি, কর্নেল জেমিশন্‌, মেজর ল্যাস্‌, ক্যাপ্টেন লোরিং, ক্যাপ্টেন এটারবি, লেফ্‌টন্যাণ্ট গ্রেস্টোন এবং লেফ্‌টন্যাণ্ট বার্টের পরিচয় করিয়ে দিলেন। যথাযোগ্য সম্মানে সবাই সম্বর্দ্ধিত হ'ল।

এমনি জমকাল উর্দির সমাবেশ মহিলা তিনটি কোন কালেই দেখেনি। এমন বিনীত ভব্য আচরণের অভিজ্ঞতাও কোনদিন হ'য়নি। অতঃপর তারা পরস্পরের পরিচয় করিয়ে দিলে,—শ্রীমতী মারে, শ্রীমতী ভ্যান ক্লিহার্ট্‌ এবং কুমারী পেনরোজ্‌। কুমারী পেনরোজই রূপসী। তার দিকে চেয়ে হাল্‌কা পদাতিক দলের ক্যাপ্টেনটির পর্যন্ত একান্তে ব'সে গল্পসল্প ক'রবার আগ্রহ হল। এই সাদর সম্ভাষণ ও সৌজন্য প্রকাশের পালা শেষ হ'তে না হ'তেই জেনারেল হাউ সবিনয়ে আবার তাঁর তৃষ্ণার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

—এই দ্যাখো! নিশ্চয় আপনি আমাদের কি জংলী ভাবছেন। শ্রীমতী মারে বলে উঠলেন। হাততালি দিয়ে একটি ভৃত্যকে ডেকে তিনি বরফ-দেওয়া পাঞ্চ এবং কিছু ক্লারেট নিয়ে আসবার হুকুম দিলেন। তার পর জেনারেল হাউ'র দিকে চেয়ে বল্লেনঃ জানি আপনি পোর্ট পছন্দ ক'রবেন, কিন্তু মাফ করবেন, এই দেশ-গাঁয়ে আজকাল পোর্ট পাওয়া বড়ই দুষ্কর।

--তাতে কি হয়েছে! ঐ ক্লারেটই অমৃতের সমান। হাউ বল্লেন।

--ভেতরে বেশ ঠাণ্ডা। যদি আমার কুটিরে ...

—আপনার কুটির আমাদের কাছে শান্তির আশ্রয়নীড়! শ্রীমতী মারের কথায় বাধা দিয়ে হাউ বল্লেন।

লাঞ্চ্‌ খাওয়ার পর যখন তাস খেলার টেবিল সাজান হচ্ছে, কাঠ-ফাটা-রোদে দাঁড়ান সৈনিকদের দিকে চেয়ে কুমারী পেনরোজ বেচারীদের দুরবস্থার জন্য দুঃখ প্রকাশ করল। এই দূর থেকে অন্তহীন বৃটিশ সৈন্য-শ্রেণীকে রৌদ্র-তপ্ত মাঠে ছড়ান একটা লাল ফিতার মত দেখাচ্ছে। একটি সৈনিকও লাইন

ভেঙে, স্থান ছেড়ে নড়েনি। মনে হয়, চিরকাল ওরা এমনিভাবেই দাঁড়িয়ে থাকবে।

গোঁফে চাড় দিয়ে কর্নেল জেমিশন জানালা দিয়ে উঁকি মেরে বল্লেনঃ না, না, ওতে কিছু হবে না, ডিয়ার! মনে রেখো সৈনিকবৃত্তি বনভোজনের পার্টি নয়। মোটেই না! কর্নেল জেমিশন এমনভাবে কুমারী পেনরোজকে আগলে ছিলেন যে ছোট-খাটো তরুণ ফৌজদাররা দূর থেকে আড়চোখে তাকান ছাড়া আর কোন সুবিধাই করে উঠতে পারছিল না।

—কিন্তু যুদ্ধের কি প্রয়োজন? আন্তরিকতাভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল পেনরোজ। —কামানের গুড়ুম গুড়ুম বুক-কাঁপানো আওয়াজে আজ সকাল থেকে চোখের দু'পাতা এক করতে পারিনি। তারপর সারা সকাল লোকজনের সে কি ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি! মিসেস্ মারে শেষ অবধি জানালা বন্ধ করে দিয়ে বল্লেন, চুপ করে বসে থাকা ছাড়া কিছুই করবার নেই, যদি ঘরশত্রুরা পুড়িয়ে না মারে তাহলেই বাঁচি!

—হ্যাঁ, মেয়েদের পক্ষে লড়াই [illegible]। কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে বল্লেন কর্নেল।

জেমস্ লড়াই করতে চেয়েছিল, কিন্তু মা তাকে ইংলণ্ড পাঠিয়ে দিলেন। বড় রাগী জেমস্। [illegible] পেনরোজ বলে। কিন্তু জেমস্ কে, কি তার পরিচয়, কিছুই বল্লে না।

মেয়েদের পক্ষে লড়াই নিশ্চয় [illegible]। আবার বল্লেন কর্নেল [illegible]।

তাস খেলার টেবিলে চার জন হচ্ছিল না, তাই শ্রীমতী মারে কর্নেল জেমিশনকে হুইস্টের টেবিলে আসতে আমন্ত্রণ জানালেন। একদল অফিসার হুইস্ট খেলতে ইতিমধ্যেই এসে গেছল। কুমারী পেনরোজ হুইস্ট খেলল না। সঙ্গে সঙ্গে ছোটখাটো ফৌজদাররা সকলেই সবিনয়ে জানাল যে, হুইস্ট খেলাটা তাদের তেমন আসে না।

চা পানের সময়ের পরেই হাউ বোতল তিনেক ক্লারেট সাবাড় করে দিলেন। মৌতাতের মাথায় তিনি ভগবানের নামে হলপ করে বলে বসলেন যে, এমন আরামের বৈকালিক মজলিসের সুযোগ তিনি জীবনে পাননি।

—কিন্তু জানেন তো, আমরা বিদ্রোহী? বাধা দিয়ে শ্রীমতী মারে বল্লেন।

—ওসব বাজে কথা ছেড়ে দিন মিসেস্ মারে?

—বিদ্রোহী? ফুঃ! বিদ্রোহী বলে কিছু নেই। কর্নেল বেন্টলি বলে উঠল।

বিদ্রোহীদের সম্পর্কে কথা উঠতেই শ্রীমতী ভ্যান ব্রিহাট জানাল যে, তার কর্তা ফিলাডেলফিয়ায় আছেন এবং এই নচ্ছার লোকগুলো। এর জনও নিউইয়র্কে থাকতে তিনি ফিরে আসবেন না। —সত্যি, লোকগুলো কি যে বিচ্ছিরি! —হেসে বল্লে সে। —আজ ভোরবেলা দুটোকে তো আপনি দেখেছেন। ঐ যে ধুলো-কাদা মাখা ভূতের মত লোক দুটো পালাতে এসেছিলো গাড়ী-রাখবার ঘরে!

—ও হ্যাঁ। তা জ্যাকশন্ একরকথায় বিদায় করে দিলে তাদের। শ্রীমতী মারে বুঝিয়ে বল্লে।

কুমারী পেনরোজ বল্লেঃ তা যে কোন রকম উর্দিও যদি থাকতো ওদের তাহলেও বুঝতাম! ওদের কংগ্রেস যখন সৈন্যদলই গড়তে গেলো, তখন তাদের উর্দি দেওয়া খুবই উচিত ছিল। মানে, যে কোন রকম একটা উর্দি! কি বলেন, তাই না!

রৌদ্রতপ্ত মাঠে দাড়ান লাল উর্দিয়ালা সৈন্যশ্রেণীর দিকে জানালা দিয়ে আড়চোখে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে কথাটা বল্লে পেনরোজ।

—উর্দির টাকা জুটবে কোত্থেকে? কোন ভালোলোক ওদের দলে যোগ দিয়েছে নাকি? হেসে বল্লে শ্রীমতী মারে।

কিন্তু আমি তো শুনেছি [illegible] পিংগার্ড এবং বীকম্যান গোষ্ঠী বিদ্রোহী দলে আছে।

হ্যাঁ, দু একজন আছে। খানদানী লোকদের সম্পত্তি [illegible] এক [illegible] নয়। তাদের মধ্যে দু চারজনের হয়তো নজর নেই কি [illegible] এই তো দেখুন, ল্যাংভেল্ট, রেনসেলার এবং হফম্যান গোষ্ঠীও গিয়ে [illegible] দলে ভিড়েছেন। কিন্তু মানসম্মান খুইয়ে চুনকালি মেখে [illegible] ফিরতে হবে, তখন বুঝবেন কি ভুল করেছেন।

ব্যারেটের চতুর্থ বোতল আরম্ভ করবার মুখে পানপাত্রটি তুলে ধরে হাউ বল্লেনঃ আসুন, যুদ্ধশান্তির কামনা করে পান করি।

—আপনি কি তাই মনে করেন নাকি?

—নিশ্চয়! বন্দী কুড়নো ছাড়া আর কি কাজ আছে?

—কি ঝামেলাই যে গেল!

—লড়াই জিনিসটা মেয়েরা মোটেই পছন্দ করে না। সায় দিয়ে বল্লে কর্নেল জেমিশন।

—জিনিসপত্তরের দামও যা বেড়েছে! শ্রীমতী মারে বল্লে।

ডিনারের সময় জেনারেল হাউ সবিনয়ে বাধা দিয়ে বল্লেনঃ না, না, থাক্ মিসেস্ মারে! রবাহূত আমরা। তবু যে আতিথেয়তা এবং সৌজন্য আপনি দেখিয়েছেন তা ভুলবার নয়।

—কিন্তু আপনারা এখানে আসায় আমরা যে কতো নিরাপদ মনে করেছি, তা হয়ত আপনি বুঝবেন না। কুমারী পেনরোজ বল্লে।

—যুদ্ধ-বিগ্রহ ছেলেখেলা নয়তো! বল্লেন জেনারেল হাউ। —তেমন আরামের কাজও নয়। কিন্তু কি করা যাবে? পুরুষের কর্তব্য তো!

—কিন্তু আপনি না বল্লেন যুদ্ধ বিগ্রহ আজ সকালেই খতম হয়ে গেছে!

—স্মরণ করিয়ে দিল শ্রীমতী মারে।

জ্যাকশন্ জেনারেলকে পঞ্চম বোতলটি এগিয়ে দিল।

বিকেল কেটে গেল। সন্ধ্যাও হল। মানহাট্টানের বন-প্রান্তর বাতাসের মর্মর-ধ্বনিতে মুখর হ'য়ে উঠল। মোমবাতি জ্বলে উঠল মারে-ভবনে। খোলা-দরজা দিয়ে পিরিচের ঠুন্‌ঠান্ আর প্রাণখোলা হাসির হুল্লোড় শোনা যেতে লাগল।

ততক্ষণে পলায়নপর আমেরিকান ফৌজের শেষ সৈনিকটি পর্যন্ত হার্লেম ব্যূহের পশ্চাতে পেঁাছে গেল।

শিকার-সঙ্গীত

কনুই দিয়ে মিফ্লিনকে ঠেলা মেরে বৃদ্ধ পুটনাম বল্লেনঃ ওর সঙ্গে কথা বলুন।

—কি বল্‌বো?

—যা' হয় বলুন।

—কি? কি ব'লবো বলুন?

—আমি জানি না। যা'হয় একটা বলুন। দেখ্‌ছেন না যে, কারও ওর সঙ্গে কথা বলা দরকার?

—তা বুঝলাম! কিন্তু কি বলি?

—যা খুশী বলুন। আর কিছু না হয় অন্তত বৃষ্টি থেকে আস্‌তে বলুন না!

—ব্যস্? তা আপনিই বলুন না কেন?

—না, না, আমি ওর সঙ্গে কথা বল্‌তে পারবো না। সসৈন্যে পলায়নের কথা মনে করে পুটনাম বল্লেন।

সেপ্টেম্বর মাসের অসহ্য গুমোট দিনের শেষে, অন্ধকার হ'তে না হতেই ধারায় বৃষ্টি নামল। তীব্র তীক্ষ্ন বিরামহীন জলধারায় গা কন্‌কন্ ক'রছে। কিন্তু এ বৃষ্টিতে পাওয়া গেল ফুরসৎ—পালাবার অবসর।

আমেরিকানদের কামান তারা ছেড়ে-ফেলে পালিয়ে এসেছে; কিন্তু প্রবল বর্ষণে বৃটিশ কামানের গোলা তেড়ে আস্‌বার ভয়ও রইল না। পরাভূত ইয়াংকিরা হার্লেমের আমেরিকান ব্যূহের পশ্চাতে আশ্রয় নেবার অবসর পেল। একটি তাঁবু নেই, গা ঢাকবার মত পোশাক পর্যন্ত ছিল না। প্রবল বর্ষণের মধ্যে যে যেখানে পারে জড়সড় হ'য়ে শীতে ঠক্‌ঠক করে কাঁপতে লাগল।

মিফলিনের বিগ্রেড ক'টি, মাসাচুসেটসের লোকজন, মার্বলহেডের জেলেরা, বোস্টনের গণসেনা আর মিড্‌লসেক্‌সের চাষীরা মিলে এই আমেরিকান ব্যূহটি তখনও দৃঢ়ভাবে আগলে ছিল। বৃটিশ আর হেসিয়ানরা মানহাট্টান দ্বীপের

অত উত্তরে তখনও ঠেলে এগোয়নি বলেই হয়ত ব্যূহটি অটুট আছে। এলে কি হ'ত বলা যায় না।

ম্যানহাট্টানের উত্তরাংশে গভীর অথচ সংকীর্ণ একটি উপত্যকার উত্তরপাড়ে পরিখা কেটে রচনা করা হয়েছে এই ব্যূহ। দ্বীপটির দক্ষিণপ্রান্ত থেকে দুই-তৃতীয়াংশ স্থান বাদ দিয়ে হাডসন নদীর পাড়ে, ক্লারেমণ্টে, সব চাইতে সংকীর্ণ ও গভীর এই উপত্যকাটি ক্রমে প্রশস্ততর হ'য়ে ইস্ট নদীর দিকে চলে গেছে। গোটা দ্বীপটি কাটা পড়েছে আড়াআড়িভাবে। তৎকালে উপত্যকাটির নাম ছিল হলোওয়ে। ব্যূহ-রচনার পক্ষে চমৎকার। ইংরেজ সেনা যদি উপত্যকার ঢালুপথ বেয়ে তলদেশে নেমে আবার উপরে উঠবার চেষ্টা করে তাহ'লে এই পরাভূত বাহিনীও তাদের আক্রমণ করে ঘায়েল করতে পারে। পনেরোই সেপ্টেম্বর সারা বিকাল, এমনকি সন্ধ্যার পরেও, কনেক্‌টিকাট্‌, নিউ জার্সি এবং পেন্‌সিল্‌ভানিয়ার গণসেনা দলে দলে টল্‌তে টল্‌তে হলোওয়ে পার হ'য়ে মাসাচুসেট্‌স বাহিনীর পরিখার পেছনে নিরাপদ আশ্রয় পেল। পরাভূত বিগতমনোবল এই সৈনিকেরা নীরবে নয়া-ইংলণ্ডের সৈনিকদের বিদ্রূপ টিট্‌কিরি হজম করল। দুই সপ্তাহ পূর্বে ব্রুকলিন পাহাড়ে যে সাহসের পরিচয় নয়া-ইংলণ্ডের সৈনিকেরা দিয়েছিল, বেমালুম তার কথা বিস্মৃত হ'য়ে সাহসের বড়াই ক'রবার কোন বাধাই তাদের ছিল না। কেন না আক্রান্ত বা বেষ্টিত হবার বিপদের সামনে আজ তাদের পড়তে হয়নি।

শেলবের পাল্‌টা-জবাব দেবার মত মনের অবস্থা মধ্যদেশীয়দের ছিল না। অসাড়ভাবে মাটিতে শুয়ে ওরা ফৌজদারদের সৈন্য জড়ো করে আবার বিগ্রেড্‌ গড়ে তুলবার চেষ্টা লক্ষ্য করতে লাগল। প্রবল ধারায় বৃষ্টি নেমে যখন ঝনকনানি শুরু হ'ল তখনও কেউ নড়ল না।

ছত্রভংগ বিপর্যস্ত সৈন্যদলের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাবার বেলা ভার্জিনিয়ান ডাইনে বাঁয়ে তাকালেন না। তিনি পাশ দিয়ে চলে যাবার পর সৈনিকেরা মাথা নেড়ে অভিবাদন করল; পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল—কেউ তার চোখ দেখেছে কিনা। কনেক্‌টিকাটের লোকজন তাঁর সকালবেলার ক্রিয়া-কলাপের গল্প শুনিয়ে আর সবাইর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রল। উন্মাদের মত হন্যে হ'য়ে ছুটাছুটি করে কেমন করে তিনি তরবারি দিয়ে তাদের বেপরোয়া মেরেছিলেন, সবিস্তারে তার পল্লবিত কাহিনী শোনালে কনেক্‌টিকাটের সৈনিকেরা।

—এক কোপে জোন্‌সের ঘিলু বার করে দিলেন। একজন বলে উঠল।

আর একজন কানের পেছনে একটা কাটাদাগ দেখিয়ে বল্লেঃ এই দ্যাখো না আমার কানের অবস্থা। জোর মেরেছিলেন।

—গুলিয়ে ফেলেছিলেন। দেখে শুনে সব গুলিয়ে ফেলেছিলেন। চোখের ভাব লক্ষ্য করেছিলে? অপর একজন বল্লে।

ঘোড়ার পিঠে বসে প্রধান সেনাপতি কিভাবে বৃটিশদের গুলীতে প্রাণ দেবার জন্যে অপেক্ষা করেছিলেন, তার কাহিনী শোনাল হার্টফোর্ডের একটি ছেলে।

নয়, পুটনাম, মিফ্লিন এবং নোলটন্ একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে প্রবল বর্ষণের মধ্যে ভার্জিনিয়ানের বিরামহীন পায়চারি লক্ষ্য ক'রছিল। রাতদুপুর হয়ে গেল তবু তিনি একভাবে পায়চারি করছেন। একই পথে একই ভাবে একটানা পায়চারি চল্‌ছে প্রায় পুরো চার ঘণ্টা। কয়েক পা' এগিয়ে যাচ্ছেন, আবার ফিরছেন, আবার এগিয়ে যাচ্ছেন, ফের ফিরছেন। বুটের চাপে ভিজা মাটি প্যাচ্‌পেচে কাদায় পরিণত হ'ল। কোট ভিজে চুপ্‌সে গেছে, টুপীর একটা পালক ঝুলে পড়েছে কানের উপর! তা থেকে ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছে কাঁধে। হাত দু'খানি অসাড়ভাবে ঝুলান রয়েছে দু'পাশে; মাঝে মাঝে এক একবার শুধু বড় বড় হাতের পাতা মুঠ করছেন, আবার খুলছেন।

এ দৃশ্য নক্সের অসহ্য। পুটনামের কথায় সায় দিয়ে সেও মিফ্লিনকে অনুরোধ জানাল কথা ব'লবার জন্য। পুটনামও সংগে সংগে করুণ মিনতির সুরে বল্লেঃ ওকে বৃষ্টি থেকে আস্‌তে বলুন।

--বেশ, যাচ্ছি! মিফ্লিন সম্মত হল। প্রধান সেনাপতির কাছে এগিয়ে গিয়ে ডাকলঃ স্যর! স্যর!

লম্বা লোকটি থেমে একবার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মিফ্লিনের দিকে তাকিয়ে ফের পায়চারি শুরু করলেন।

—স্যার! বৃষ্টিতে আর থাকবেন না স্যর! চলে আসুন।

—কি ব'ল্লে?

—ব'ল্লাম, বৃষ্টিতে আর থাকবেন না স্যর! আমাদের অনুরোধ! ভিজে একসা' হয়ে গেছেন।

—ভিজে গেছি? তুমি কি বল্‌তে চাও ব'লোতো মিফ্লিন?

--আপনি ভিজে গেছেন স্যর! টাপটুপ ভিজে গেছেন। ভয়ানক ঠাণ্ডা লাগতে পারে।

—যাও নিজের কাজ দেখোগে' মিফলিন! শান্তভাবে বল্লেন ভার্জিনিয়ান।

—দোহাই স্যর! যা খুশী আমাকে ব'লতে পারেন, কিন্তু এখানে থেকে অসুখ ডেকে এনে কোন লাভই হবে না।

—ধন্যবাদ মিফ্লিন। যে চুলোয় খুশী যাও। বিরক্ত ক'রবে না।

—জেনারেল ওয়াশিংটন! মিনতির সুরে ডাকল নক্স। তার একটু পেছনেই পুটনাম দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওয়াশিংটন থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেনঃ এসব কি মশাই? আপনাদের কি কোন কাজ নেই, কোন বিগ্রেড্......?

—জেনারেল ওয়াশিংটন! দয়া করে বৃষ্টি থেকে চলে আসুন। বলতে গিয়ে নক্সের গলা ধরে গেল। সে মুখ ফিরিয়ে সরে গেল। আর সবাই নিরুপায়ের মত লম্বা লোকটিকে ঘিরে রইল।

শান্তভাবে শিয়াল-শিকারী তখন বল্লেনঃ সবাই আমার সদর ঘাঁটিতে চলুন। কারও পোশাকই তো শুকনো নেই। তাই না?

নক্স ও মিফলিন তাঁকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। ফ্লিপ্ তৈরী ক'রবার জন্য বিলি লোহার শলা তাতাচ্ছিল বাইরে; এরাই তাঁকে পোশাক ছাড়তে সাহায্য করল। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে প্রধান সেনাপতির। এরা দু'জনে ধরাধরি করে যখন তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে কম্বল দিয়ে গা ঢাকা দিল, কোন আপত্তিই তিনি ক'রলেন না। ফ্লিপ খাবার সময় নক্স তাঁর মাথা উঁচু করে ধরে রাখল। একটু পরেই শিশুর মত অঘোরে ঘুমিয়ে প'ড়লেন প্রধান সেনাপতি।

নক্স ও মিফলিন এক সঙ্গে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিলি জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকাল। উভয়েই মাথা নেড়ে জানাল—ঘুমোচ্ছেন। বিলির মূক প্রশ্নের জবাবে তাদের ভদ্র সৌজন্যপূর্ণ জবাব শুনে মনে হ'ল, কালো আদমীটি বুঝি পিতৃস্থানীয়, এ সংবাদ জানবার অধিকার তার আছে।

অসুস্থ হ'য়ে পড়েননি তো? বিলি জিজ্ঞাসা ক'রল।

নাঃ। মাথা নেড়ে জবাব দিলে মিফ্লিন। —অসুস্থ বলে মনে তো হল না।

এর বেশী কি বলা যায় মিফলিন ঠাহর ক'রে উঠতে পারল না। ওই দীর্ঘ ক্লান্ত দেহে যা হয়েছে, তা' বুঝিয়ে ব'লবার মত ভাষা নেই। নক্স কোন কথা ব'লতেই ভরসা পেল না। আগুনের পাশে ব'সে একদৃষ্টে সে আঁকাবাঁকা অগ্নিশিখার দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু ঐ লেলিহান শিখার মধ্যে সে কোন

সান্ত্বনা বা আশার আলোক খুঁজে পেল না। তার স্বপ্ন ভেঙে গেছে। যা সে হারাল কোনদিনই তার স্থান পূরণ হবার নয়। ভার্জিনিয়ার খানদানী লোক শিয়াল-শিকারী। বড়জোর তাঁর মান-সম্মান ডুবেছে। কিন্তু নক্স হারিয়েছে মানের চাইতে অনেককিছু বেশী। সে হারিয়েছে শান্তিময় গৃহ, হারিয়েছে গোলগাল আনন্দদায়িনী গৃহলক্ষ্মী...তার সঙ্গে গেছে বহু বই... বহু আশা আর একটা জাতি...একটা সাধারণতন্ত্র। সমস্ত কল্পনা চুরমার হ'য়ে গেছে। যে আদর্শের উদাত্ত আহবান প্রতিনিয়ত তার কানে বেজেছে, যার ডাকে তার দুর্ভাগা অবজ্ঞাত জন্মভূমির জন্য সে যথাসর্বস্ব, এমনকি জীবন পর্যন্ত সম্বল করেছে, আজ তাও ডুবে গেল।

-ফ্লিপ দেবো কর্তা? আগুনের মধ্য থেকে আর একটা তাতান লোহার শলা বার করে ফ্লিপ তৈরী করতে করতে বিলি বল্লে। পোড়া চিনির মধুগন্ধে ঘর ভরে গেল।

—খাবে? মিফলিন জিজ্ঞাসা করল নক্সকে।

অতঃপর আগুনের চুল্লীর উভয় পার্শ্বে বসে দু'জনে মগের পর মগ ভগ্‌বগে রাম্ গিল্‌তে লাগল। কেউ মুখে রা' শব্দটি করল না।

বারান্দায় যখন এল, তখন দু'জনেরই বেশ মৌতাত হ'য়েছে। একটু পরে নেশায় চুর হয়ে দু'জনেরই বাহ্যজ্ঞান লোপ পেল। মদ্যপানের কোন আনন্দের অনুভূতিই তাদের ছিল না। হৈ হুল্লোড়, হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজব কিম্বা বদ-রসিকতা করবার শক্তি হারিয়ে ভূতের মত তারা হাত ধরাধরি করে মরিশ-ভবনের প্রশস্ত বারান্দায় পা টিপে টিপে হাটতে লাগল। ঝাপ্‌সা চোখে মিফলিনের কাধের ওপর দিয়ে বারান্দার বাহারের দিকে চেয়ে টোরী বাড়ীয়ালার কথা মনে পড়ল; অমনিই ফস্ করে নক্সের মুখ দিয়ে একটা কুৎসিত খিস্তি বেরিয়ে গেল। মাথা ঝাঁকানি দিয়ে মিফলিনও সে গালাগাল সমর্থন ক'রল।

ভোর হবার খানিকটা আগে প্রধান সেনাপতি উঠে পড়লেন। এই সময়ে ওঠাই তাঁর অভ্যাস। সামান্য যে কয়েক ঘণ্টা ঘুম হয়েছে, তাতেই বিশ্রামের কাজ হয়েছে। চুপে-সাড়ে চট্‌পট্ জামা-পোশাক পরে প্রাতরাশের টেবিলে বসে প্যান্‌কেক্ ও মধু খেতে খেতে তিনি এড্‌জুটান্ট-জেনারেল রীডের বিবরণী শুনলেন। বৃটিশদের মতলব জানবার জন্য টহলদার পাঠিয়ে সে একগাদা খবর সংগ্রহ করেছে। বছর পঁয়ত্রিশ বয়সের লিক্‌লিকে চেহারার এই যুবকটির হাবভাবের মধ্যে কেমন যেন একটা মেয়েলী ভীরুতা ছিল।

পাথরে খোদাই মূর্তির মত রীডের দেহের গড়ন এবং তার বড় বড় বেগুনী চোখদুটি এই মেয়েলী ভাবটা আরও পরিস্ফুট করে তুলেছে। আর সবাই যখন কষ্টভোগ করত, ইচ্ছে করে রীড্ পেছনে সরে থাক্‌ত। মনে হত, নিজের আঘাত সইবার ক্ষমতা পরখ করতে তার শংকা হয়। অনেকসময় ভার্জি-নিয়ানের মনে হয়েছে যে রীড্ তাকে সমীহ করে।

তাই আগের দিন, কিছুই করবার নেই বুঝে, রীড্ হাত-পা গুটিয়ে চুপ করে বসে রয়েছে। কিছুই করেনি। অর্ধনিমীলিত চোখে শুধু চারিদিকের ধ্বংসের ছবি দেখেছে, আর নিজের পুরু গোল ঠোঁট কামড়েছে। কিন্তু তার পরদিন প্রত্যূষে যখন আর সবাই আগের দিনের কাণ্ডকারখানায় ভ্যাবাচাকা খেয়ে ভূতের মত চুপ করে ব'সেছিল, রীড্ তখন বিশ্বাসী জনকয়েক লোক বেছে বৃটিশদের অবস্থান ও অভিসন্ধি জানবার জন্য পাঠিয়ে দেয়। খুঁজে পেতে যাদের পেল, তাদের মধ্য থেকে বাছাই করেই তাকে পাঠাতে হল।

টমাস্ নোলটন নামে একজন ইয়াংকি এই টহলদার দলের নেতৃত্ব করে। ব্রুকলিন পাহাড়ে ইয়াংকিদের আচরণ দেখেও টমাস মেনে নিতে পারেনি যে সমস্ত ইয়াংকিই কাপুরুষ। সেখানে সে একটি কনেক্‌টিকাট্ সৈন্যদলের সঙ্গে ছিল। সে নিজে পালায়নি। টমাস অবাক হয়ে গেল যে, তার দৃষ্টান্ত দেখে আরও কিছু লোক না পালিয়ে তার সঙ্গে যোগ দিল। এদের মধ্যে নাথান হেল নামে কভেণ্ট্রির একটি শিক্ষককে সে জিজ্ঞাসা করছিল যে, কেন সে ইংরেজদের গোলাবৃষ্টির মুখেও না পালিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। জবাবে শিক্ষকটি প্রথমে বল্লেঃ পালাবার জায়গা ছিল না বলেই ছিলাম! তারপর একটু ভেবে আবার বল্লেঃ বিপ্লবের মানে এরা বোঝে না। বিপ্লব তো ছেলেখেলা নয়! হয় এ-ই শুরু, না হয় এইখানেই শেষ!

নোলটন এই জবাবে খুশী হ'তে পারেনি। অর্থহীন মনে হয়েছে। পেশাদার সৈনিক সে, বিপ্লবী নয়। নিজে ইয়াংকি বলেই সে ইয়াংকিদের দলে যোগ দিয়েছে। দাড়িগোঁফ কামাবার বয়েস হবার পর নিজেই নিজের প্রভু হবার একটা প্রবল আকাঙ্খা তার মধ্যে জেগে ওঠে। সর্বস্বহারা এক বৃদ্ধ চাষীকে পেটের ধাঁধায় অন্যের কাজ করতে দেখে তার চোখ ফেটে জল এসেছিল। সাবালক হয়ে ঐ একদিনই সে চোখের জল ফেলেছে। আর সেই জন্যই আজ সে বিদ্রোহীর দলে। আজাদী সম্পর্কে নোলটনের ধারণা কোন যুক্তিতর্কের ধার ধারত না। খাঁচায় ধরা পড়লে খেঁকশিয়ালী যেমন নিজের বাচ্চা-কাচ্চার কাছে ফিরে যাবার আগ্রহে, কিম্বা মৃত্যুবরণের জন্য নিজের পা

কামড়ে ছিঁড়ে ফেলে, নোল্‌টনের মানসিক প্রতিক্রিয়াও অনেকটা সেই ধাঁচের। একটা সহজ কথা বার বার তার মনে হয়েছে যে, কামানের শব্দ শুনলেই পালাবে না এমন একদল লোক যদি সে জড়ো করতে পারে, তাহ'লে একটা কাজের মত কাজ হবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্পেন্সার সে অনুমতি তাকে দিল। নোল্‌টন তখন একুশ বছরের হেল, সতেরো বছরের মর্টন এবং উনিশ বছরের লেককে ক্যাপ্টেন করে তার ছোট্ট টহলদার দলটি গড়ে তুলল। এই দলের মধ্যে কারও বয়স ত্রিশের বেশী নয়। অধিকাংশই বিশের কম। কিন্তু এই নাবালকদেরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল—যে কোন অজ্ঞাত কারণেই হোক্‌, ব্রুক-লিনে তাদের কেউ পালায়নি।

এই টহলদার দলটিকেই রীড্‌ পাঠাল বৃটিশদের মতলব জানবার জন্য। কমাণ্ডারের প্রাতরাশের টেবিলে তাঁর মুখোমুখি ব'সে এখন সে তার উদ্দেশ্যের কথা জানাচ্ছিল।

রীড্‌ ব'ল্লেঃ বুঝতে পারছেন না স্যার, লাল-উর্দিয়ালাদের ধারণা, আমরা হেরে গেছি। মাফ্‌ করবেন স্যর! আমার দৃঢ়বিশ্বাস, তারা ধরে নিয়েছে যে আমরা হেরে গেছি।

ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে বড় আদমী তাকালেন তার এড্‌জুটাণ্টের দিকে। বল্লেনঃ আমায় সে কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না মিঃ রীড্‌!

—সেইটেই তো আমাদের সুবিধে স্যর! ওরা ধরে নিয়েছে, আমরা হেরে গেছি। কিন্তু এখন যদি আমবা আঘাত হানি, তাহলে ওরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে।

বড় আদমী মাথা নাড়লেন, সায় দিলেন না। তাঁর না-বলা কথার জবাবে চড়া গলায় রীড্‌ বল্লেঃ কালকে যা হয়েছে হয়েছে। কালকের কথা ভেবে আজ কি লাভ?

—সে কথা স্মরণ থাকলে ভালোই হবে। ভার্জিনিয়ান বল্লেন।

—কিন্তু আমরা এখনও লড়াই ক'রতে পারি।

—না মিঃ রীড্‌, পারি না। লড়াই তো দূরের কথা, ভালোভাবে পালাবার ক্ষমতা পর্যন্ত আমাদের নেই।

হাত দুটো প্রসারিত করে এড্‌জুটাণ্ট পরাভব স্বীকার করলঃ মাফ করুন স্যব! আমারই ভুল হয়েছে। আমি স্বীকার করছি। কিন্তু আমাদের টহলদার দলটি সম্পর্কে কি বলেন?

—তারা ফিবে আসবে। ছাড়াছাড়াভাবে বল্লেন বড় আদমী।—পাদুটো আছে তো! প্রয়োজন হলে পালাতে পারবে! তারা ফিরে আসবে!

মরিশ-ভবন থেকে ঘোড়ায় চড়ে তাঁরা হলোওয়ে পর্যন্ত এলেন। সেখানে মিফলিনের সঙ্গে দেখা হল। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মিফলিন তাকাল রীডের দিকে। ভার্জিনিয়ানের সামান্য পেছনে থেকে রীড্ মাথা নেড়ে হাতের ইশারায় নৈরাশ্যের ইংগিত করল।

বড় আদমীর কাছে আজিকার অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে, জেগে আছে শুধু স্মৃতি। যন্ত্রের মত তিনি হাঁটাচলা কাজকর্ম করছেন। করতে হয়, তাই করছেন। এই অর্থহীন পরাজয়ের বিভীষিকা তাঁর সমস্ত সত্তা আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাঁর দীর্ঘ জীবনের ইতিহাস কুঁকড়ে যেন এতটুকু হয়ে গেছে। বিশ বছর আগেকার কাহিনী মনে হচ্ছে কালকের কথার মত। বর্তমান মনে হচ্ছে দীর্ঘ বুক-ভাঙ্গা যতির মত। ভবিষ্যৎ যেন জীবন থেকে মুছে গেছে। জটপাকান পাঁচমিশালী স্মৃতির ভাণ্ডারে ভালমন্দ নানাধরণের কথাই স্পষ্ট হয়ে উঠল। মনে পড়ল, রুগ্ন মুমূর্ষু শিকারী কুকুরটির কথা। মৃত্যুন্মুখী কুকুরটির অপার মমতামাখান করুণ চাহনি দুঃখে বেদনায় তাঁকে অভিভূত করেছিল; আবার তাঁর স্ত্রীর সন্তান, তাঁর নিজেরও দুলালী মেয়ে পাত্সিব মৃত্যু যেদিন বেচারীর রোগ-যন্ত্রণার অবসান করে দিল, সেদিনও তিনি শোকে অভিভূত হয়েছিলেন। কিন্তু এ দু'য়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য কোথায়? দুঃখের সবটাই খারাপ নয়; ভালবাসার সঙ্গে হয়ত তার জ্ঞাতিত্ব রয়েছে। মনে প'ড়ল, একদিন এক প্রতিবেশীর বাড়ী গেছলেন তিনি। ষোলটি সন্তান প্রতিবেশীর। ষোলটি হাসিখুসি সুন্দর স্বাস্থ্যবান শিশু। সন্তান ক'টি তাঁকে ঘিরে হৈ-হুল্লোর জুড়ে দিল। নিজে নিঃসন্তান তিনি। সন্তান সন্ততির এই আনন্দ কলরোল, বেদনা ও স্নেহের মিশ্রণে তাঁর মধ্যে এক অদ্ভুত মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করল। সহ্য করতে পারলেন না। বাইরের ঘরে খিল আট্‌কে দুহাতে মাথা চেপে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। সন্তানের দুঃখে নয়। এমনি ষোলটি সন্তানের জনক তিনি কোনকালেই হতে পারবেন না, সে দুঃখেও নয়! তাঁর মনে প'ড়ল, অনামী শিকারী কুকুরটির করুণ চাহনি, আধ-পাগলা সং-মেয়েটির কথা।

কিন্তু গতকাল এবং হপ্তা তিনেক পূর্বে যা ঘটেছে তার মধ্যে ভয় বা দুঃখের কিছু ছিল না, ছিল অন্তহীন নিরাশা। এই গভীর নৈরাশ্য তাঁর দেমাক ভেঙে চুরে দিয়ে গেছে।

চুপ করে ব'সে থাকার চাইতে বরং চলাফেরা করা ভাল। তাই ঘোড়ায় চড়ে তিনি সম্মুখ ব্যূহের মধ্য দিয়ে, নোংরা নয়া-ইংলণ্ডের সৈন্যদল ও মধ্য-

দেশীয়দের মধ্যদিয়ে এবং শেষ অবধি হলোওয়ের তলদেশে ঘোরাফেরা করতে লাগলেন। একলা থাকলে পাছে প্রধান সেনাপতি বৃটিশ ব্যূহের দিকে চলে যান, এই শংকায় রীড্ ও মিফলিন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রইল। গত রাত্রির মুষলধারে বৃষ্টির পর ভোরের আকাশ ধুয়ে-মুছে পরিচ্ছন্ন হ'য়ে গেছে। পাখীর কলরব, মোরগের ডাক ও কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দে মুখর হয়ে উঠেছে আজিকার আনন্দোজ্জ্বল শিরশিরে প্রভাত। হাডসন নদী বরাবর হু হু করে হাওয়া এসে উপত্যকায় পাক খাচ্ছে, ঝুঁটি ধরে নুইয়ে দিচ্ছে গাছের মাথা, ঝরে পড়ছে শুক্‌নো পাতা।

ঢালু পথ বেয়ে মর্নিংসাইড পাহাড়ে উঠবার সময় কমপক্ষে মাইলখানেক দূরে তাঁরা যুগপৎ গুলীর আওয়াজ শুনতে পেলেন। বড় আদমী ঘোড়া থামালেন, কিন্তু বন্দুকের আওয়াজ সম্পর্কে কোন আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। রীড্ কিন্তু ছুটে এসে বল্লেঃ ঐ নোলটনের টহলদার দল স্যর! যাক্, বৃটিশের দেখা তাহ'লে পেয়েছে। এখন মজা দেখিয়ে দিতে পারবে।

বড় আদমী নড়লেন না। একদিন যে আওয়াজ শুনে তিনি চাঙ্গা হয়ে উঠতেন, আজ সেই আওয়াজ শুনে কোন চাঞ্চল্য, কোন আগ্রহই অনুভব করলেন না। বৃটিশদের ফাঁদে আটকান সম্পর্কে রীডের প্রস্তাব এবং নোল্‌-টনের টহলদার দলের শক্তিবৃদ্ধির জন্য তার ওকালতি কানে শুনলেন। ব্যস্ ঐ পর্যন্ত। ওদিকে ক্রমাগত বন্দুকের আওয়াজ হচ্ছে, আর এদিকে রীড্ বকর্ বকর্ ক'রে চলেছে। অবশেষে নিজেই সে চুপ করল। মিফলিনের গম্ভীর মুখের দিকে তাকাল সমর্থনের আশায়। তারপর দুজনেই চুপ করে ব'সে রইল ঘোড়ার পিঠে।

বন্দুকের আওয়াজ থেমে গেলে রীড্ আবার বল্লেঃ এখুনি ওরা ফিরে আসবে। আমি ঠিক বল্‌তে পারি স্যর, ওরা বেশ এক পক্কর লড়েছে। অস্বীকার ক'রবার জো নেই স্যর। গোলাগুলীর শব্দের মধ্যেও ওদের বন্দুকের আওয়াজ বেশ বোঝা যাচ্ছিল।

তবু ভার্জিনিয়ান টুঁ শব্দ করলেন না।

নোলটনের দলের জনাকয়েক ঝোঁপজঙ্গলের মধ্য থেকে বেরুল। তারা হন্তদন্ত হয়ে ছুট্‌ছে না। বন্দুক হাতে করে দৃঢ়পদক্ষেপে পিছু হটে আসছে। ত্রাস, বিশৃঙ্খলা বা তাড়াহুড়ার কোন লক্ষণই নেই এদের মধ্যে। আহতদের জনকয়েক সংগীদের কাঁধে ভর করে খুঁড়িয়ে আসছে, আর কয়েক-জনকে ব'য়ে নিয়ে আসা হচ্ছে। অবশেষে বিশাল-দেহ, ভল্লুকের মত নোল-

'টন নিজে বেরুল হাসতে হাসতে। প্রধান সেনপাতিকে না দেখা পর্যন্ত হাতের ইশারায় সে রীড্‌কে অভিবাদন জানাল। অতঃপর টহলদার দলটি একসঙ্গে জড়ো হয়ে ছুটে এল জেনারেলত্রয়ের কাছে।

আশ্রয় ছেড়ে শিয়াল পালাচ্ছে দেখে শিকারীরা যেমন চীৎকার ক'রে ওঠে, সেই মুহূর্তে পাহাড়ের চূড়া থেকে তেমনি একটা চীৎকার শোনা গেল।

এই চীৎকার মর্মান্তিক আঘাত হানল। ভার্জিনিয়ার শিয়াল-শিকারীর অন্তরের অন্তঃস্থল বিদ্ধ হল। তিনি বুঝলেন যে, তাঁকে লক্ষ্য করেই মহোল্লাসে গোটাকয়েক রণভেরীতে বাজছেঃ

আমরা শিকারে যাবো,
আমরা শিকারে যাবো,
শিয়াল ধরে মোরা খাঁচায় পুরবো,
তারপর আবার তাকে ছেড়ে দেবো।

বন-জঙ্গলের পর্দার ওধারে মর্ণিংসাইড পাহাড়ের মাঠে-প্রান্তরে কি ঘটছে তা দেখবার কোন প্রয়োজনই ছিল না শিয়াল-শিকারীর। একদল ফোতো-বাবু সখের শিকারে বেরিয়েছে। লঘুপরিহাসে উচ্ছল এই ভদ্রলোক-শিকারীরা স্থির লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সুনির্দিষ্টভাবে। তাদের লক্ষ্য বন-কান্তার-ঘেরা দেশ-গাঁয়ের এক শিয়াল-শিকারী। তাঁর অপরাধ, নিজেকে তিনি ভদ্রলোক মনে ক'রবার দুঃসাহস ক'রেছেন।

সৈন্যদলের আর কেউ একথা বুঝতে না পারে, কিন্তু তাঁর কাছে একথা সুস্পষ্ট। একজন সাধারণ মানুষের অস্তিত্ব অস্বীকার ক'রে ফোতোবাবুরা কেমন করে তার সর্বনাশ ক'রে দেয়, তা তিনি জানেন। তিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁর বিপ্লব-প্রচেষ্টাকে শিয়াল-শিকারে পরিণত করে তারা এই বিপ্লবকে প্রহসনে পরিণত করেছে, খেলোয়াড়ী কায়দায় তাকে খতম করে দিচ্ছে। মানসপটে এদের ছবি তিনি অনায়াসেই আঁকতে পারেনঃ মনোরম প্রভাতে কদমে এগিয়ে আসছে শিকারীর দল, পেছনে তাদের অশ্বারোহী সৈনিক। চলতে চলতে বিদ্রূপের মুচকি হাসি হেসে হাতের ইশারায় তূর্য বাদকদের ইংগিত করছে জোরসে এই গান বাজাবার। তারা জানে, তিনি যেখানে যেমনভাবে থাকুন না কেন, এ গান তাঁর কানে নিশ্চয়ই পৌঁছুবে। আর গানের তালে তালে বাবু-শিকারীরা 'ওইক্‌!' 'ওইক্‌!' শব্দ করে ছুটছে।

ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে খপ্ করে তিনি নোল্টনের জ্যাকেট টেনে ধরলেন। চম্‌কে উঠল নোল্টন।

—সত্যি কথা বল ইয়াংকি জানোয়ার! ভয় পেয়েছিস্? গর্জে উঠলেন ভার্জিনিয়ার ভদ্দরলোক।

—হলপ করে বলতে পারি স্যর, না!

—আমাকে কিম্বা ওদের, কারুক্কেই ভয় করিস্ না?

—এই দুনিয়ার কোন কিছুই আমি ডরাই না স্যর! শান্তভাবে জবাব দিলে নোল্টন।

—তাহ'লে বল, একদল সৈন্য নিয়ে এখান থেকে বাঁয়ে উপত্যকা দিয়ে এগিয়ে পাহাড়ের পূব গা বেয়ে ওই শিয়াল-শিকারীদের ঘিরে ফেল্‌তে পারবি? বল পারবি?

—চেষ্টা ক'রে দেখ্‌বো! হেসে বল্লে নোল্টন।

—তাহ'লে ক'রে দ্যাখ্! রীড্, এর সঙ্গে যাও। সঙ্গে একটা রেজি-মেণ্ট নাও। না না, ইয়াংকি রেজিমেণ্ট নেবে না। উইডনের ভার্জিনিয়ান রেজিমেণ্টটি নাও। মেজর লীচকেও সঙ্গে নিও। খেয়াল থাকে যেন, ওদের পেছনে শিয়াল-শিকারের ফাঁদ আমি চাই না, চাই ভালুক-ধরা ফাঁদ!

রীড্ আর আদেশ শুনবার জন্য অপেক্ষা করল না, ঘোড়া ছুটিয়ে ভার্জিনিয়ান রেজিমেণ্টটির খোঁজে গেল। নোল্টন আবার তার আহত সঙ্গীদের জড়ো ক'রল। এদিকে বৃটিশের শিকার-সঙ্গীত বেঁকে হাডসন নদীর দিকে ঘুরে গেল।

মিফলিনের দিকে ফিরে আঙুল দিয়ে নদীর কাছাকাছি পাহাড়িয়া পথটি দেখিয়ে শিয়াল-শিকারী বল্লেনঃ ওই খোলা পথে মুখোমুখি আক্রমণ করতে হবে।

—মুখোমুখি আক্রমণ? হাঁদার মত জিজ্ঞাসা করল মিফলিন।

—জেনারেল, একটা কথা বিশ বার না বল্লে কি তোমাদের মাথায় ঢুকবে না? আমি ভাঁওতা দিতে চাই। বন্দুক তুলে গুলী করতে পারবে এমন কয়েক শ' ইয়াংকি ভূত যদি জোগাড় করতে পারো তাহ'লে দক্ষিণের ঐ ঢালু জায়গা দিয়ে তাদের আগিয়ে দাও। আধঘণ্টাখানেক সামলাতে পারলেই হবে। তারপর পালিয়ে আসতে পারে।

অভিবাদন করে মিফ্‌লিন ঘোড়া ছুটিয়ে দিল ইয়াংকিদের খোঁজে। প্রধান সেনাপতির কথায় যেমন রাগ হল, তেমনি উৎসাহও বাড়ল।

তুষারপাতে মর্ণিংসাইড্ পাহাড়ের পূব গা পিছল হয়ে আছে। বরফ-ঢাকা নেড়া পাহাড়ের গা বেয়ে নোল্‌টনের নেতৃত্বে কনেক্‌টিকাট্ সৈনিকেরা এবং লীচের নেতৃত্বে ভার্জিনিয়ার সৈনিকেরা চুপেসাড়ে চট্‌পট্ উপরে উঠতে লাগল। ভারী বন্দুকগুলো কারও কারও কাঁধে ঝুলান ছিল; আর স্লিং যাদের ছিল না, তারা গুঁজে রেখেছিল ছেঁড়া শার্টের ফুটোর মধ্যে। পাহাড় বেয়ে উঠবার জন্য সবাই এমন ব্যগ্র ছিল যে, ভার্জিনিয়ান এবং ইয়াংকিরা সাময়িকভাবে পারস্পরিক বিদ্বেষের কথা ভুলে গেল। বেজায় খুশী নোল্‌টন। তূর্যধ্বনি শিয়াল শিকারীর মনে কি পরিবর্তন ঘটিয়েছে পুরো-পুরি তা স্পষ্টভাবে না বুঝলেও, একথা সে বেশ বুঝতে পেরেছিল যে, সংক্ষিপ্ত কথা কাটাকাটির মধ্য দিয়ে তারা পরস্পরের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে। সম্পূর্ণ অপরিচিতের মত তাদের সাক্ষাৎ হয়; কিন্তু আঘাত-প্রত্যাঘাতের মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সৌভ্রাত্রের রাখীবন্ধন, গড়ে উঠেছে সমরক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক।

খুব চিন্তাশীল বা কুটিল প্রকৃতির মানুষ নোল্‌টন নয়। বুদ্ধিজীবী বা বিপ্লবীও সে নয়। হৈ-হল্লা মাতামাতি এবং সৈনিক জীবনের বন্ধুত্ব তাকে আনন্দ দেয়। এত বছর ধরে যে লড়াইয়ের আগুন ধুমায়িত হচ্ছে, সেই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে সে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল। সেইজন্যই আজ সে রণক্ষেত্রে। তার দৃঢ়বিশ্বাস, সে ন্যায়ের পক্ষেই আছে। এ সম্পর্কে খুঁটিয়ে বিচার করে দেখেনি। যুক্তিতর্ক দিয়ে যাঁরা বোঝাতে জানেন, তাঁদের কথায় বিশ্বাস করেই সে সন্তুষ্ট। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পক্ষে লড়াই করছে সে; কেননা স্বাধীনতার অর্থ তার কাছে অতি সহজ, অতি সরল: শৃংখ-লিত হয়ে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে নিক্ষিপ্ত হবার বিপরীত অবস্থাই স্বাধীনতা।

ডেলাওয়ের খুব বেশী দক্ষিণে সে এবং রীড্ পাহাড়ে চড়তে শুরু করেনি। বৃটিশ সেনার পশ্চাতে না এসে, পাহাড়ের মাথায় চড়ে ভুলক্রমে তারা সবুজ উর্দিওয়ালা একদল জার্মান সেনার একপাশে পড়ে গেল। অতি সন্তর্পণে পথ দেখে দেখে হেসিয়ানরা এগিয়ে আসছিল আমেরিকান লাইনের দিকে।

মেজর লীচ্ যখন দু'হাত দিয়ে একখানা পাথর ধরে উবু হয়ে পাহাড়ের গা ঘসে উঠতে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় একটি জার্মান ফৌজদার পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকাল।

—ওটা কি হে? চেঁচিয়ে উঠল জার্মানটি।

ফাঁদে-পড়া ষাঁড়ের মত গর্জে উঠল লীচ্। ডিগবাজী খেয়ে নোল্টন তার পাশে এল। সঙ্গে সঙ্গে কনেক্টিকাট্ ও ভার্জিনিয়ার সৈনিকেরাও ব্যস্তসমস্ত হয়ে পাহাড়ের মাথায় চড়বার জন্য ছুট দিল। এই তাড়াহুড়ায় অনেকেরই পাথরে হাত-মুখ কেটে গেল।

জার্মান সৈন্যদলে তখন ইয়ংকি-ইয়ংকি রব পড়ে গেছে। একটি ফৌজ-দার জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে তারস্বরে বল্লেঃ হাতিয়ার তুলে নাও!

অমনিই সুতোয় বাঁধা পুতুলের মত জার্মানরা পলকের মধ্যে থেমে দাঁড়াল, বন্দুক তুলে ধরল এবং সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল। যে জার্মান ফৌজ-দারটি লীচ্‌কে প্রথম দেখেছিল, পিস্তল তুলে লীচ্ তাকে তাক করে গুলী ছুঁড়ল। গুলীটি সরাসরি জার্মানটির হৃদয় বিদ্ধ করল।

—তাক করো! অশ্বারোহী লোকটি চেঁচিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে নোয়ান ভিজা গমের ডাঁটার মত জার্মানদের বন্দুকের মাথা নীচু হল।

—ফায়ার্!

আমেরিকান লাইনের দিকে এক ঝাঁক গুলী ছুটে এল। তিনটি বুলেট মেজর লীচের চেঁচামেচি স্তব্ধ করে দিল। দুটি লাগল পেটে, একটি পাছায়। মুখ থুবড়ে ছট্‌ফট্ করতে করতে গোঙাতে লাগল মেজর। রক্ত মোক্ষণে একটু পরেই তার মৃত্যু হল। নোল্টন তখন লাফিয়ে, চেঁচিয়ে, হাতের ইশারায় সৈনিকদের পাহাড়ের মাথায় চড়বার জন্য ডাকতে লাগল। সহসা কপালের পাশে একটা গুলী লেগে সে টাল খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল। রীড্ ধরে ফেল্ল।

—তাক করো! আবার আদেশ হল।

আমেরিকানরা তখনও পাহাড়ের খাঁজে দাঁড়িয়ে লড়াই করছে।

—ফায়ার!

কিন্তু এবারকার গুলীর সামনে কেউ বুক পেতে দিল না। উন্মাদ এক-গুঁয়েমি নিয়ে আমেরিকানরা পাহাড়ের খাঁজ আঁকড়ে রইল, কিন্তু কেউই পাহাড়ের মাথায় চড়তে পারল না। পাথরের পর বন্দুক রেখেই তারা গুলী ছুঁড়ল; তারপর ছাগলের মত পাহাড়ের চূড়া আঁকড়ে আবার বন্দুকে গুলী ভরবার চেষ্টা করল। কিন্তু সে চেষ্টা একেবারেই ব্যর্থ হল। নোল্-টনের দেহের বিরাট বোঝা বয়ে রীড্ পিছিয়ে এল এবং কনেক্টিকাটের দুটি সৈনিকের সাহায্যে ঢাকা একটা পাহাড়ের খাঁজের উপর তাকে শুইয়ে দিলে।

ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে নোল্‌টন কি যেন ব'লবার চেষ্টা করছিল। এই খণ্ডযুদ্ধের হৈ-হট্টগোলের মধ্যে তার কথা শুনবার জন্য রীড্‌কে খুব নীচু হয়ে কান পাততে হল। শিয়াল-শিকারী সম্বন্ধেই কি যেন বলতে চাইছিল নোল্‌টন। সবটা বোঝা গেল না। আঙুল দিয়ে খাঁজটা দেখিয়ে বল্লেঃ তাঁকে বলো, আহত হয়েছি বলেই আমাকে এখানে থাকতে হলো। বোলো, আমি ভয় পাইনি...

মাসাচুসেটসের শ' দুয়েক ইয়াংকি নিয়ে বৃটিশদের ভাঁওতা দেবার জন্য লেফট্‌ন্যাণ্ট-কর্নেল ক্র্যারীকে আদেশ দিল মিফলিন। এই সংবাদ যখন রটে গেল, ইয়াংকিদের এলোপাথারি লাইনের সামনে গিয়ে মিফলিন বল্লেঃ লড়াই করতে তোমাদেব হবে না। সে হিম্মৎও তোমাদের নেই জানি। উপত্যকার ওপারে ওই পাহাড়ের মাথায় ঘণ্টাখানেক তোমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। কিন্তু একথা আমি হলপ করে বলে যাচ্ছি, যে প্রথম পালাবার চেষ্টা করবে, আমার হাতে তার মৃত্যু সুনিশ্চিত।

গোমরা মুখ কবে ইয়াংকিরা তাব দিকে চেয়ে রইল, কোন জবাব দিলে না।

—এগিয়ে চ'লো—মার্চ'! মিফলিন ব'ল্লে।

উপত্যকার তলদেশ দিযে তারা এগিযে চ'ল্ল। প্রথমে হাঁটতে লাগল, কিন্তু একটু পবেই ছুটতে শুরু কবল। ঘোডা ছুটিযে মিফলিনেব কাছে এসে শিয়াল-শিকারী দৌড়োবার কাবণ জিজ্ঞাসা করলেন।

--ঠিক বলতে পারবো না স্যব! সসংকোচে জবাব দিল মিফলিন।

ছুটতে ছুটতে সৈন্যদলটি জঙ্গলেব মধ্যে ঢুকে গেল। যতক্ষণ তাবা পাহাড়ের চূড়া পার হয়ে না গেল, সবুজ বন-জঙ্গলের মধ্যে মিফলিন স্পষ্ট তাদের শার্ট দেখ্‌তে পেল। ইয়াংকিবা ওধাবে যাবার একটু পবেই দুম্‌দাম্‌ গুলীব আওয়াজ শোনা গেল।

—ঐ শুনুন স্যব! শত্রুকে ভাঁওতা দেবাব কাজ শুরু হয়ে গেছে। মিফলিন বল্লে।

বড় আদমী ওদের পালিয়ে আসবার জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। ভাবলেন, এখুনি হয়ত ওরা প্রাণপণে ছুটে পালাতে শুরু করবে। ঘাড় বাঁকিয়ে দেখলেন যে, হাজার হাজার পরাভূত ইয়াংকি ভূত খাড়া হয়ে কান পেতে বন্দুকের আওয়াজ শুনছে।

নিরবচ্ছিন্ন বন্দুকের শব্দ হচ্ছে। চাপাগলায় মিফলিন বল্লেঃ সেকি, ওরা প্রতিরোধ করছে! তার কণ্ঠস্বরে খানিকটা বিস্ময়ের ভাব ছিল।

ভার্জিনিয়ান একদৃষ্টে ঢালু জায়গাটার দিকে চেয়ে রইলেন। পলায়নপর লোকজনে এতক্ষণে ঢালু জায়গা ভরে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কই, এক-জনও নেই তো!

—ওরা বাধা দিচ্ছে স্যর! আবার বল্লে মিফলিন।

—খুব হয়েছে মিফলিন! চোখ-কান আমারও আছে। ভাগো এখান থেকে। আর একটা রেজিমেণ্ট নিয়ে ওদের বলবৃদ্ধি করো।

প্রধান সেনাপতি নিজে পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে উপরে উঠ্‌তে লাগলেন। পেছু ডেকে মিফলিন তাঁকে এক্‌লা না যাবার জন্য অনুরোধ করল। কিন্তু তিনি কান দিলেন না। বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে নয়া-ইংলণ্ডের সৈনিকদের পেছনে এসে দাঁড়ালেন। পাহাড়ের মাথায় একটা পাথুরে দেওয়ালের পেছনে থেকে এই অল্পসংখ্যক ইয়াংকি রক্ষী ইতিমধ্যেই বৃটিশ অশ্বারোহী সৈনিকদের পয়লা আক্রমণ হটিয়ে দিয়েছে। আর একটি লঘু পদাতিক দল এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। আগুয়ান পদাতিক দলটি এখনও শ' চারেক গজ দূরে, তাই নীরবে অপেক্ষা করছে ইয়াংকিরা।

একদৃষ্টে প্রধান সেনাপতি চেয়ে রইলেন ইয়াংকি প্রতি-রক্ষীদের দিকে। মনে হল, এরা ভিন্ন জগতের লোক। দেয়ালের ওধারে মাঠের লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে দুটি অশ্বারোহী পড়ে আছে। বাতাসে বারুদের উগ্রগন্ধ। ইয়াংকিরা ঘাড় ফিরিয়ে তাঁকে দেখল। কিন্তু সামান্য জনকয়েক ফৌজদারই সেলাম করল। প্রধান সেনাপতির উপস্থিতিতে তারা খুব উৎসাহিত হয়েছে ব'লেও মনে হল না। কিন্তু তিনি না বল্লেন কোন কথা, না দিলেন কোন আদেশ।

রেজিমেণ্টের ঝাণ্ডা উড়িয়ে জোরসে ড্রাম বাজাতে বাজাতে লঘু পদাতিক দলটি আরও কাছে এগিয়ে এল। শ'খানেক গজের মধ্যে এসে পড়েছে তারা; তবু কেউ গুলী ছুঁড়ছে না। ঠিক এই সময় মিফলিন তার রেজিমেণ্ট নিয়ে হাজির হল। গ্রীনও সঙ্গে ছিল তার। দীর্ঘ রোগভোগের দরুণ তার চেহারা তখনও বিশীর্ণ পাণ্ডুর, চক্ষু রক্তবর্ণ।

—আরও শ' পাঁচেক নিয়ে পুটনাম এখুনি এসে পড়বে স্যর! হেঁকে বল্লে মিফলিন।

সহসা পেছনে ঘড়ঘড় করে একটা আওয়াজ হল। বড় আদমী ঘাড় ফিরিয়ে দেখ্‌লেন, নক্স আর তরুণ হ্যামিলটন দুই-ঘোড়ায় টানা একটা কামান উপরে

তুল্ছে। ইয়াংকিরা যেই দেখল নতুন নতুন সৈন্যদল ছুটে আস্ছে তাদের বলবৃদ্ধির জন্য, অমনিই দেয়ালের পর চড়ে বৃটিশ পদাতিকদের আক্রমণ করল। তাদের এই আক্রমণের মধ্যে কোন শৃংখলা, কোন পদ্ধতি বা কোন সামরিক কায়দা ছিল না। চীৎকার চেঁচামেচি করতে করতে শত শত ইয়াংকি ঝাঁপিয়ে প'ড়ল বৃটিশদের উপর। কেউ গুলী ছুঁড়ল...কেউ বন্দুক দিয়ে মাথায় বাড়ি মারল...কেউ বা খালি হাতেই কীরিচ চেপে ধরল ..কেউ হাসল...কেউ কাঁদল .. কতজন মারাও গেল। তবু বৃটিশরা হ'টে যেতে বাধ্য হল।

প্রধান সেনাপতিও এদের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেলেন। এদের মত তিনিও গলা ছেড়ে চীৎকার চেঁচামেচি করলেন। তিনিও হাসলেন, কাঁদলেন। তিনি জানতেন যে সামরিক কলা-কৌশলের দিক থেকে একে লড়াই বলে না: কিন্তু তাতে কি এসে যায়? তাঁর লোকজন এখনও লড়াই করতে চায়, ব্যস্ এতেই তিনি সন্তুষ্ট। পুটনাম এবং তার পাঁচশ' লড়িয়ে চট্পট্ যাতে এসে পড়ে সেজন্য মিফলিনকে অবিলম্বে সংবাদ দেবার আদেশ দিলেন। নক্সের কাছে লোক পাঠালেন কোন মতে কামানটা এক পাশে নিয়ে গিয়ে সে বৃটিশদের নাস্তানাবুদ করতে পারে কি না। একটু পরে মিফলিনের খোঁজেও লোক পাঠালেন, যাতে পুটনামের পাঁচশ' লড়িয়ে ছাড়া আরও শ পাঁচেক সৈন্য নিয়ে সে রণক্ষেত্রের লাইন বিস্তৃত ক'রে দেয়। এই উন্মত্ত দিগ্বিদিকহীন মাসাচুসেট্সের সৈনিকদের পরিবেষ্টনের হাত থেকে বাঁচাতে হবে তো!

এদিকে বৃটিশ লঘু পদাতিক দলটি এক অচিন্তিত বিপাকের মধ্যে পড়ে গেল। আমেরিকান বাহিনীর অবস্থান জানবার খোঁজে এসেছিল তারা; কোন রকম বাধা প্রত্যাশা করেনি। বহু গুণ বেশী উন্মত্ত জনতার এলোপাথারি আক্রমণের মুখে বাধ্য হ'য়ে সম্মুখ সংগ্রামে তারা ক্রমাগত পেছু হটতে লাগল। সম্মুখ সংগ্রামে পেশাদার বৃটিশ বাহিনীকে পেছু হটতে ইয়াংকিরা এই প্রথম দেখল। ফলে তাদের মাথা একেবারেই বিগড়ে গেল—উৎসাহে আনন্দে উত্তেজনায় তারা দিশেহারা হয়ে পড়ল। তখন হাতের বন্দুক হল লাঠি। ওটা দিয়ে যে গুলী করা যায় সে খেয়াল রইল না। হাতের কাছে কাঠ পাথর যা পেল, তাই ছুঁড়ে মারতে লাগল। কিল-ঘুষি-লাথি মেরে, খামচে, ধাক্কা মেরে যে যে-ভাবে পারে বৃটিশ পদাতিকদের তাড়িয়ে নিয়ে চলল। জনতার এই এলোপাথারি আক্রমণ সত্ত্বেও ইংরেজ পদাতিক শৃংখলা ভাঙল না। বন্দুকে গুলী ভরবার ফুরসৎ না পেলেও শত্রুর সম্মুখে কীরিচ উঁচিয়ে রেখে ক্রমাগত তারা পেছিয়ে গেল।

এইভাবে মাইলখানেক হটে যাবার পর হেসিয়ানরা তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল। বৃটিশ ফৌজের পার্শ্বদেশ আক্রমণ ক'রবার জন্য দলবলসহ রীড্ যে প্রয়াস করেছিল, তা বানচাল করে দিয়ে পশ্চিমমুখো ঘুরে তারা আমেরিকান বাহিনীর পার্শ্বদেশ আক্রমণ করল। ঠিক সেই সময়েই আবার আমেরিকানদের অপর পার্শ্বে একটি গোলন্দাজ দল যুগপৎ তোপ দাগ্‌তে শুরু ক'রল। গোলাগুলীর আওয়াজ শুনে লাল-উর্দিয়ালা আরও দুটি সৈন্য-দলও এগিয়ে এল পদাতিকদের সাহায্যে।

এই যুগপৎ আক্রমণে ইয়াংকিদের সম্মুখে ব্যূহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তারা পেছু হট্‌তে আরম্ভ করল; কিন্তু দৌড় দিল না। বন্দুকের-লাঠি দিয়ে আঘাত করে খিস্তি-খেউড় করে...স্বপক্ষের আহতদের বয়ে এনে...প্রতিটি ইঞ্চি জমির জন্য যুঝে ..এক পা' দু পা' করে তারা পেছু হটে এল। এইভাবে হটতে হটতে আবার তারা হলোওয়ের মুখে এল; কিন্তু বৃটিশরা উপত্যকার মধ্য পর্যন্ত ধাওয়া করে আমেরিকানদের উপর সরাসরি আক্রমণের ঝুঁকি নিল না দেখে উল্লাসে তারা গগনভেদী চীৎকার করে উঠল।

তারা পরাভূত হয়েছে কিন্তু ছুটে পালায়নি। শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বন্দুক আঁকড়ে রয়েছে। এই হিম্মতের জন্য শিয়াল-শিকারীর মত তারাও গর্বিত। আবার শিয়াল-শিকারী লৌহশলাকার মত মেরুদণ্ড টান ক'রে বসে-ছেন ঘোড়ার পিঠে। কলরবমুখর সৈনিকেরা ঘিরে ধরেছে তাঁকে; কিন্তু তিনি এত অভিভূত যে মুখ দিয়ে কথা ফুট্‌ছে না।

তৃতীয় পর্ব

ওয়েষ্টচেষ্টার

স্বাধীনতা জিন্দাবাদ

এক সময় বিপ্লবীদের প্রতি নিউইয়র্কের যতটুকু দরদই থাক না কেন, ইংরেজরা শহর দখল ক'রবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তা ধুয়েমুছে গেল। তখন বিপ্লবীদের কে কত বেশী ঘৃণা করত, তাই প্রতিপন্ন ক'রবার জন্য শহরের সং নাগরিক মহলে প্রতিযোগিতা শুরু হল। বিভিন্ন বৃটিশ রেজিমেণ্টের ফৌজদারদের ভোজসভায় আমন্ত্রণ করবার জন্য ধনীদের মধ্যে শুরু হল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কোন জেনারেলকে পেলে তো কথাই নেই। সে সম্মান কার কাম্য নয়? নিদেন একজন কর্নেল বা মেজর যদি পাওয়া যায়, তাহলেও পাঁচজনের কাছে বলা চলে। আর তাও যদি না হয়, কোন তরুণ ক্যাপ্টেন বা ছোটোখাটো ফৌজদারও যদি খাতির করে তাহলেও নাক সিট্‌কান চলে না। নিউইয়র্কের সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলি এই মনোভাব কোনরকম লুকোবার চেষ্টা করেনি। প্রথমাবধিই তারা জানত, তাদের স্বার্থ কোনদিকে।

এ ত' গেল খানদানী পরিবার ও বিত্তবানদের কথা। মধ্যবিত্তরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল। নিশ্চিন্তে এখন তারা দোকানপাট খুলে বেচাকেনা করতে পারবে। তাদের কাছে রুজি রোজগারের নির্বিঘ্নতাই শান্তি। তারা জানে, এখন আর ধারে কিম্বা বাজে নোটের বিনিময়ে কারবার করতে হবে না। এখন লেনদেন হবে চকচকে খাঁটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে। এও তারা জানে যে হাজার হাজার বৃটিশ সৈনিক ও জাহাজী খদ্দেরের আনাগোনায় বাজার সরগরম হয়ে উঠবে, দোকানপাটে জোর বেচা-কেনা চলবে। বৃটিশ কামানের আশ্রয়ে অবিলম্বেই আবার হয়ত নিউইয়র্ক বন্দরে বহির্বাণিজ্য চালু হবে।

যাই হোক, ইংরেজরা শহর দখল করায় প্রায় সকলেই নিশ্চিন্ত এবং স্বস্তিবোধ ক'রেছে। নিউইয়র্কের চারিপাশের দেশগাঁ থেকে হাজার হাজার ভুঁইফোড় অকর্মণ্য লোক এসে শহরে ভীড় করেছিল। শহরের সর্বত্র এই গাঁজলা থৈথৈ করত। জীবনে কোন দিন এরা সদ্ভাবে শ্রম করে একটি পয়সাও আয় করেনি। প্রথমে এরা বিপ্লবীদের দিকে ঝুঁকে পড়ে; কিন্তু যখনই বুঝল যে ইয়াংকিদের

সঙ্গে থাকলে লড়াই করতে হতে পারে তখনই তারা ভেগে যায়। এদের সঙ্গে ভেসে বেড়াত অসংখ্য দেহজীবিনী নারী। এইটুকু ছোট্ট শহরে এতো হাজার পণ্যা নারীর ভীড় দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। নাবালিকা থেকে শুরু করে ফোক্‌লা থুড়থুড়ি বুড়ী পর্যন্ত সমস্ত বয়সের, শত শত রূপসী থেকে কুরূপা নারী দেহের পসরা ফিরি ক'রে বেড়াত। কোত্থেকে তারা এসেছে, কেউ জানে না। এই ক্ষুদ্র জনপদ এতো দেহজীবিনী জোগান দিতে পারে এও বিশ্বাস করা যায় না। ইয়াংকিরা যখন শহর দখল করল, এরা নয়া-ইংলণ্ডের চাষাভূষাদের চোখ ধাঁধানো সাজ পরল। আবার যেই বৃটিশরা এল, অমনিই এদের কুষক-বঙ্গিনী রূপ বদলে গেল। সাজ-পোশাক ও হাবভাবের বিস্ময়কর রূপান্তব ঘটল। রেশমী পোশাক ও বেশবিন্যাসের ঠমক দেখিয়ে তারা আঁকাবাঁকা অলি-গলিতে ঘুরে ফিরে পসরা যাচাই করতে লাগল। পথে যে লাল-উর্দিয়ালা জার্মান বা স্কটল্যাণ্ডবাসীর সঙ্গে দেখা হল, তারই কানেকানে শুনিয়ে দিলে নিজের দাম। শহরের ভদ্র নাগরিকেবা কোন আপত্তি করলেন না। বরং এদের উপস্থিতিতে তারা খুশীই হলেন। একদিক থেকে এরা ভদ্রঘরে বলাৎ-কারের রক্ষাকবচ তো বটেই। নাগরিকরা বল্‌তেনঃ শহরময় যখন আপেল ফলছে, কে আর তখন আসবে নিষিদ্ধ ফল কুড়োতে?

বৃটিশরা শহরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে খানাপিনা নাচগান সভা-অভিনন্দনের ধুমধাম পড়ে গেল। কয়েক সপ্তাহ নিউইয়র্ক যেন ছুটির আনন্দে মেতে বইল। শহরে তখন পুরুষের চাইতে মেয়েদের সংখ্যা অনেক বেশী। শত শত দেহের পসারিনী তো আছেই, তা'ছাড়া তথাকথিত ভদ্র সমাজেও নারী বেশী পুরুষের চাইতে। পরিবার পরিজন রেখে বিত্তবানদের অনেকেই কানাডা বা ইংলণ্ডে সরে পড়েছিলেন। ভূঁইফোড় বিপ্লবীদের প্রতি ঘৃণায় যুবকেরা রবার্ট বোজার্সের দলে যোগ দিয়ে ওয়েস্টচেস্টারে লুকিয়ে ছিল। ভাগ্যা-ন্বেষী এই সৈনিকটি আস্ত একটি প্রাণহীন নির্মম শয়তান। দাগাবাজী ও খুন-খারাবির জন্য রোজার্সের রেঞ্জার্স দল কয়েক বছর পূর্বেই নাম কিনেছে।

রবার্ট রোজার্সের মানব-বিদ্বেষের কথা সুবিদিত ছিল। যে কোন আদর্শ বা উদ্দেশ্যের ভালমন্দ সে যাচাই ক'রত শক্তির মানদণ্ডে। শক্তি মানে গায়ের জোর। কোন যুক্তি-তর্কের ধার সে ধারত না। তার মতে যে বলবান —জোর যার, সে-ই ঠিক। মায়া মমতার কোন বালাই তার ছিল না। এমনকি নিজের প্রতিও না। জনসাধারণকে সে ঘৃণা করত। এ হেন রবার্ট রোজার্স নতুন জগতকে ভেঙে গড়বার কাজে ব্রতী হলেন। জলন্ত অগ্নিগোলকের মত

যে পথে সে এগিয়েছে, সেপথ পড়ে থাক্ হ'য়ে গেছে। তার জীবনের ইতিহাস মৃত্যু ও ধ্বংসের ইতিহাস। তবু এতদিন বিশেষ সুবিধা ক'রে উঠতে পারেনি। বহু বৎসরের দুর্ভাগ্য ও পরাভবের শেষে নিউইয়র্ক এবং ওয়েস্টচেস্টারের তরুণ টোরীদের নেতা হিসাবে রোজার্স এতদিনে প্রতিষ্ঠার পথ পেল। কিন্তু এ সত্ত্বেও সামান্য উৎপাত সৃষ্টি করা ছাড়া বড় রকমের কোন কিছু করবার শক্তি সে সঞ্চয় করতে পারেনি। আমেরিকান ফৌজের আশেপাশে ওৎ পেতে থেকে কখনও কয়েকজন শান্ত্রী সাবাড় করা, কিম্বা দলত্যাগীদের ধরে সাড়ম্বরে পুড়িয়ে মারা ছাড়া বিশেষ কিছু সে করতে পারেনি। ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে, আর উত্তর-আফ্রিকার জলদস্যুদের দলে থেকে, যে বিদ্যা সে আয়ত্ত করেছিল, সেই দস্যুবৃত্তিতে হাত পাকান ছাড়া আজও নতুন কিছু করবাব শক্তি তার ছিল না।

নিউইয়র্ক শহর দুই দিকেই তাল রেখেছে। কারবারী ও শ্রমিকের তরুণ পুত্রেরা স্বাধীনতার সন্তান দল নামে একটা বাজে গুপ্ত প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে বাপেদের চটিয়েছে, মা'দের কাঁদিয়েছে। কথার বদলে যখন কাজের সময় এল, এদের অনেকেই আলেকসান্দর হ্যামিলটন নামে একটি ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান তরুণের নেতৃত্বে গঠিত গোলন্দাজ দলে যোগ দিল। এখন তারাও শহর ছেড়ে চলে গেছে। এদের স্থান পূরণ করেছে কিছু অকর্মণ্য নিরক্ষর ভবঘুরে আর বৃটিশরা।

নিউইয়র্কের সামান্য কিছু লোকই বৃটিশদের সাদর অভ্যর্থনা জানাতে পারেনি। য়িহুদীরা এদের অন্যতম। পরাভূত ছিন্নভিন্ন ইয়াংকিদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমস্ত আশা-ভরসাও ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। মনে-প্রাণে তারা বিপ্লবের সঙ্গে নিজেদের ভাগ্য জড়িয়ে দিয়েছিল। অস্ত্র বহনে সক্ষম সমস্ত য়িহুদী যোগ দিয়েছিল বিদ্রোহী ফৌজে। বিপ্লবের প্রতি তাদের ঐকান্তিক আকর্ষণের কথা য়িহুদীরা গোপন করেনি ; বরং খানিকটা ভাবপ্রবণ বলে চেঁচিয়েই সে কথা জাহির করেছে। সেতু পার হয়ে এসে তারা সেতু ভেঙ্গে দিয়েছে। ফিরবার পথ বন্ধ। য়িহুদীরা তাদের উপাসনা-ঘরে আশ্রয় দিয়েছে আহতদের, বৈঠকখানা করেছে ষড়যন্ত্রের আড্ডা, নগদ টাকা ঢেলেছে জুয়াড়ীর মত শুধু একখানা তাসের উপর হারজিতের বাজী রেখে। হয় সব যাবে, না হয় অঢেল আসবে। মদ রাখবার ঘরে শুয়ে গ্যাংগ্রিণের যন্ত্রণায় যারা ছটফট্ করছে তারা ছাড়া সব য়িহুদী যুবকই চলে গেছে ইয়াংকিদের সঙ্গে।

অবিশ্যি য়িহুদীদের এই অভিজ্ঞতা নতুন নয়। তাদের দীর্ঘ ইতি-হাসের ধূলিমলিন পাতায় এমনি অবস্থা আরও অনেকবার ঘটেছে। দরজা-জানালায় খিল আটকে মেয়েরা চোখের জল ফেলেছে অন্দর মহলে। পরাজিত এবং অপমানিতের জন্য সেদিন নিউইয়র্ক শহরে একমাত্র য়িহুদী নারীই চোখের জল ফেলেছিল। প্রবীণেরা উপাসনা-ঘরে জমায়েৎ হয়ে প্রার্থনা করলেন, নির্বাসিতের এই শেষ আশ্রয় যেন ভেঙেচুরে না যায়। হেম সালো-মন নামে যক্ষ্মারোগজীর্ণ ক্ষীণবল একটি পোলিশ-য়িহুদী অস্ত্র বইতে অক্ষম বলে পেছনে পড়েছিল। তার বাড়ীর মদ্যশালায় বেপরোয়া জনাকয়েক ষড়-যন্ত্রকারীর এক বৈঠকে বক্তৃতা করতে উঠে দাঁত খিচিয়ে, কাশের সঙ্গে রক্তবমি করে একমাত্র সে-ই হলপ করে বল্লঃ এই তো সবে শুরু হলো।

সতেরোশ' ছিয়াত্তর সালের বিশে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার প্রাক্কালে এই নিউইয়র্ক শহরেই একটি যুবক উদ্দেশ্যহীনভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার আটপৌরে বাদামী রঙের তাঁতে-বোনা সুট্‌টির কনুই, হাঁটু এবং পাছার পর তালি লাগান। মাথায় ছিল পুরনো গোল একটা টুপী। উত্তরে লোকেরা তখন ঐ ধরণের টুপী খুবই পছন্দ করত। ছেলেটির বয়স বছর একুশ। মুখচোখের চেহারায় তাকে আরও ছোট বলে মনে হয়। দেশ-গাঁয়ের লোক অপরিচিত জায়গায় এলে যেমন খানিকটা ইতস্তত করে সন্তর্পণে পা ফেলে, নীলনয়ন, গাল-লাল এই যুবকটিও তেমনিভাবে হাঁটছিল। ভাবসাব দেখে তাকে নিরীহ দর্শক বলেই মনে হয়। যেন শহর দেখতে বেরিয়েছে।

লাল-উর্দিয়ালা দেখলে আনাড়ীর মত হকচকিয়ে সে হাঁদার মত ফিক করে হেসে ফেলত। একবার ইয়াংকিদের একটা মরচেধরা কীরিচ কুড়িয়ে নিয়ে অতি সন্তর্পণে সে ভোঁতা দিকটা আঙুল দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল। যুবকটি শহরের যত্রতত্র ঘুরে বেড়াল। ইস্ট নদীর জাহাজঘাটা থেকে হাডসন নদীর জেলেদের আড্ডা পর্যন্ত, আবার শহরের উত্তরে ওলন্দাজদের উইন্ডমিল থেকে শুরু করে বোলিং গ্রীনের মসৃণ ঘাসের গালিচা অবধি সর্বত্র ঘুরে বেড়াল যুবকটি। বোলিং গ্রীনে বৃটিশরা ষোল-পাউন্ডার কামানের একটি ব্যাটারি সাজিয়ে রেখেছিল। এই কামানগুলো দেখে যুবকটির মনে ছেলেদের মত কৌতূহল জেগে উঠল। গুটি গুটি পা ফেলে সে এগিয়ে গেল কাছা-কাছি। সন্তর্পণে হাত বুলিয়ে অনুভব করল কামানের ঠান্ডা গা।

—এই! হাত দিও না। শান্ত্রী হেঁকে উঠল।

—মস্ত বড় কামান তো! যুবক বল্লে।

—আমি আরও বড় কামান দেখেছি। এখন যাও, সরে পড়ো।

বৃটিশরা একটা আলাদা গুদামঘরকে সামরিক রসদখানা বানিয়েছিল। খানিক পরে দেখা গেল, যুবকটি তার আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দু' চারটে ধমক দিয়ে তাকে হটিয়ে দেওয়া হল।

শহরের উত্তর-মহল্লায়, ওয়াল স্ট্রীটের খানিকটা উত্তরে একটি টহলদার দল তাকে থামিয়ে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেঃ সে কে? কেন এসেছে, কেনই বা সন্ধ্যার পর নিউইয়র্ক শহরের পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ইত্যাদি।

—জার্সি থেকে এসেছি আমি। মেজর রোজার্সের দলের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সার্জেণ্টকে বল্লে যুবকটি সবিনয়ে।

—আর নিউইয়র্কের কোন ব্যাটাচ্ছেলে যে মেজর রোজার্সের দলে ভীড়তে চাইছে না, তাই তো বুঝে উঠতে পারছি না।

হাঁদার মত হেসে উঠল যুবকটি।

—সে যা হোক, এখন রাস্তায় আর ঘোরাঘুরি কোরো না; তাহ'লে কয়েদখানায় ভর্তি হতে হবে। সার্জেণ্ট সতর্ক করে দিল।

এরপর সে অন্ধকার অলিগলি দিয়ে চলাফেরা করতে লাগল। টহলদারের লণ্ঠন আসছে দেখলেই দৌড়ে আব্‌ডালে সরে দাঁড়াত। বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যুবকটি। গত তিন দিনে মাত্র কয়েকঘণ্টা ঘুম হয়েছে। কোন পান্থশালায় বা গণিকালয়ে যাবার ইচ্ছা ছিল না। ভাবলে, কেউ হয়ত তাকে চিনতেও পারে। কিন্তু রাত বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ক্লান্তিও বেড়ে চল্ল। একবার মনে হল, কোন য়িহুদীর বাড়ী গেলে কেমন হয়! গৃহস্বামীকে বলে-কয়ে রাত কাটাবার মত স্থান নিশ্চয় জোগাড় করে নেওয়া যাবে। এই মনস্থ করে প্রথমে যে বাড়ীটির দিকে সে অগ্রসর হল, তার ফটকের সামনে শান্ত্রী পাহারা দিচ্ছিল। বাড়ীতে কোন লোকজন ছিল না। এরপর মনে হল যে আবার কোন বাড়ীর খোঁজে গেলে হয়ত ভীমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া হবে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বারবনিতারা বার বার তার পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সবাইকেই সে একই জবাব দিয়েছেঃ আমার পকেট ফাঁকা। আর একটি মেয়ে যখন আবার তাকে থামাল, তাকেও সে একই জবাব দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু মেয়েটি খপ করে তাব হাত টেনে ধরল।

—যেও না। মেয়েটি বল্লে।

থমকে দাঁড়াল যুবকটি। মনে হল হাতের সেই মৃদু চাপেই সে জন্তুর মত ফাঁদে আটকা পড়েছে। কি দুর্বল সে! মোচড় দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সে তাকাল মেয়েটির দিকে। দেখল, ছেঁড়া লেস দেওয়া গাউন ও নীল টুপী পরা, মুখে রঙচঙ্মাখা, কালোচোখো একটি ছিপ্ছিপে মেয়ে তাকে টেনে ধরেছে।

—কিসের ভয় করছো? মুচকি হেসে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল।

—কিছুর না। আমার পকেট ফাঁকা।

—আমি টাকাকড়ি চাইনি তো! বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল মেয়েটি যুবকটির লাবণ্যভরা কচি মুখের দিকে। কোমরে হাত দিয়ে দুনিয়ার কোন কিছুই সে পরোয়া করে না এমনি ভঙ্গীতে ছেলেটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল মেয়েটিঃ তুমি ইয়াংকি, তাই না?

—না।

—কিসের ভয় করছো তুমি? আমি তো ডাইনী নই যে তোমায় খেয়ে ফেলবো!

ছেলেটি আবার হাঁটতে শুরু করল। কিন্তু মেয়েটি চট্পট্ পেছু পেছু এসে আবার যুবকটির হাত টেনে ধরলঃ অত ভয় কিসের গো? আমি জানি তুমি ইয়াংকি। পল্টন যখন শহরে ছিল, তখন তোমায় দেখেছি।

ধীরে ধীরে মেয়েটির দিকে ফিরে এমনভাবে চোখ পাকিয়ে ছেলেটি তাকাল যে, নীরব শাসানি দেখে মেয়েটি ভয়ে খানিকটা পিছিয়ে গেল। তখন ছেলেটি এমনি কষে মেয়েটির কব্জি চেপে ধরল যে, যন্ত্রণায় সে উঃ-আঃ করে উঠল। ছেলেটি ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাতেই মেয়েটির সরল আয়ত দৃষ্টি নজরে পড়ল।

—শীগ্গির চলে এসো! ঐ আবার পাহারায়ালা আস্ছে।

ছেলেটি চেয়ে দেখল, সত্যিই পাহারায়ালার আলো এগিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে দে' ছুট্। যুবকটি টের পেল যে মেয়েটিও তার পেছন পেছন দৌড়ে আসছে। রাস্তাটির শেষ প্রান্তে এসে দেখে যে, আর একটি দোলান লণ্ঠন তার পথ রোধ করে আছে। দুই লণ্ঠনের মধ্যে আটকা পড়ে সে হতাশভাবে অন্ধকার গলিটার দেয়ালগুলোর দিকে তাকাতে লাগল..ভাবতে লাগল কি করা যায়.. অসহায়ের মত পা দিয়ে মাটি ঘসতে লাগল। ঠিক এমনি সময় বাহুতে মেয়েটির হাতের স্পর্শ অনুভব ক'রে নীরবে তার অনুসরণ করে ছেলেটি জমাট-বাঁধা অন্ধকার ফাটলের মধ্য দিয়ে আরও গভীরতর

অন্ধকারের মধ্যে পড়ল। মনে হল একটা দুয়ার পার হয়ে এসেছে। কপাট বন্ধ করে দিয়ে মেয়েটি তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। শুনল, তখনও সে হাঁপাচ্ছে।

—যাক্ বাপু! উঃ কি গায়ের জোর তোমার! আমার হাতটা এখনও টনটন করছে! ফিস্‌ফিস্ করে বল্লে মেয়েটি।

অন্ধকারে যুবকটি খিলখিল করে হেসে উঠল। সহসা তার উরুতে ও বক্ষদেশে মেয়েটির উষ্ণদেহের চাপ অনুভব করল। মেয়েটিকে দেখবার জো নেই এমনি জমাট অন্ধকার। মাথায় ও পোশাকে যে গন্ধ সে মেখেছে, শুধু তার ঝাঁজ নাকে আসছে। এই আশ্রয় দেবার জন্য সে কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা জানাতেও সে প্রস্তুত। কিন্তু রাস্তায় যে রঙচঙ্‌মাখা দেহপসারিণী তাকে পাকড়াও করছে, তাকে কি করে কৃতজ্ঞতা জানান যায়?

—চকমকি আছে। আলো জেলে দেবো?

—না, দরকার নেই।

চট্‌পট্ জবাব দিলে যুবকটি সরাসরি। মনে হল, মেয়েটির দেহ শক্ত হয়ে উঠছে। তার তরুণ জীবনে এই সর্বপ্রথম সে আঘাতের অদৃশ্য সংজ্ঞাতীত উচ্ছ্বাস টের পেল। কেমন হক্‌চাকিয়ে গেল। মনে পড়ল নিজের মর্যাদা ও শিক্ষা সহবতের কথা। তার তুলনায় মেয়েটি আদতে কি? মনে পড়ল গীর্জায় লেখা উপদেশের কথা। সহজ সরল স্বার্থহীন ভাষায় সেখানে কুলটা নারীকে শয়তানের সহচরী, নরকের দ্বার বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

—আমার কাছে টাকাকড়ি কিচ্ছু নেই। আবার জানাল যুবকটি। তবু ভাল অন্ধকারে মেয়েটির মুখখানা দেখা গেল না।

যুবকটির হাত ধরে মেয়েটি তাকে ঘরের মধ্যে দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে বসতে বল্ল। মেয়েটির দেহের ভারে খড়-ভর্তি শক্ত গদিটা চুরমুর করে উঠল। খানিকটা দূরে সরে বসেছে সে। শিরদাঁড়া টান করে গোঁজ হয়ে বসে রইল ছেলেটি হাতে হাত চেপে। বসবার একটু পরেই ক্লান্তি ফিরে এল। বিছানার পর বসতে পেয়ে গা এলিয়ে দেবার ইচ্ছা হল।

—তোমার নাম কি? মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল।

—নাথান হেল।

—তুমি কি বিদ্রোহী?

—হাঁ।

লুকোবার আর কোন প্রয়োজনই ছিল না। তার ইয়াংকি খোলার ঢাকনি কোথায় যেন ইতিপূর্বেই ফুটো হ'য়ে গেছে।

—তুমি কি পল্টন ছেড়ে প্যালিয়েছো? আবার জিজ্ঞাসা করে মেয়েটি।

—না।

—আমি না থাকলে ধরা পড়ে যেতে তো! তোমরা ইয়াংকিরা যেন কেমন-ধারা। টাকা টাকা করেই অস্থির। বারবার আমাকে শোনালে, টাকা নেই, টাকা নেই। টাকা চেয়েছি তোমার কাছে?

অন্ধকারের মধ্যে মেয়েটির কণ্ঠস্বর যেন ছোট্ট একটি বালিকার মধুর কণ্ঠ-ঝংকার বলে মনে হল।

—এখানে নিয়ে এসেছ আমাকে সেজন্য ধন্যবাদ। ধীরে ধীরে ব'ল্লে ছেলেটি। নিজেকে তার অনেক বড়, অনেক শক্তিমান কেউকেটা লোক বলে মনে হল। এই একুশ বছর বয়েসের মধ্যে নিজের সম্পর্কে এমন ধারণা কোন-কালেই হয়নি।

মেয়েটি তার কথার কোন জবাব দিল না। একটু পরে সে বুঝল যে মেয়েটি কাদছে। অন্ধকারে তার ফোঁপানি বিড়ালের ফোঁস ফোঁস শব্দের মত শোনাচ্ছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ছেলেটি খানিকক্ষণ বসে রইল: তারপর হাত বাড়িয়ে মেয়েটির জন্য হাতড়াতে লাগল। প্রথমে তার হাতে একখানি কোমল উষ্ণ বাহু ঠেকল। পরক্ষণেই হাত পড়ল নরম বক্ষচূড়ে। সংগে সংগে হাত টেনে নিয়ে এল। ক্লান্তি সত্ত্বেও মনটা কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল। পাপের সংগে নীরব সংগ্রাম আরও জোরদার হল। জোর করে তাকে মুখ খুলতে হল। মেয়েটির নাম যখন সে জানতে চাইল, তখন তার ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

—হেলেন। মেয়েটি বল্লে।

—শোনো, কেঁদো না। সান্ত্বনার সুরে বল্লে যুবকটি।

—কাঁদিনি তো! ইচ্ছে করলে, ওরা চলে না যাওয়া অবধি এখানে থাকতে পারো।

যুবকটি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। খেয়াল ছিল না যে অন্ধকারে তার কোন অংগভংগী মেয়েটি দেখতে পাচ্ছে না। তারপর আবার সে চুপ করে ব'সে রইল। চোখ জড়িয়ে আসছে ঘুমে। সহসা কনুইতে মেয়েটির স্পর্শ অনুভব করে ঘুমের ঘোর কেটে গেল।

—কত বয়স তোমার? মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল।

—একুশ বছর।

—আমি আঠারো। বিয়ে করেছো তুমি?

—না।

—কোন ভালবাসার মেয়ে আছে? সরলভাবে জিজ্ঞাসা করে মেয়েটি।

অন্ধকারের দরুণ আবার সে ছেলেটির মুখের ভাব দেখতে পেল না। মেয়েটি যতই এগিয়ে আসছে ততই খড়ের গদি চুরমুর করছে। কাছে এসে মেয়েটি আরও জোরে তার হাত চেপে ধরল।

—তোমার বাড়ী কোথায়? জানতে চাইল মেয়েটি।

—কভেণ্ট্রি—কনেক্‌টিকাটে।

এখন ছেলেটি প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে। কামবৃত্তি পুরাপুরি দমন করতে পারেনি বলে তার অর্ধচেতন মন কামনাব মাদকবসে মশগুল হয়ে আছে। যৌন লালসাব জাবকরসে ভেজান ক্লান্তি বড মধুবে লাগছে। কথা বলছে ফিসফিস কবে– ঠোট নড়ছে বলে মনে হয না।

—শুয়ে পড়ো। একটু চাপ দিযে মেয়েটি চিৎ করে শুইয়ে দিলে তাকে। সেও বাধা দিল না। খড়ের গদির উপর পা তুলে শুয়ে পড়ল। পাশে বসে মেয়েটি তার গালে টোকা দিতে লাগল। বেশ আবামে শুয়ে রইল ছেলেটি। যন্ত্রচালিতের মত তার কথার জবাব দিতে দিতে ঘুম ক্রমে গভীরতর হযে এল। একবাব আপত্তি করে ছেলেটি ব'লেছিল যে তার কাদামাখা জামা-জুতোয় বিছানা নোংরা হয়ে যাবে।

—আচ্ছা সেজন্য ভাবতে হবে না। হেসে উঠল মেয়েটি। তারপর নিজ হাতে জুতো খুলে দিল।

—কনেক্‌টিকাটে কোনদিন যাইনি আমি। জাযগাটা বুঝি খুব ভালো? জিজ্ঞাসা করে মেয়েটি।

—আমারও ঠিক মনে পড়ে না।

—তুমি কি কৃষক? মেয়েটি জান্‌তে চাইল।

—স্কুল মাস্টার।

—যাঃ! বিশ্বাস হয় না। মেয়েটির কণ্ঠস্বরে অকৃত্রিম শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠল।—সত্যি বলো! তাই?

—সত্যিই বলছি। আমি ইয়েল কলেজে পড়েছি। ছেলেটি বল্লে। কিন্তু এই মেয়েটির কাছে তার বিদ্যাবুদ্ধি জাহিব করবার কোন প্রয়োজনই যে ছিল না আধঘুমন্ত অবস্থায় সে খেয়াল একেবারেই হল না।

—যাঃ! একটু থেমে বল্লে মেয়েটি। —আমি লেখাপড়া একদম জানি না।

আধো-ঘুমে হেসে উঠল যুবকটি।

—সত্যি। কিচ্ছু লেখাপড়া জানি না। পড়তেও পারি না। উপাসনা-গৃহে লোকে ভগবানের কাছে যেমন ত্রুটি স্বীকার করে সান্ত্বনা পেতে চায়, তেমনি অকপটে ব'ল্লে মেয়েটি।

নিজগৃহের মদ্যশালায় বসে মোমবাতির ক্ষীণ আলোকে যক্ষ্মারোগজীর্ণ ন্যুব্জদেহ বেঁটেখাটো য়িহুদী সালোমন সলাপরামর্শ করতে লাগল। আর যখনই কাশ আসছিল, মুখের কাছে ক্যাম্ব্রিক্ রুমালখানা ধরে থুক করে গয়ের ফেলছিল। একটি স্কচ্ খালাসী, মোটাসোটা একটি ওলন্দাজ দোকানদার, ইংরেজী-না-জানা আহত একটি পোল্ এবং য়িহুদী উপাসনাগৃহের বৃদ্ধ কর্মচারী ছিল তার সংগে। শেষ হাতিয়ার হিসাবে সালোমন এক সর্বনাশা প্রস্তাব এনেছে। বিকাল থেকে সেই নিয়ে তুমুল বাকবিতণ্ডা চল্‌ছে। রাত দুপুর হয়ে এল, তবু এরা কোন সিদ্ধান্ত করে উঠতে পারেনি।

পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করে চুপ করে বসে ছিল তারা। সবাইর চোখ লাল। তারা জানে যে, শীগগিরই তাদের যে-কোন একটা সিদ্ধান্ত করতে হবে। বেশী বিলম্ব করা চলবে না। কিন্তু এই সাময়িক নীরবতায় তাদের চক্রান্তের তাৎপর্য, তার গোটা ছবিটা স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। বুঝতে পারল, বিষাক্ত ঘা সারা যায় না, তাকে উপড়ে ফেলা ছাড়া উপায় কি? নিউইয়র্ক আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর, সর্বোত্তম জাহাজঘাটা। খাদ্য আশ্রয় আরাম-বিলাসের সব কিছুই পাবে এখানে। কিন্তু এখন এই নিউইয়র্ক শত্রুর অধি-কারে। প্রাচীর ঘেরা বাসার মত এই শহরে স্থলপথে আসবার উপায় নেই ; কিন্তু বৃটেনের শক্তিশালী নৌবহর চিরকাল একে করায়ত্ত রাখতে পারবে। শত্রু-অধিকৃত এই শহর বিষকাঁটার মত চিরকাল আমেরিকার বুকে বিঁধে থাকবে : আর গোটা দেশ তারই বিষজ্বালায় ছটফট করবে।

একটা উপায় আছে। অনেকদিন ধরে ওয়াশিংটন সে কথা ভেবে এসে-ছেন। কিন্তু কংগ্রেস মত দেয়নি। নিষেধ ক'রেছে। দেশের প্রতিটি সাম-রিক পর্যবেক্ষক জানে, এছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। ওষুধ দিয়ে যে বিষাক্ত ঘা সারা যায় না, তাকে উপড়ে ফেলা ছাড়া উপায় কি? নিউইয়র্ক ধ্বংস করতে হবে—পুড়িয়ে ছাই করতে হবে। তাহ'লেই টোরী বিভীষণ দল এবং বৃটিশ-জার্মান আক্রমণকারীরা ঠেলা বুঝতে পারবে। কিছু নিরপরাধ লোক অবশ্য কষ্ট পাবে। কিন্তু বিপ্লবের জন্য ওটুকু মূল্য দিতে হবে

বৈ কি! বিপ্লব খেলা-খেলা ব্যাপার নয়। এ একমুখো রাস্তা। এ পথে যারা পা বাড়ায় তাদের পেছনে দাবানল জ্বলে ওঠে।

—পেছনে ফিরে তাকাবার জো থাকে না। নীরবতা ভেঙে সালোমন বলে।

ওলন্দাজ দোকানদারটি মাথা ঝাঁকিয়ে বল্লেঃ কিন্তু ধ্বংসের মধ্য দিয়ে তো কোন সমাধান হবে না।

—না, না! পেছনে ফিরে তাকাবার কোন উপায় নেই। বারবার বল্‌তে লাগল য়িহুদীটি।

দুপুর রাতের খানিকটা পরে নাথান হেলের ঘুম ভেঙে গেল। আল-কাতরার মত কালো অন্ধকারে চোখ মেলে সে কিছুই দেখতে পেল না। খড়ের উপর পাশ ফিরে শুয়ে কেমন-করে সে এখানে এল তাই মনে করবার চেষ্টা করল। অন্ধকারে মেয়েটিকে ভাল করে দেখতেও পায়নি। তাই তার কথা তেমন ভাল মনে পড়ছে না। তাছাড়া পিচের মত কালো আঁধারে এখন তাকে দেখবার চেষ্টা করাও নিস্ফল। মোজা-পরা পা দিয়ে খুঁজে সে জুতো-জোড়া পেল—পরলে। তারপর এই অন্ধকার গর্ত থেকে মুক্ত হাওয়ায় বেরিয়ে পড়বার আগ্রহে দরজার জন্য হাতড়াতে লাগল। আন্দাজ ভুল হল না। দরজা পাওয়া গেল।

কপাট খুলতেই খানিকটা নক্ষত্রের আলো ঘরে ঢুকল। তখন বুঝল, কোথায় সে ঘুমিয়েছিল। জানালাহীন খুপরি। বিছানা, একখানা চেয়ার এবং ঘরের কোণে একটা গোলমত জিনিস দেখে বুঝল যে, মেয়েটি তার সঙ্গে এক বিছানায় শোয়নি। গুরুঠাকুরেব মত তাকে আরামের জায়গাটি ছেড়ে দিয়েছে। এগিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে জাগাবার ভরসা পেল না। হাতড়াতে হাতড়াতে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। লজ্জায় দুঃখে তার দেমাক ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। একটানা হেঁটে চল্ল যুবকটি। সামান্য ঘণ্টা কয়েকের ঘুমে ক্লান্ত দেহের বিষ-বেদনা যেন আরও বেড়েছে। বারবনিতার বাড়ী থেকে ছ' সাতটি বাড়ী পার হবার সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পারল যে নিউ-ইয়র্কে আগুন লেগেছে।

প্রথম প্রথম আগুনের লেলিহান শিখা দেখে ভেবেছিল, ও তেমন কিছু নয়। কিন্তু ভীত ত্রস্ত নগরবাসীর চীৎকার ছুটাছুটিতে রাস্তায় যখন ভীড় জমে গেল, তখন সে বুঝতে পারলে যে বড় রকমের একটা কিছু ঘটেছে। তখন সেও অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে ছুটতে আরম্ভ করল। আপনা থেকেই

তার মনে হ'ল যে লোকজনের ভীড় ঠেলাঠেলি ও উত্তেজনার মধ্যেই সে সব-চাইতে নিরাপদ। শুধু তাই নয়। আগুনের লেলিহান শিখা তার মত তরুণকে স্বভাবতই উৎসাহে উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত করে তোলে। ইচ্ছে হল, স্বেচ্ছাসেবী অগ্নি নির্বাপক দলে মিশে আগুন নেভাবার ব্যর্থ প্রয়াসে যোগ দেয়। কভেণ্ট্রিতে এমন সুযোগ কখন-সখন পাওয়া গেছে। কিন্তু সেখান-কার ছোটখাটো অগ্নিকাণ্ডের চাইতে আজকের বৈশ্বানরের তাণ্ডব অনেক বেশী উত্তেজনাকর। রঙচঙা-উর্দিয়ালা সৈনিকদের ছুটাছুটি, বারবনিতাদের কলরব, কামানের বিপদসংকেত তোপধ্বনি এবং নগরবাসিদের আর্ত চীৎকার-চেঁচামেচি—সব মিলে আজকের দৃশ্য অনেক বেশী আকর্ষণীয় হ'য়েছে। আদ্যিকালের আগুন নেভাবার ব্যবস্থার দরুণ মফঃস্বল শহরেব আর দশজনের মত সেও বিশ্বাস করত যে বৈশ্বানর সর্বশক্তিমান, বড়সড় আগুনের কাছে মানুষ নিতান্ত অসহায়। কিন্তু সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভাবপ্রবণ মানুষ হঠকারিতা বশে এই দুষ্কর্ম করে বলে সে এর ঘোরতর বিরোধী ছিল।

সেকেলে ওলন্দাজ বাড়ীগুলি ততক্ষণে শুক্‌নো কাঠের মত দাউ দাউ করে জ্বলছে। লক্‌লকে আগুনের শিখা, কড়ি বরগা ও দেওয়াল পড়ার দুম্‌দাম্‌ ধুপ্‌ধাপ্‌ শব্দ দূর থেকে রণক্ষেত্রের সোরগোলের মত মনে হয়। অগ্নিশিখার দাপটে রাত দিন হয়ে গেছে। আলোকোজ্জ্বল পথেঘাটে নাইট-শার্টপরা নাগারিকদের ভীড় এবং সেই জনাকীর্ণ পথ দিয়ে হস্তচালিত পাম্প টেনে নিয়ে যাবার জন্য বৃটিশ সৈন্যের অক্লান্ত চেষ্টা দেখে তার ইতিহাসের একটি কাহিনী মনে পড়ল। প্রাচীন ইতিহাস পড়বার সময় প্রজ্জ্বলন্ত রোমের এমনি চিত্রই সে মনে মনে এ'কেছিল। রাজধানী রোম পুড়ে যাচ্ছে দেখেও সম্রাট নিরো বাঁশী বাজান থামাননি। কিন্তু রোমেব সে আগুনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের একটি যুগ খতম হয়ে যায়। আকস্মিক উল্লাসে উদ্দীপ্ত হয়ে হেল ভাবল যে আজিকার অগ্নিকাণ্ডও যুগান্তের ইংগিত। উত্তেজনা ও হুড়াহুড়ির মধ্যে সে সঙ্গীদের চরম পবাজয়েব কথা ভুলে গেল। মনে হল, বৈশ্বানবের দাপটের কাছে বিজয়ী বৃটিশেবা কত ছোট, কত অসহায়। চোখের উপর বিজিত শহর পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে দেখেও কিছুই করতে পারছে না।

সেই সময় মাইল কয়েক উত্তরে, রবার্ট হ্যারিসন ঘুম থেকে ডেকে তুলল ভার্জিনিয়ানকে। আলোকোদ্ভাসিত দক্ষিণ আকাশের দিকে মুখ করে দুজনেই এসে দাঁড়াল জানালার কাছে। ঘুমের ঘোর তখনও পুরাপুরি

কাপ্টেন। দক্ষিণ আকাশে কেন এই অপূর্ব অপার্থিব আলোকচ্ছটা দেখা যাচ্ছে, তার কারণ কেউই ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারছিল না। যতটা সম্ভব নিরুত্তেজ কণ্ঠে হ্যারিসন বল্লেঃ ভাবসাব দেখে আমার মনে হয় স্যর, নিউ-ইয়র্কে আগুন লেগেছে। এত বড় আগুন জ্বলে উঠবার মত কিছুই নেই আমাদের লাইনে।

এই কথা শুনে কমান্ডারের মুখে আনন্দ উৎসাহ কিম্বা হতাশার ভাব ফুটে ওঠে কিনা দেখবার জন্য ঘাড় বাঁকিয়ে তলচোখে তাকাল হ্যারিসন। কিন্তু তাঁর মুখ ভাবলেশহীন, পাথরের মূর্তির মত স্থির। বল্লেনঃ দেখুন তো মিঃ হ্যারিসন, আমার ঘোড়াটা প্রস্তুত আছে কিনা?

ঘোড়ায় চড়ে বড় আদমী যতই দক্ষিণে এগুচ্ছেন ততই লক্ষ্য করছেন যে আলোকচ্ছটা যেন বেড়ে চলেছে। হার্লেমে পৌঁছে মনে হল, দক্ষিণ আকাশে অরুণোদয় হ'চ্ছে। প্রথমে ভেবেছিলেন, হয়ত কোন একটা বড় বাড়ীতে আগুন লেগেছে, না হয় সেউ হয়ত নদীতে নোঙর-করা শত্রুর এক-খানা অতিকায় রণতরীতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এখন বুঝতে পারলেন যে গোটা শহর দাউ দাউ করে জ্বলে না উঠলে সারা আকাশ এমনি-ভাবে উদ্ভাসিত হতে পারে না। তাঁর অভিপ্রায় এমনিভাবে সিদ্ধ হয়েছে দেখে মনে মনে বেশ খুশীই হলেন : তবু সঠিক সংবাদ না পেয়ে কোনরকম ভাবপ্রকাশ করবেন না বলে স্থির করলেন।

হলোওয়ের উত্তরে একটা নেড়া পাহাড়ের মাথায় তিনি ঘোড়া থেকে নাম-লেন। একে একে তাঁর স্টাফের সবাই এসে সেখানে জমায়েৎ হল। নক্স, পুটনাম, মিফলিন, স্পেন্সার, গ্রীন, রীড্, স্মলউড এবং আরও জনবারো এসে ঘেঁষাঘেঁষি করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। এই বিভীষিকাময় ধ্বংসের মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে তাদের মধ্যে সব চাইতে মুখর লোকও হতবাক হ'য়ে গেছে। এদের মধ্যে জনাকয়েক ধার্মিক, অধিকাংশ যুক্তিবাদী এবং দু'একজন নাস্তিক। কিন্তু সব চাইতে অবিশ্বাসীও এই বিভীষিকার সামনে দাঁড়িয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা এই ধ্বংসের ছবির দিকে চেয়ে রইল। অগ্নিশিখায় প্রোজ্জ্বল নক্ষত্রখচিত আকাশ ক্রমে পাণ্ডুর কুয়াশায় ঢাকা প'ড়ল : বৈশ্বানরের ভয়াল মূর্তি ধীরে নির্মেঘ পূব-আকাশে দিনকরের রূপ পরিগ্রহ ক'রল।

আবার সেই রঙচঙ্‌মাখা বেঁটে বারবনিতাটির কথা যখন নাথান হেলের মনে প'ড়ল, তখন তাকে খুঁজে বার করা অসম্ভব। বড় দেরীতে কথাটা মনে পড়েছে। তবু প্রাণপণে সে মেয়েটির বাসার গলি খুঁজে বার করবার জন্য ছুটোছুটি করল। দৌড়োদৌড়ি করতে গিয়ে বহু হোঁচট খেল, গা-হাত-পা ছড়ে গেল, ভীড় ঠেলে যাবার চেষ্টা করল, দু'একটা লাল-উর্দিয়ালা সৈনিক-কেও কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল, কিন্তু কোন লাভই হল না। কিছুতেই মেয়েটির জানালাহীন খুপরি বার করা গেল না। যেদিকে গেল সর্বত্রই আগুনের লেলিহান শিখা তার পথ রোধ ক'রে দাঁড়াল।

অবশেষে চেষ্টা ছেড়ে দিল। বেদম রাগ হল শহরের সব কিছুর উপর। মনে মনে বল্লেঃ এখন সরে পড়া দরকার। অনেকক্ষণ কাটিয়েছি শহরে। দেখাশোনার যা তাও সেরেছি। এখন খসে না পড়লে সন্দেহ করবে।

জনতার ভীড় ও আগুন ছেড়ে সে উত্তরমুখো হাটতে শুরু করল। কিন্তু এত ক্লান্ত যে চলবার ক্ষমতা ছিল না। একটা খড়ের গাদা দেখে হাত দিয়ে তার মধ্যে গর্ত করে নিয়ে সে ব'সে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়তে বিলম্ব হল না। ক্লান্তির অবসাদে একটু পরেই গভীর ঘুমে এলিয়ে পড়ল।

ভোরবেলা যখন ঘুম ভাঙল, আগুন তখনও জ্বলছে। ইতিমধ্যে আরও কাছাকাছি এসেছে। কিন্তু দিনের আলোয় তেমন বিভীষিকাময় মনে হচ্ছে না। মাথা ও পোশাক থেকে খড় ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল নাথান। খড়ের গাদার মালিক তাকে চালা থেকে বেরুতে দেখে বেশ দু'চার কথা শোনাল। কিন্তু সে টু শব্দটি করল না। একটা বারকোষ থেকে খানিকটা জল খেয়ে, সেই জলেই মুখ-মাথার কালি-ঝুলি ঘষে সাফ করে আবার উত্তর-মুখো হাঁটিতে শুরু করল।

এখন আর গত রাত্রির মত উত্তেজিত আধপাগলা জনতার সংগে দেখা হচ্ছে না। এখানকার লোকজন অনেকটা প্রকৃতিস্থ : তাই আরও ভয়ংকর। ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে। এখন এরা যে কোন রকম প্রতিহিংসা নেবার তালে আছে। আগুন নেভাবার সাধ্য এদের নেই। কিন্তু বিদ্রোহীরা এখনও শহরে রয়েছে। তাদের উপর রাগের ঝাল মেটান যেতে পারে! পথ চলতে চলতে একবার হেল পথিপার্শ্বে এক বৃদ্ধ য়িহুদীর মৃতদেহ দেখতে পেল। আবার দেখল যে এক নিরীহ গোবেচারার গলায় ফাঁস পরিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আর বেচারী আর্তনাদ করছে।

শহরের উপকণ্ঠে এসে সে আরও সন্তর্পণে চলতে শুরু করল। কিন্তু

একটু বাদেই বুঝল যে, শহর থেকে বেরুবার প্রতিটি রাস্তা এবং পায়ে চলার পথে বৃটিশ সৈনিক পাহারা দিচ্ছে। অনেকবার সে নিউইয়র্ক ছাড়িয়ে উত্তর-দিকে পালাবার চেষ্টা করল ; কিন্তু প্রতিবারেই সতর্ক প্রহরী দেখে দ্বিগুণ জোরে পেছু হটে আসতে হল। নির্গমনের পথ রুদ্ধ দেখে নিজেকে ফাঁদে-পড়া জানোয়ারের মত অসহায় মনে হল। ধোঁয়া লেগে চোখ লাল হয়ে ইতি-পূর্বেই জল গড়াচ্ছিল; এখন মাথা গুলিয়ে শ্রমে শংকায় দরদর করে ঘাম বেরুল। একবার গা ঢাকা দিতে গিয়ে তাকে পাথরের প্রাচীর টপ্‌কে একটা মোরগের ঘরে আশ্রয় নিতে হল। মুরগীগুলো এমন কক্-কক্ শুরু করে দিল যে ধরা পড়বার ভয়ে তিলমাত্র বিলম্ব না করে বেড়ার কোলঘেঁষে হামা-গুড়ি দিয়ে সে একটা জংলা জায়গায় লুকল। অদূরেই শীর্ণ একটি স্রোতস্বতী ছিল। উপুড় হয়ে শুয়ে পেট ভরে জল খেয়ে নিল নাথান। তারপর গাছের আড়াল দিয়ে অতি সন্তর্পণে একটি আপেল বাগিচা পার হয়ে সে প্রশস্ত একটা মাঠের প্রান্তে দাঁড়াল। বড় রাস্তা এখান থেকে পোয়া মাইল বাঁয়ে। এতদূর থেকেও বৃটিশ টহলদারের চটকদার লাল-উর্দি মালুম হয়। মাঠটা কোনমতে পার হতে পারলেই নিশ্চিন্ত। প্রান্তরের উত্তর প্রান্ত থেকে হয়ত একটানা জংগল চলে গেছে হলোওয়ে অবধি। একবার ওদিকে যেতে পারলেই হয়। উবু হয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল হেল।

মাঠ প্রায় পার হয়-হয় এমনি সময় সে একদল প্রহরীর নজরে পড়ল। সংগে সংগে এক ঝাঁক গুলী তেড়ে এল। মোড় ফিরে সে ডানদিকে দৌড় দিল। বনের প্রান্তে দেখলে একদল লাল-উর্দিযালা। তখন আবার মোড় ঘুরে বাঁয়ে ছুটতে শুরু করল। কিন্তু সে পথও সবুজে-উর্দিয়ালারা রোধ করেছিল। নিরুপায় হয়ে তখন সে পেছন ফিরে দৌড় দিল। কিন্তু ততক্ষণে চারজন বৃটিশ অশ্বারোহী তাকে ধরবার জন্য জোর কদমে ছুটে আসছে।

জেনারেল হাউ-র সদর ঘাটিতে মেজর রুড্‌লি ক্রেয়ারের সামনে হাজির করা হল ছেলেটিকে। ছিন্নভিন্ন কোট, গালে টানা একটা কাটার দাগ নিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল নাথান হেল। মাঝে মাঝে তার পুরু ঠোঁটদুখানি সামান্য কেঁপে উঠছে। মেজর ক্রেয়ার টেবিলের ওধারে বসেছিলেন। চোখেমুখে বিরক্তির ভাব। সামনের টেবিলের উপর কতগুলো হাতেলেখা কাগজের টুকরো এবং কাঁচা হাতে আঁকা কয়েক টুকরো মানচিত্র। বিরক্তির সুরে মেজর ক্রেয়ার প্রশ্ন করলেনঃ এ সব তোমার হাতের লেখা অস্বীকার করতে চাও?

—না স্যর। আমার কাছেই পেয়েছে এগ্নলো।

—বেশ লিখতে জানো দেখছি।

—আমি ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাশ করেছি। ছেলেটির কণ্ঠে একটু আত্মশ্লাঘার ভাব ফুটে উঠল।

—বটে! আমি তোমাদের মফঃস্বলের শিক্ষাকেন্দ্রগ্নলো খুব পছন্দ করি। নাম কি তোমার?

—ক্যাপ্টেন নাথান হেল।

—পদবীর কথা পরে হবে। কোন রেজিমেণ্ট?

—কর্ণেল নোলটনের কনেক্‌টিকাট রেঞ্জার্স স্যর!

—রেঞ্জার্স! হায় পোড়াকপাল, ভিখারীর মত ভেকই যে দেখতে হলো! হাঁ, তোমাদের রেজিমেণ্ট এখন কোথায়?

—জানিনে স্যর!

—জানো না! মেজরের কণ্ঠস্বরে ধৈর্যচ্যুতির লক্ষণ টের পাওয়া গেল। চুলোয় যাক সব বাজে কথা। শোনো, তুমি গ্নপ্তচর। কি বল্লাম বুঝতে পারলে?

ছেলেটি মাথা নাড়ল, কিন্তু এই আকস্মিক উপলব্ধিতে তার চোখ ছলছলিয়ে উঠল।

—কথা বাড়িয়ে লাভ নেই! অসামরিক পোশাক—পকেটে এই সব কাগজপত্তর, নিয়ে যাও- একে গুলী করে হত্যা করবে!

উর্দি নেই আমাদের। কারও নেই! অসহায়ের মত বল্লে ছেলেটি। মেজর দু' এক মিনিট নীরবে কাগজের টুকরোগ্নলো আঙ্নল দিয়ে নাড়াচাড়া করলেন; তারপর পাশে দাঁড়ান সার্জেণ্টটির দিকে চেয়ে বল্লেনঃ কানিংহামের কাছে নিয়ে যাও। কাল সকালে ফাঁসি দেবে।

পরদিন নির্মেঘ সুনীল আকাশে সূর্যোদয় হল। ফুরফুরে হাওয়া বইছে। চারিদিক পাখীর কলরবমুখর। সবুজ ঘাস বালসূর্যে ঝলমল করছে। হাওয়ার দোলা লেগে মেপ্‌ল পাতার অপূর্ব রক্তরাগ দিচ্ছে চোখ ধাঁধিয়ে। এমনি সুন্দর প্রভাতে ফাঁসি দেখবার জন্য সমবেত জনতার প্রায় সকলেই আবহাওয়ার তারিফ করল। কেননা বছরের এমনি সময়ে শত সহস্র মাইল পশ্চিমের দীর্ঘশ্বাস বয়ে এনে হুহু করে ঝড়ো হাওয়া হাড্‌সন্ নদীর বুকে

ফেনিল ঢেউয়ের মাতন জাগিয়ে নিউইয়র্ক শহরে এমন আবহাওয়া সৃষ্টি করে যে, দুনিয়ার কোথাও হয়তো তার জুড়ি মিলবে না।

ড্রাম বাজনার সঙ্গে সঙ্গে হেল যখন বাইরে এল, মনে মনে ভগবানের কাছে সে একটিমাত্র প্রার্থনাই জানালঃ আমায় ভয় জয় করবার শক্তি দিও ভগবান! যে ভয়ে ব্রুকলিন থেকে পালাতে হয়েছে...যে ভয়ে আবার তারা নিউইয়র্ক থেকে পালিয়েছে . যে ভয় তাদের পৌরুষ মর্যাদা ও আদর্শের অবমাননা করেছে যে ভয়ে ফুটফুটে বালিকারা আত্মবিক্রয় করে রূপজীবিনী হয়. .যে ভয়ে তিন হাজার মাইল সাগর পাড়ি দিয়ে তাদেরই সমভাষাভাষী মানুষ এসেছে তাদের স্বপ্নসাধ ভেঙ্গে চুরমার করে দেবার জন্য, মনে মনে ভগবানের কাছে সে ঐকান্তিক প্রার্থনা জানাল যে, এমনতরো সমস্ত ভয় যেন তার মন থেকে মুছে যায়। হাত মুঠো করে একবার টান হয়ে দাঁড়াল হেল। বোতলের ছিপি এঁটে তার সমস্ত হৃদয়দৌর্বল্য যেন আটকে রাখল। তার-পর ধীর পদক্ষেপে সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে চল্ল।

আরক্ত গাল, নীল চোখ, উসকো-খুসকো চুলে নাথান হেলকে নাবালক বলে মনে হচ্ছিল। হাসবার চেষ্টা করছিল ছেলেটি। প্রত্যাসন্ন মৃত্যুমুখী বালকের মুখে কষ্টকল্পিত বিষণ্ণ হাসিরেখা তাকে মর্মান্তিক করুণ পৌরুষ-মণ্ডিত করে তুলল। ছোট্ট তার জীবনস্মৃতির কোন কথাই সে স্মরণ কর বার চেষ্টা করল না। জীবনে একটিমাত্র নারী তার কাছে আত্মসমর্পণ করে প্রত্যাখাত হয়েছে। সেই মেয়েটির কথাও মনে এল না। না ভাবলে বাপ মা কিম্বা পল্টনে আসবার সময় কভেণ্ট্রির সরল পল্লীবাসীর বিস্ময়বিমুগ্ধ চাহনির কথা। এমনকি এই উন্মুক্ত হাওয়া, নীল আকাশ ও সবুজ ঘাসের সঙ্গে যে তার শেষ দেখাশোনা হচ্ছে সে খেয়ালও ছিল না।

কিন্তু শেষ অবধি সব কিছুই ওলট পালট হয়ে গেল। সে বাঁচতে চায়! মনে প্রাণে সে উপলব্ধি করল যে, সে বাঁচতে চায়—আবার ফিরে যেতে চায় বিপ্লবী সাথীদের কাছে। বিপ্লব নামে এক অপরূপ প্রলয়ংকর রহস্যাবৃত ইষ্টের সাধনায় ব্রতী হয়েছে যে ছিন্নবাস দুঃসাহসী দল, নাথান ফিরে যেতে চায় সেই সহকর্মিদের সাদর বাহুবেষ্টনে। কিন্তু আরক্ত-গাল, হাসিমাখা মুখ এক বালকের ফাঁসি দেখবার জন্য নিউইয়র্কের যত ভদ্রলোক জমায়েৎ হয়েছিল, তাদের কেউই বুঝল না কি মর্মান্তিক অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছে ফাঁসির মঞ্চের সামনে-দাঁড়ান এই তরুণ বিপ্লবীর মনে।

[illegible] ভয় পায়নি

জ্বলন্ত উল্কার মত জেনারেল চার্লস্ লী দক্ষিণাঞ্চল থেকে হলো-ওয়েতে পরাভূত আজাদী বাহিনীর সম্মুখে হাজির হলেন। তাঁর আগমনের প্রত্যাশায় দিন গুণছিল সৈনিকেরা। কয়েক সপ্তাহ ধরেই প্রতীক্ষা করছিল তাঁর আসবার। জেনারেল লীর যোগ্যতা সম্পর্কে নয়া-ইংলণ্ডবাসী ও দক্ষিণীদের কোন মতভেদ ছিল না। বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে দক্ষিণীদের কথায় সায় দিয়ে তারাও স্বীকার করত যে, সৈনিক ও সমরনেতা হিসাবে ভার্জিনিয়ার শিয়াল-শিকারীর মধ্যে যে যে গুণপনার অভাব ছিল, মিঃ লী তার সব কটির অধিকারী। চার্লসটাউনে যেভাবে তিনি ইংরেজদের প্রতিহত করেছিলেন, সবাই পঞ্চমুখে প্রশংসা করত সেই কৃতিত্বের .পড়ে শোনাত তাঁর সামরিক ভবিষ্যদ্বাণী ..ধুলোর পর লিখে রাখত তাঁর রণকৌশল উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করত তাঁর সাহসের...তারিফ করত তাঁর চাতুরীর। বিপ্লবী জনতার মধ্যে সব চাইতে অপদার্থ ভীরু ইয়াংকি ভাঁড়ও দেমাক দেখিয়ে ব'লত যে, জেনারেল লী'র নেতৃত্বাধীনে সেও তামাম দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ লড়িয়েদের একজন হতে পারত। যত দোষ যত ভুলচুক তার সব দায়িত্ব ইতিমধ্যেই এরা শিয়াল-শিকারীর কাঁধে চাপিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বলেছে যে জেনারেল লী যদি নেতা হতেন তাহলে সবকিছু অন্যরকম হত--আজকের এ দশা কিছুতেই হত না।

মনে মনে শিয়াল-শিকারীও এদের অনেক কথা স্বীকার করতেন। বেশ ভালভাবেই তিনি জানতেন যে, সমরনেতা হিসাবে যে এলেম জর্জ ওয়াশিংটনের নেই, চার্লস্ লী'র তা আছে। চার্লস লী'র উপর তাঁর শ্রদ্ধার মধ্যে কোন খাদ ছিল না। এ শ্রদ্ধা ছিল গভীর অকৃত্রিম। ঠিক এমনি শ্রদ্ধাই তিনি করতেন, তাঁর ভাই লরেন্স ওয়াশিংটনকে। তিনি যা নন লরেন্স ছিল তাই। যে যে গুণপনার কদর তিনি করতেন, এই সদালাপী বিনয়ী অথচ চরম দুঃসাহসী ভ্রাতার মধ্যে তার সব কিছু ছিল। পুরোদস্তুর জননেতা ছিল লরেন্স। শঙ্কা-সংকোচের পরোয়া না করে তামাম দুনিয়ার যে সব লোক

অকুতোভয়ে আপন লক্ষ্যের দিকে দৃঢ়পদে এগিয়ে গেছে, তেমনি সমস্ত শ্রেষ্ঠ ও ভাস্বর ব্যক্তিকেই তিনি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা করতেন। এই সংকটের দিনে ক্রমাগত তিনি লী'কে পত্র লিখে সব কথা জানিয়েছেন ; এবং বিজ্ঞের উপদেশজ্ঞানে শিরোধার্য করে নিয়েছেন তাঁর পরামর্শ। কিন্তু লী'র প্রতিটি পত্র তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তাঁর অপদার্থতা এবং লী'র শ্রেষ্ঠত্বের কথা।

আজ এতদিন পরে সেই লী হার্লেমে আসছেন।

ভার্জিনিয়ানের সংগে অকাতরে নরকে যেতে যারা প্রস্তুত, তাদের মধ্যে অনেকেই লী সম্পর্কে তাঁর সংগে একমত হতে পারেনি। তাতে অবশ্য এমন কিছু এসে যায় না! নক্স সরাসরিই লী সম্পর্কে বিরক্তি প্রকাশ করত। পুটনামও খোলাখুলিই বিদ্রূপ করতেন। গ্রীন বলত যে বাঁধা-ধরা ছকের মধ্যে লী'র উপর সব ছেড়ে দিতে তার আপত্তি নেই : কিন্তু তা না হলে নয়। রীড্ বলত যে, চার্লস্টাউনে ইংরেজদের পরাভবের পেছনে লী'র কৃতিত্ব যতটা ছিল, তার চাইতে আনুষংগিক কতকগুলো বিষয়ের গুরুত্ব ছিল অনেক বেশী। কিন্তু এদের মতামত ওয়াশিংটনের আস্থা টলাতে পারেনি। তিনি জানতেন যে তাঁর সামরিক বুদ্ধিমত্তার জন্য এরা তাঁকে শ্রদ্ধা করে না। এ শ্রদ্ধার কারণ ভিন্ন।

চার্লস লী ভারিক্কিচালে যখন হার্লেম পাহাড়ের সেনাব্যূহে প্রবেশ করলেন, আজাদী ফৌজের মধ্যে যারা ইতিপূর্বে তাঁকে দেখেনি তাদের অনেকেই তখন তাঁর চেহারা, ভাবসাব এবং সংগের দশ-বারোটা কুকুর দেখে বেশ খানিকটা অবাক হল। এদের সকলেই কুকুর পোষে। একটা, দুটো, এমন কি তারও বেশী, দু'চারটে শিকারী কুকুর কারও কারও ছিল। কিন্তু ডজনখানেক কুকুর নিয়ে কোন জেনারেল রণক্ষেত্রে চলাফেরা করবে—এ তারা ভাবতেই পারে না। কেউ লী'র কাছে গেলে কুকুরগুলো এমন মারমুখো হ'য়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করত যে তাঁর কথা শোনা কঠিন।

লোকটার চেহারাও অস্বাভাবিক। বেশ লম্বা হাড্ডিসার চেহারা। ওয়াশিংটনের চেহারাও হাড়ের উপর চামড়া জড়ান। কিন্তু লী'র সংগে তাঁর শীর্ণতার তফাৎ আছে। ওয়াশিংটনের মাংসহীন মোটামোটা হাড় উর্দি পরলে ঢাকা পড়ে। কিন্তু লী লতার মত লিক্‌লিকে লম্বা...ঋজু ঢালু তাঁর কাঁধ...পাছা নেই বললেই হয় ..শুঁয়োর মত বিশীর্ণ হাত ..লম্বা নাক ..ছোট্ট মুখের হা . থুতনিও নেই বললেই চলে। চোখ পিটপিট্ করে চেঁচিয়ে ছাড়া

কথা বলে না লোকটা। উচ্চারণের ধরণ অনেকটা ইংরেজ বাবুদের মত। আর একটা ইংরেজীয়ানাও ছিল লী'র চরিত্রে। যতটা তিনি দেখতে চাইতেন ব্যস্, শুধু সেইটুকুই তাঁর নজরে পড়ত: আর কিছু না,...তা সে জিনিস কয়েক শ' হাত দূরে হোক কি নাকের ডগায় হোক।

চেহারা যতটা আজগুবিই হোক্ না কেন, সৈনিক হিসাবে লী চমৎকার একথা স্বীকার করতেই হবে। তাঁর মত অত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সৈনিক আমেরিকান বাহিনীতে একজনও ছিল না। লী হচ্ছেন সেইসব অদ্ভুত লোকের একজন যারা লড়াইয়ে মানুষ হয়েছে। এই প'য়তাল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে পল্টনের জীবন ছাড়া অপর কোন জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর হয়নি। কেউ কেউ যেমন ছবি আঁকে, আবার কেউ যেমন কসাইগিরি করে, তিনিও তেমনি সৈনিকবৃত্তি নিয়েছেন। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে লড়াই তিনি করতেন না। কোন আদর্শের জন্য, যুক্তি তর্ক দিয়ে কোন কিছু বিশ্বাস করে তার জন্য, কিম্বা খেয়ালের বশে কোনদিন তিনি লড়াই করেননি। কোন অন্যায় করবার জন্য, কিম্বা কোন অন্যায়ের প্রতিবিধানের জন্যও কোনদিন সংগ্রাম করেননি লী। তিনি লড়াই করতেন, যুদ্ধকে তিনি বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন বলে। তবে সব সময়ই যে সর্বোচ্চ ডাকে নিজেকে বিকিয়ে দিতেন তাও নয়। খ্যাতি ও পদমর্যাদার দিকে তাঁর বেশ নজর ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও আদর্শের বালাই কোন কালেই তাঁর সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করত না।

চার্লস লী বড়াই করতেন যে, এগার বছর বয়সে তিনি বৃটিশ বাহিনীতে কমিশন পেয়েছিলেন। কথাটা হয়ত মিথ্যে নয়। লী জন্মসূত্রে ইংরেজ--এক বৃটিশ অফিসারের পুত্র। কিন্তু পল্টনের জীবনের পূর্বেকার কোন স্মৃতিই তাঁর স্মরণ নেই। দুনিয়ার প্রায় সর্বত্রই তিনি লড়াই করতে গিয়েছেন। পর্তুগালে যুদ্ধ করেছেন, পোল্যাণ্ডে করেছেন, আমেরিকাতেও করেছেন ফরাসী যুদ্ধের সময়। এক কথায় দুনিয়ার যেখানেই কামান-বন্দুকের ডাক পড়েছে সেখানেই চার্লস লী হাজির। আমেরিকায় আবার যখন তিনি ফিরলেন, প্রধান সেনাপতির ঠিক নীচেই তাঁকে একটি সামরিক পদ দিতে চাওয়া হল। পদগ্রহণের পূর্বে লী কবুল করিয়ে নিলেন যে তাঁকে ত্রিশ হাজার ডলার দিতে হবে। দামটা অবশ্যই চড়া। কিন্তু কি করা যায়? একাধারে সুশিক্ষিত সৈনিক এবং ইংরেজ ভদ্রলোক তো আর গাছে গাছে ফলে না! যে দাম তিনি হাঁকলেন, তা-ই মেনে নেওয়া হল। এ-সত্ত্বেও বহুলোক

মনে করত যে, বিনি-পয়সার ভার্জিনিয়ার শিয়াল-শিকারীর চাইতে ত্রিশ হাজার ডলারের বিনিময়ে ভাল বিকিকিনি করা হয়েছে।

বৃটেনের যত খ্যাতিলোভী ভাগ্যান্বেষী সৈনিক এদেশে আসত শুধু বসবাসের জন্য নয়, মধ্যদেশের ভুতুড়ে চাষাভূষা এবং নয়া-ইংলণ্ডের নাকীসুর কৃষকেরা সকলেই তাদের খানিকটা সমীহ করত। জেনারেল লী'ও এ শ্রদ্ধার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তাঁকে এরা ঠিক পছন্দ করতে পারেনি। বড়াই করতে এরা সবাই ওস্তাদ। কোণঠাসা হয়ে পড়লে গলাছেড়ে চেঁচিয়ে এরা নিজেদের কথা প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করে। কিন্তু চার্লস্ লী'র দেমাক ও বাগাড়ম্বরের কাছে এদের বড়াই ম্লান হয়ে যেত। ত্রিশ হাজার ডলার তাঁর দাম। এই চড়া দামের কথা সব সময় সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিতেন লী।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে শিয়াল-শিকারী মরিশ-ভবনকে সদরঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করছেন। লী এ নির্বাচন অনুমোদন করলেন। চুরুটের বাক্স থেকে কালো মোটা মোটা চুরুট নিয়ে তিনি পকেট ভরতি করলেন। উঠতে-বসতে গালমন্দ করে নিরীহ বিলিকে অস্থির করে তুললেন। দক্ষিণাঞ্চলে থাকবার সময় নিগ্রোদের প্রতি এই ঘৃণ্য আচরণ করবার অভ্যাস তিনি ভাল-ভাবেই রপ্ত করে নিয়েছেন। শিয়াল-শিকারী সযত্নে মরিশ-ভবনের সবুজ লনটি অক্ষত রেখেছেন। কিন্তু লী অবজ্ঞাভরে তার উপর লাথি মারতেন; কুকুরগুলো ছেড়ে দিতেন বসবার ঘরে। ঘেউ ঘেউ করে নির্বিবাদে তারা ঘুরে বেড়াত মরিশ-ভবনের আসবাবপত্র সাজান মনোরম বৈঠকখানায়। ঠাণ্ডা খাবার-ঘরে নিজের সঙ্গেই খাওয়াতেন কুকুরগুলোকে। ডিনার-টিবিলে গান-বাজনা খোসগল্পের মাঝে মাঝে লী এমন দু'চারটে অশ্লীল রসিকতা করতেন যে লজ্জায় ঘৃণায় অন্যান্য সেনানীদের কান লাল হয়ে উঠত। তাদের কেউই এমনি সহবতে বড় হয়নি—হজম করতে পারবে কেন? কিন্তু ভার্জিনিয়ান লী'র সমস্ত আচরণ অম্লানবদনে সয়ে গেছেন।

সদর ঘাঁটিতে পেঁছুবার ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই লী সমর-মন্ত্রণাসভার বৈঠক ডাকতে বল্লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলেন তাঁর মতে কোন্ কোন্ সেনানী এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবে। একে একে সেনানীরা এসে মরিশ-ভবনের খাবার-ঘরে হাজির হল। কারও মধ্যে তেমন উৎসাহ বা আগ্রহের ভাব ছিল না। কমাণ্ডারের আসনে লী'কে বসা দেখে সকলেই চমকিত হল। পানপাত্রে যখন মাদেরা ঢালা হল, লী-ই টোস্টের প্রস্তাব করলেন। যখন আলোচনা শুরু হ'ল, কথার সূত্র ধরে লী একাই বকে চল্লেন।

আলোচনা প্রথমে খানিকটা সরগরম হলেও খানিকবাদেই মিইয়ে গেল। প্রথম দিককার উত্তাপ-উত্তেজনা হ্রাস পেয়ে ক্রমে শান্তভাব দেখা দিল। ওয়াশিংটন কোন কথা বল্লেন না। নীরবে স্থির হয়ে বসে রইলেন। আলোচনা-সূত্রে অতীতের বহু তিক্ত স্মৃতি জেগে উঠল। মোমবাতির আবছা ছায়ায় মনের কপাট বন্ধ করে স্থির হয়ে বসে রইলেন প্রধান সেনাপতি। বৈঠকে তিনি উপস্থিত আছেন কি নেই, তাও বুঝবার জো রইল না।

মুখ খুলেই লী বর্তমান পরিস্থিতির রূঢ় সমালোচনা করলেন। কঠোর ব্যঙ্গ করে বলে বসলেন যে শক্তিশালী নৌবহর ছাড়া নিউইয়র্ক রক্ষা করার প্রয়াস নিছক মূঢ়তা। কথাটা বহুদিন ধরে উপস্থিত সেনানীদেরও অনেকেরই মনে হয়েছে। এই অবস্থায় সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন সমরনেতা যে পন্থা অবলম্বন করে, ইংরেজ সেনানী যদি সেই পথে এগুত, তাহলে মুষ্টিমেয় আমেরিকান পল্টনের যে কি শোচনীয় অবস্থা হত, ইনিয়ে-বিনিয়ে নানা ভাব-ভঙ্গী করে লী উপস্থিত সেনানীদের তার বিশদ বর্ণনা শুনিয়ে দিলেন। এই শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কে তাঁর বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। কারণ যুদ্ধকে তিনি বিজ্ঞান বলে গণ্য করতেন। বৃটিশদের রণনীতিকে যতটা তুচ্ছতাচ্ছিল্য তিনি করতেন, তার চাইতে অনেক বেশী তারিফ করতেন নিজের বুদ্ধিমত্তার। এই অহমিকার জন্যই উপস্থিত সেনানীরা চটে গেল।

—চুলোয় যাক সব! খেঁকিয়ে বল্লেন লী।—এখুনি আমাদের এই মরণ-ফাঁদের বাইরে যেতে হবে। এছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। ঐ নিরেট গলদা চিংড়ি ব্যাটারা একবার যদি বুদ্ধি করে নদীর উজানে একখানা জাহাজ পাঠিয়ে কিংস-ব্রিজ তাক করে তোপ দাগে, তাহলে চিরকাল আমাদের এই নরকে পচে মরতে হবে।

সেনানীরা বুঝল যে লী ঠিক কথাই বলেছেন এবং সেইজন্যই তারা খেঁকিয়ে উঠল।

—হপ্তার পর হপ্তা আমরা তাদের রুখেছি। ঝাঁজি মেরে বলে উঠলেন পুটনাম।

—অত সহজ হলে তারা হলোওয়ে দখল করলেই পারে। করে না কেন? রীড্ জিজ্ঞাসা করে।

সঙ্গে সঙ্গে গ্রীন স্মরণ করিয়ে দেয়ঃ ওয়াশিংটন কেল্লা দখল করতে পারে এমন সাধ্য কারও নেই। মাত্র দশজন গোলন্দাজ অনন্তকাল কেল্লা রক্ষা করতে পারে।

—হায় রে গবেটের দল! ভেঙ্‌চে উঠলেন লী।—মাত্র দশজন সৈনিক এক-ঘণ্টার মধ্যে কেল্লা থেকে তোমাদের নয়া ইংলণ্ডের অপোগণ্ড ভূতগুলোকে তাড়িয়ে দিতে পারে।

কথা কাটাকাটি বেড়ে চল্ল: সঙ্গে সঙ্গে উত্তাপও। মাঝে একসময় হাতাহাতির উপক্রম হল। থাব্‌ড়ে কিলিয়ে তারা শীর্ণ টেবিলখানা কাঁপিয়ে তুল্ল। দু'চারবার দ্বন্দ্বযুদ্ধের চ্যালেঞ্জও হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত গালাগাল শুরু হল। কিন্তু এ সত্ত্বেও বড় আদমী চুপ করে বসে রইলেন, কোন মতামত প্রকাশ করলেন না। লী এদের কাউকেই চিনতেন না। এমন সৈনিক কোথাও দেখেননি তিনি। যত সৈনিক দেখেছেন, তাদের কারও সঙ্গে মিল নেই এদের। এমনকি দক্ষিণাঞ্চলের ভদ্রলোকদের সঙ্গেও এদের মিল নেই। এরা দোকানদার চাষাভূষা পাড়াগেঁয়ে লোক। সকলেই তরুণ। এই অকুতোভয় তরুণেরা কেমন করে ভীতিবিহ্বল নাবালকদের পরিচালিত করে, সে দৃশ্য লী দেখেননি। কিন্তু এই সব কিছুর জবাবে তিনি একটি কথাই বলতেনঃ মূর্খ! কাণ্ডজ্ঞানহীন আকাট মূর্খ যত!

খানিকক্ষণ ঝগড়াঝাটির পর শ্রান্ত হয়ে তারা চেয়ারে ঠেস দিয়ে চুপ করে বসে রইল। অন্ধকার কোণ থেকে তখন ভার্জিনিয়ানের রায় শোনা গেল। নিরুত্তেজ শান্তকণ্ঠে বললেনঃ জেনারেল লী ঠিক কথাই বলেছেন। লড়াই আমরা করতে পারি না। এখানে তো নিশ্চয় নয়! কোথাও লড়াই করবার হিম্মৎ আমাদের আছে কি না, সে বিষয়েও আমার সংশয় আছে। নিউইয়র্ক ছেড়ে আমরা পিছু হটে যাবো। আমার নামাঙ্কিত কেল্লাটা রক্ষা করবার চেষ্টা করা যেতে পারে। এখনও সঠিকভাবে বলতে পারি না। দরকার হলে সেটাও ছেড়ে যাবো। আমার কথা শুনুন। একটিমাত্র পথ আমাদের আছে। যতদিন সাচ্চা পল্টন গড়ে তুলতে না পারবো, ততদিন একটানা পিছু-হটে যেতে হবে। একটা সুবিধা আমাদের আছে। নিজেদের সম্পর্কে কোন ভ্রান্ত ধারণা আমাদের নেই। কোন ফালতু বড়াই আমরা করি না। জানেন, যেদিন আমি বাড়ী ছেড়ে এলাম, সেদিন ভেবেছিলাম যে সামান্য কয়েকদিন পরেই আবার ফিরে যাবো। কিন্তু কিছুদিন পরে ফিরবার কোনো আশাই নেই। দীর্ঘদিন থাকতে হবে ঘরবাড়ী ছেড়ে। আমরা পশ্চাদপসরণ করে যাবো। দরকার হলে গোটা ইয়োরোপের দ্বিগুণ গিরিকান্তারের মধ্যে লুকিয়ে থাকবো। কিন্তু ঠিক জানবেন, একদিন আমরা সাচ্চা লড়িয়ে ফৌজ হয়ে উঠবো—

যেমন ফৌজ জেনারেল লী দেখেছেন। সেদিন আমরা যখন ফিরে দাঁড়াবো, তখন আর পিছু হটবার প্রশ্ন উঠবে না—তখন আর আমরা পালাবো না।

কথা কটা অনেকক্ষণ মনে মনে আওড়ালেন প্রধান সেনাপতিঃ 'আমরা পালাবো না'—'আমরা পালাবো না'—'আমরা সাচ্চা ফৌজ হবো'—'আমরা সাচ্চা ফৌজ হবো'।

কি করে সাচ্চা ফৌজ গড়ে তোলা যাবে তার একটা ছক দেবার চেষ্টা করলেন প্রধান সেনাপতি। দোষত্রুটি ভুলচুক এটা-ওটা শোধরাবার জন্য যা যা করা দরকার বলে মনে করতেন, এলোপাথারিভাবে কখনও বক্তৃতার ভঙ্গীতে, কখনও উপদেশচ্ছলে, কখনও ভর্ৎসনা করে, কখনও বা অনুনয় করে তিনি সেসব বোঝাবার চেষ্টা করলেন। তাঁর কিছু কথায় মাথা নেড়ে সায় দিলেন লী। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই সম্মানিত অতিথির মত ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে ইয়োরোপের বিভিন্ন রণক্ষেত্রে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার অফুরন্ত কাহিনী শোনালেন। তাঁর সমস্ত গল্পের সারমর্ম হচ্ছে, জেনারেল চার্লস লীর চালাকির সঙ্গে কোন চালাকিই এঁটে উঠতে পারে না।

ইয়াংকিরা তাঁর চালাকির গল্প শুনতে ভালবাসত। আর কিছুদিন পরে কে প্রধান সেনাপতি হবে সে সম্পর্কে লীর সুস্পষ্ট ইংগিত শুনে তারা মুচকি হাসত। ভার্জিনিয়ানের চরিত্রের গুণাবলীর তুলনায় লীর বহু ছোট-খাটো ত্রুটি ভালই লাগত তাদের।

দশ বিশ পঞ্চাশ জন করে লোক দল ছেড়ে পালাচ্ছে শুনে লী ঘাড় ঝাঁকানি দিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে কর্তব্য শেষ করতেন। কিন্তু যখন তাদের দু'চার-জনকে ধরে নিয়ে আসা হত, ভার্জিনিয়ান চাবুকে পিঠের চামড়া ছিঁড়ে ফেল-বার হুকুম দিতেন। এই কঠোর আদেশ শুনে ইয়াংকিরা তাঁকে নির্মম অত্যা-চারী বলে গালাগাল দিত। কিন্তু এ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। বিদ্রোহ দলত্যাগ চুরি রাহাজানির নালিশ লেগেই ছিল।

সমর মন্ত্রণা-সভার বৈঠকের পর লীর প্রতি কমাণ্ডারের শ্রদ্ধা পোক্ত হল। যে ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা তাই করে বসল। বেড় দিয়ে ওয়েস্টচেস্টার আক্রমণের জন্য ইস্ট নদী বরাবর প্রণালীর দিকে একদল সৈন্য পাঠিয়ে দিল। উদ্দেশ্য, আমেরিকান বাহিনীকে ঘেরাও করে চিরকালের মত সাবাড় করে দেওয়া। আজ হোক কি দুদিন বাদে হোক, বৃটিশরা যে এই কৌশল অবলম্বন করবে জেনারেল লী স্পষ্টই সেকথা জানিয়ে দিয়েছিলেন।

ইংরেজদের বেড় দেবার চেষ্টা সফল হ'ত যদি তারা সামান্য একটু ভুল করে না বসত। রাত্রির অন্ধকার ও কুয়াশার সুযোগ নিয়ে সৈন্য বোঝাই বৃটিশ নৌকা পেলস্‌পয়েণ্ট নামে একটি জায়গার খোঁজে ইস্ট নদীর উজানে এগিয়ে যায়। সঠিক ভৌগোলিক জ্ঞানের অভাবে নদীগর্ভে ফিতের মত বাড়ান এই একফালি জায়গা ঠাহর করতে না পেরে, ওয়েস্টচেস্টার উপকূলে থ্রগ্‌স্‌নেক্‌ নামে এমনি আর একফালি জায়গায় তারা অবতরণ করে। থ্রগ্‌স্‌নেক্‌ অনেকটা দ্বীপের মত। কাঠের একটা সাঁকো মূলভূখণ্ডের সঙ্গে থ্রগ্‌স্‌নেককে যুক্ত করেছে।

নদীর কিনারে গুগলি খুঁড়তে খুঁড়তে পিটার রাউশ্‌ নামে চৌদ্দ বছরের একটি ওলন্দাজ বালক ইংরেজদের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। ছেলেটি বেশ চালাক-চতুর ; তাই রাত্রির অন্ধকারে মাইলখানেক দৌড়ে এসে হ্যাণ্ড নামে লালমুখো এক আইরিশ কর্ণেলের তাঁবুতে খবরটা জানিয়ে দিল। হ্যাণ্ড ইংরেজদেব যতটা ঘৃণা করতেন, তার চাইতে অনেক বেশী ঘৃণা করতেন টোরীদের। তাই রোজার্স এবং তার সবুজে-উর্দিপরা দস্যুদলের সঙ্গে মোকাবিলার আশায় ওয়েস্টচেস্টারে তার রেজিমেণ্টটি নিয়ে এসেছিলেন।

গিস্‌গিস্‌ করে লোকজন ঠেলে সবাসরি হ্যাণ্ডের সামনে হাজির হল পিটার এবং হাতমুখ নেড়ে এক নিঃশ্বাসে ওলন্দাজ ভাষায় তার বক্তব্য পেশ করল। আইরিশ কর্ণেল তার কথার একবর্ণও বুঝতে পারলেন না। ছেলেটিব বেল্ট ধরে শূন্যে তুলে কয়েকটা ঝাঁকানি দেবার পব সে খানিকটা শান্ত হল।

- যা বললে ইংবেজীতে বলো। ধমক দিয়ে বল্লেন হ্যাণ্ড।

তখন আধা-ওলন্দাজ আধা-ইংরেজী মেশান এক খিচুড়ি-ভাষায় ছেলেটি কর্ণেলকে বোঝাবার চেষ্টা করল।

—গলদা চিংড়ি ব্যাটারা এসেছে।

—কোথায় ?

—জলে। নৌকায় আছে। আমার মনে হয়, শহর থেকে এসেছে। অতঃপর হাত দিয়ে নৌকা বাইবাব ভঙ্গী করে জিজ্ঞাসা করল ছেলেটিঃ একে আপনারা কি বলেন ?

—দাঁড় টানা।

—হাঁ! হাঁ!

—কতজন হবে ?

—আমি শুধু কথা শুনেছি। দেখিনি।

—কোথায় ওরা অবতরণ করবে বলতে পারো?

—যেভাবে যাচ্ছে তাতে মনে হয় নেকের দিকেই যাবে।

—সেখানে নিয়ে যেতে পারো আমাদের?

—হাঁ! হাঁ! হাঁ! উৎফুল্ল হয়ে উঠল ছেলেটি। পূর্বপুরুষদের নয়া-আমস্তারদাম (নিউইয়র্ক) হারাবার শোধ তুলবার কথা বুঝি মনে পড়েছে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে হ্যাণ্ডের লোকজন থ্রগ্‌স্‌নেকের কাঠের সাঁকোটি ভেঙে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে পেনসিলভানিয়ার বিশিষ্ট ভঙ্গীতে গলা ছেড়ে ইংরেজদের বিদ্রূপ-টিট্‌কিরি গালিগালাজ করতেও কসুর করল না।

থ্রগ্‌স্‌নেকের উপর একটা আঙুল রেখে মানচিত্রের দিকে চেয়ে বড় আদমী ইংরেজদের মতিগতি মালুম করবার চেষ্টা করছিলেন। এরপর ইংরেজরা কি করবে? নিজে তিনি আটকা পড়েছেন সত্য, কিন্তু বলতে গেলে ইংরেজরাও আটকা না পড়েছে তা নয়! যদিও তাদের আটকে রেখেছে ভাঙা একটা কাঠের সাঁকো আর গুটিকয়েক গাদা বন্দুক। ইংরেজরা নৌকায় ফিরে গিয়ে ওয়েস্টচেস্টার উপকূলের অন্য কোথাও অবতরণ করবার পূর্বে তিনি নিউইয়র্ক থেকে গোটা বাহিনী সরিয়ে নিতে পারবেন কিনা—সেইটেই এখনকার সমস্যা।

এ বিষয়ে বিশেষ চিন্তা-ভাবনা তিনি করলেন না। নিজের পল্টন সম্পর্কে কোন ভ্রান্ত ধারণাই তাঁর ছিল না। এখন বেশ স্পষ্ট তিনি বুঝতে পারেন যে, পশ্চাদপসরণ ও পলায়নের মধ্যে সুনির্দিষ্ট প্রভেদ আছে। একবার তিনি নিজের পল্টনকে পলায়ন করতে দেখেছেন! সেকথা মনে হলে মন বিষিয়ে ওঠে। পল্টনটি তখন ছিল একটি দ্বীপে: এবং সৈনিকদের মধ্যে অধিকাংশই সাঁতার জানত না। শুধু এই দুটি কারণেই আজও তাঁর বাহিনীর অস্তিত্ব আছে; না হলে এতদিনে বাষ্পের মত মহাশূন্যে মিলিয়ে যেত। একদল ইংরেজ সেনা পেছনে রয়েছে: আর একদল পাশ থেকে সম্মুখের পথ কেটে দিতে উদ্যত—এই অবস্থায় সৈন্যবাহিনী জড়ো করে তিনি যদি মানহাট্টান ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করেন, তাহলে কি যে অবস্থা হবে ভাবতে গিয়ে রক্ত হিম হয়ে আসে। না, এবারে আর পলায়ন নয়। ধীরেসুস্থে সুশৃংখলভাবে পল্টন হটিয়ে নিতে হবে। একসাথে জড়ো হয়ে চলতে হবে সবাইকে, যাতে পরস্পরের সান্নিধ্য থেকে সবাই ভরসা পায়। সঙ্গে সঙ্গে

একথাও জানিয়ে দিতে হবে যে পশ্চাদ্‌ভাগ আগলে রাখবার সুব্যবস্থাই করা হয়েছে।

পশ্চাদ্‌ভাগ আগলে রাখবার সমস্যা তত বড় নয়। থ্রগ্‌স্‌নেকের ইংরেজরাই কঠিন সমস্যা সৃষ্টি করেছে। একবার দেলাওয়ারে এবং মেরিল্যাণ্ডের সৈনিকেরা পেছনের দিকে আগলে ছিল। প্রয়োজন হলে আবারও সে ভার তারা নিতে পারবে। কিন্তু এখন সংখ্যায় তারা বড় কম! সে যাক্‌! কিন্তু থ্রগ্‌স্‌নেকের কি করা যায়?

মানচিত্রের উপর আঙুল টিপে জোর করে তিনি পথ বাৎলাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। নিরাশভাবে মনে মনে বল্লেনঃ লড়াই করবার মত হিম্মত আছে এমন শ' পাঁচেক লোকও যদি পাওয়া যেতো!

প্রণালীর তীর ধরে ওয়েস্টচেস্টারের মধ্য দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাবার সময় তিনি এবং তাঁর ষ্টাফের সকলেই একমত হলেন যে, ইংরেজরা নিশ্চয় পেলস্‌-পয়েণ্টে অবতরণের চেষ্টা করবে। লী'ও তাঁদের এ সিদ্ধান্তে সায় দিলেন। থ্রগ্‌স্‌নেকে ইংরেজদের তবু খানিকক্ষণ রোখা গেছে। কিন্তু ওখান থেকে সটকে তারা যদি পেলস্‌পয়েণ্টে অবতরণ করে বসে তখন কে রুখবে তাদের? পেলস্‌পয়েণ্টে কাঠের সাঁকোর প্রতিবন্ধকও নেই।

বসে ভাবতে ভাবতে নীল জ্যাকেট ও জেলের টুপীপরা কয়েকশ' লোকের ছবি সহসা তাঁর মানসচক্ষে ভেসে উঠল। অমনিই মনে পড়ল ব্রুকলিনের গত্যন্তরহীন বিপদের মধ্যে মার্বলহেডের লোকজনের সুশৃঙ্খল কৃতিত্বের কথা। এরাও ইয়াংকি.. কথা কয় নাকীসুরে ইয়াংকি-ছাদে তাদেরই মত ঘাপ্‌টি মেরে থাকে. .দেমাক দেখায়। তবু অন্যান্য ইয়াংকিদের তুলনায় এদের আচরণ কত আলাদা! মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ঝড়-তুফান আর লোনাজলের ঝাপটা সয়ে এমনি হয়ে গেছে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও এরা অকম্পিত। এদের চোখে সীসার বুলেট আর হিমশীতল সমুদ্রের মধ্যে খুব বেশী তফাৎ নেই। দাঁড়টানায় এদের কেরামতি তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। সেই হাতে বন্দুক তুলে দিলে কেমন হবে? পারবে কি?

কর্ণেল গ্লোভারকে ডেকে পাঠালেন প্রধান সেনাপতি। ভাসাভাসা উজ্জ্বল চোখ, আঁটসাট গড়নের লোকটা তাঁরই সমবয়সী। ঠোঁটে আলগা একটু ম্লান হাসিরেখা সর্বদাই লেগে থাকত—বিদেশীদের যেমন থাকে।

—আপনার লোকজন লড়াই করতে পারে? ভার্জিনিয়ান জিজ্ঞাসা করলেন।

—পারতে পারে।

মানচিত্রের উপর পেনসিল-পয়েন্টটি দেখিয়ে ভার্জিনিয়ান বললেনঃ আমার বিশ্বাস ইংরেজরা এখানে অবতরণ করবে। আমাদের পল্টন দ্বীপ ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত তারা যাতে অবতরণ করতে না পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

—আঃ-হা!

—পারবেন?

—চেষ্টা করে দেখতে পারি। গ্লোভার জবাব দেয়।

—একদিন কি বড়জোর দুদিন আমাদের লাগবে। কিন্তু আমি চাই যে ঘিরে ফেলবার সমস্ত সম্ভাবনা কেটে না যাওয়া পর্যন্ত ইংরেজদের ঠেকিয়ে রাখতে হবে।

—আঃ—হা!

অতঃপর উভয়ে করমর্দন করল। তখন ওয়াশিংটনের ঠোঁটেও গ্লোভারের মত ম্লান হাসিরেখা ফুটে উঠেছে।

রাগে গরগর করে সেই রাত্রেই জেলেরা যথাস্থানে গিয়ে ওৎ পেতে রইল। গুটিতিনেক ছোট্ট কামান তাদের দেওয়া হল। ঘোড়া ছিল না বলে নিজেরাই টেনে নিয়ে গেল কামান তিনটি। মাঠ-ঘাট ঝোপঝাড় ও কাঁটার মধ্য দিয়ে চলতে গিয়ে বহুবার হোঁচট খেয়ে পড়ল। শেষ অবধি জুৎসই একটা পাথুরে দেয়াল পেয়ে সেইখানেই থামল। প্রণালীর কাছাকাছিই ছিল তারা। কিন্তু ব্রুকলিন থেকে হটে আসবার সময় যে নৌকার বহর তারা খুঁজেপেতে সংগ্রহ করেছিল, আজ সেই সম্পদ ছেড়ে আসতে হয়েছে বলে সকলেই মনমরা হয়ে পড়েছিল। এটা তারা ঠিক বুঝতে পেরেছিল যে জলে স্থলে উভয়তই সংগ্রাম চালাতে হবে। অতিকায় বৃটিশ রণতরীর প্রতি ছোট্ট ছোট্ট নৌকার এই মাঝিমাল্লাদের একটা অবজ্ঞার ভাব ছিল। তারা জানত, উত্তুঙ্গ ঢেউয়ের দোলায় স্বচ্ছন্দে নেচে বেড়াবার পক্ষে সালেমের জেলেডিঙিই যথেষ্ট। জ্বলন্ত নৌকা পাঠিয়ে বৃটিশ রণতরী বহরে আগুন লাগাবার সুযোগ একটিবার পেলেই তারা খুশী হত। তাদের বিশ্বাস, তাহলেই তারা নিশ্চিন্তে বাড়ী ফিরতে পারত। কিন্তু সে সুযোগ তারা পায়নি। তার বদলে আজ তাদের পাঠান হয়েছে ওয়েস্টচেস্টারের কাঁটালতার মধ্যে হামাগুড়ি দেবার জন্য। হাতমুখ আঁচড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে, জামাপোশাক টেনে ধরছে কাঁটালতা--ভগবান জানেন কোথায় চলেছে তারা। মুখ গোমরা হবে না?

পাথুরে দেয়ালের পেছনে যখন তারা বন্দুক সাজিয়ে ঠিকঠাক হয়ে বসল, পাইপ ধরিয়ে ফৌজদারদের ডেকে পাঠাল গ্লোভার নির্দেশ দেবার জন্য। জন ষোল লোক এসে তার চারপাশে ভীড় করল। এদের মধ্যে জননয়েক পাকা মাঝি: তিনজন পাড়াগেঁয়ে স্কুলমাস্টার ছুটির সময় কড্‌মাছ ধরতে এসেছিল। আর বাকী চারজনের একজন ছিল পাদরী, একজন মুচি, একজন ছুতোর এবং আর একজন গোটা গ্লসেস্টার উপকূলের সেরা মূর্তিশিল্পিদের অন্যতম, নাম হিরাম থ্রিমার্সি প্লাউম্যান। বেশ নামডাক ছিল লোকটির শিল্পী হিসাবে। ফৌজদারদের সকলেই কঠোর, চালাক-চতুর লোক—টিকলো নাক, লম্বা মুখ। স্বাধীনতাকে লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে এরা যুদ্ধ করতে আসেনি। আজাদীর মোহ এদের টেনে এনেছে রণক্ষেত্রে।

পাইপে কয়েকটা টান দিয়ে মাথা নেড়ে প্রণালীর দিকে ইংগিত করে গ্লোভার বল্লেঃ ওরা ঐদিক থেকে আসবে।

ঊষার পাণ্ডুরচ্ছটায় প্রণালী তখন ফর্সা হয়ে এসেছে। ফৌজদাররা কোন কথা না বলে গ্লোভারের নির্দেশের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

—আমরা এইখানেই থাকবো। গ্লোভার আবার বল্লে।

ফৌজদাররা বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে সায় দিল।

গ্লোভার পুনরাবৃত্তি করলে কথাটি।

তখন সেই আবছা অন্ধকারের মধ্যে পাদরীটি বলে উঠলঃ হে ভগবান! হে সর্বশক্তিমান যীহোভা! অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমার রোষবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠুক! তোমার পবিত্র নাম যারা কলুষিত করছে তাদের তুমি প্রচণ্ড আঘাত হানো! ধার্মিক ও ভগবৎ-বিশ্বাসীদের শক্তি দাও। ইংলণ্ডের চার্চ জাহান্নামে যাক!

ফৌজদারদের কণ্ঠে ধ্বনিত হলঃ আ-মেন!

নতুন ধরণের গোলা তৈরী করে এরা কামান সাজিয়ে রাখল। এ গোলা বারুদ দিয়ে তৈরী হয়নি। এ গোলার মশলা জুগিয়েছে কামারশালার ঝাড়-পোঁছঃ মরচেধরা পেরেক...টুকরো টুকরো তার...পুরনো লোহার বল্টু.. ভাঙা ঘোড়ার নাল...কাঁচের টুকরো এবং কুচি কুচি করে কাটা দস্তার কলসী ও কড়াই। যুদ্ধ সম্পর্কে কোন উচ্চ কিম্বা ভ্রান্ত ধারণা এদের ছিল না। কিন্তু একটা এক-রোখা ভাব ছিল এদের স্বভাবে। রাইফেল চালাবার কায়দাও এদের আয়ত্তাধীন নয়। তাই বড় ফুটোর মাস্কেটগুলোতেও

(কয়েকটার মুখ আবার ঘণ্টার মত) এরা মরচেধরা পেরেক এবং তারের টুকরো ভরতি করে রাখল। রাইফেল চালনায় ওস্তাদ না হলেও এরা ইয়াংকি এবং কাজেকর্মে পটু। কাজেই রাইফেলকে শটগান্ বানিয়ে তারা শত্রুর জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল।

ভোর হবার সংগে সংগেই ইংরেজসেনা মার্চ করে এগিয়ে এল এদের উড়িয়ে দেবার জন্য। কিন্তু জেলেরা নড়ল না, শান্তভাবে অপেক্ষা করতে লাগল। সাগরের বুক ফুঁড়ে দিবাকর ভেসে উঠলেন। সেই সোনালী আলোকোজ্জ্বল প্রভাতে ইংরেজসেনার লাল-উর্দি মাঠের মধ্যে যেন রক্তবিন্দু ছিটিয়ে দিল। থ্রগ্‌স্‌নেকে চেষ্টা করে তারা ব্যর্থ হয়েছে ভাঙা সাঁকোর জন্য। কিন্তু এখানে তাদের পায়ের তলায় রয়েছে মাটি। পায়ের তলায় মাটি পেলে কোন বাধা লাল-কোটয়ালাদের এ পর্যন্ত পথরোধ করতে পারেনি। ড্রাম ও বাঁশী বাজনার তালে তালে মার্চ করে এগিয়ে আসছে ইংরেজসেনা 'শেকো' টুপী দুলিয়ে। তাদের ঝলসান কীরিচ প্রভাতী হাওয়া কেটে খান খান করছে। লাল-কোট য়ালারা গজ ত্রিশেক দূরে আসতেই কামারশালার ঝাড়পোঁছের গোলা দাগল জেলেরা।

বড়শী টেনে খুলবার পর রক্তস্রাবী কড্‌মাছ কেমন করে গা' মোচড়ায় বহুৎ দেখেছে জেলেরা। কিন্তু পিছল ডেক-ভরতি কড্‌মাছের মত মাঠ-ভরতি মানুষকে এমনভাবে গা' মোচড়াতে কোনকালেই দেখেনি। বাপ্-ঠাকুর্দার মত দয়ামায়া তাদেরও খানিকটা কম। তবু নির্বিকারভাবে এতগুলো মানুষের এমন করুণ কাতরানি দেখবার মত পাষাণ-হৃদয় তাদের নয়। এই দৃশ্য দেখে কঠোরপ্রাণ জেলেদের মুখও শুকিয়ে গেল—কেমন বমির উদ্রেক হল।

তথাপি আবার কামানে গোলা ভরতি করল জেলেরা। সেই কামারশালার গোলা।

বিশ পঁচিশটা লাল-উর্দি লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আবার এগিয়ে এল ইংরেজসেনা সরাসরি জেলেদের দিকে। কিন্তু এবারেও কামারশালার ঝাড়পোঁছের গোলায় বহু ইংরেজসেনা ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে।

এতেও ক্ষান্ত না হয়ে বার বার এগিয়ে আসবার ব্যর্থ চেষ্টা করল ইংরেজ ফৌজ। একবার শব-থৈ-থৈ মাঠের মধ্য দিয়ে দৌড়ে তারা পাথুরে দেয়াল অবধি এগিয়ে এল। হাতের বন্দুক রেখে দিয়ে জেলেরা সেবার আকশি-লাগান লগিগুলো বল্লমের মত ব্যবহার করল।

প্রতিহত হয়ে ইংরেজসেনা সারা সকাল অর্থহীন ব্যর্থ আক্রমণ চালিয়ে গেল। নিরর্থক মূর্খতা হলেও এ বীরত্বের কেরামতি আছে। কিন্তু কোন লাভ হল না। প্রতিবারেই মার্বলহেডের বাহাদুর জেলেদের মরচেধরা পেরেক তাদের হটিয়ে দিলে।

দুপুরবেলা হতাবশিষ্ট ইংরেজ হালকা পদাতিকদের সরিয়ে নিয়ে সবুজে-উর্দিয়ালা হেসিয়ানদের এগিয়ে দিলেন হাউ। কর্কশ রণহুংকার দিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে এগিয়ে এল জার্মান সেনা। ইয়ংকি-ইয়ংকি রবে মুখর হয়ে উঠল রণক্ষেত্র। লন্ডনের কক্‌নি-ভাষী ছেলেরা যে অবিচল স্থৈর্য, যে বিস্ময়কর দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে এসেছিল, সে স্থৈর্য, তেমন ওস্তাদি জার্মানদের ছিল না। তাদের ছিল একরোখা গোঁ। ক্রোধোন্মত্ত হয়ে রুখে এল তারা। কিন্তু মরল ইংরেজদের মতই। আক্রমণের দাপটে একবার পাথুরে প্রাচীর পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল; কিন্তু ইংরেজদের মতই আবার পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল। জার্মান সেনার সবুজে-কোট, 'শেকো' টুপী আর বড় বড় গাঁটরি মাঠের বুকে যেন ডোরা কেটে দিল।

ক্ষয়-ক্ষতি গ্রাহ্য না করে সারা বিকাল ধরে চলল এই আক্রমণ। জেলেরাও প্রতিবারেই হটিয়ে দিলে স্বেদসিক্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত জার্মানদের। সারা দিনের সংগ্রামে মাত্র জনাতিনেক জেলে নিহত এবং জনাচারেক আহত হল। কিন্তু তাদের সম্মুখের ময়দানে কম্‌সে কম পাঁচশ' ইংরেজ ও জার্মান পড়েছিল। দুনিয়া-দারির কোন ভয় অব্যবস্থিত-চিত্ত জেনারেল হাউ'র মনে কোনদিন স্থান পায়নি। তবু আজকের এই নিদারুণ ক্ষয়ক্ষতি তিনিও অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। হতাবশিষ্ট সৈনিকদের ফিরে আসবার হুকুম দেওয়া হল। পেলস্‌পয়েন্টের নারকীয় দৃশ্য ঢাকা পড়ল সন্ধ্যার অবগুণ্ঠনে।

মার্বলহেডের জেলেরা যখন পাথুরে দেয়ালের পেছনে থেকে পেলস্‌পয়েন্টে শত্রুর আক্রমণ রুখছে, সেই সুযোগে কমান্ডার আপ্রাণ চেষ্টায় হার্লেম থেকে দ্রুত ফৌজ সরিয়ে নিতে আরম্ভ করলেন। তাঁর মনে হল, বহু বছর এমনিভাবে ক্রমাগত পশ্চাদপসরণ কবে যেতে হবে। আজ সেই সীমাহীন পিছুহটার শুরু। শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করে তাকে নির্মূল করবার উদ্দেশ্য নিয়ে যে ফৌজ গড়ে তোলা হয়েছিল আজ অবধি তিনি সেই ফৌজের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ভগবানের কৃপায়, আকস্মিক বর্ষণের সুযোগে এবং পাঁচ ছশ' ইয়াংকি জেলের অবিচল হিম্মতের দরুণ শত্রুপক্ষ তাঁর ফৌজ সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে পারেনি। পরাজয় এমন নিত্যসঙ্গী হয়ে পড়েছে

যে, আজকে জয়লাভের কথা কল্পনা করাও অসম্ভব ; বড়জোর সুশৃঙ্খল পশ্চাদপসরণের পন্থা চিন্তা করা যেতে পারে। এই নতুন অভিজ্ঞতা দীর্ঘ ভার্জিনিয়ার চাষীর মনে এক অভিনব বিশ্বাস সৃষ্টি করল। তাঁর দৃঢ়প্রত্যয় হল, দু'একটি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যুদ্ধজেতা আর মানুষের স্বাধীনতা কায়েম করা যায় না।

অভিজ্ঞতা-লব্ধ এই নতুন বিশ্বাসের পূর্ণ তাৎপর্য তখনও তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি। কিন্তু যে অতিমানবীয় ধৈর্যের প্রমাণ তিনি দিতে লাগলেন, তা থেকে তাঁর মানসিক পরিবর্তনের আভাষ পাওয়া যেত। সূর্যস্নাত ভারনন্ পাহাড়ের মহিমা আজ দূর-দূরান্তের আবছা ছায়াছবি...আধখানা স্বপ্ন বলে মনে হয়। আজও তিনি সেখানে ফিরে যাবার আশা রাখেন। কিন্তু কোন দূর ভবিষ্যতে যে ফেরা সম্ভব হবে তা বলতে পারেন না। প্রত্যাবর্তনের দিন হিসাবনিকাশের বাইরে চলে গেছে। ভারনন্ পাহাড়ের ঘরবাড়ী, আড়ৎ, গোলাঘর, মদ্যশালা, ফলের বাগান, ক্ষেতখামার, লন, ছায়াশীতল গাছ এতদিন তাঁর কাছে চিরন্তন বাস্তব সত্য বলে জাগরূক হয়ে রয়েছ। এর সব কিছু মিলেই তো তাঁর জীবন! কল্পনাব অন্তর্লোকে বাস করবার মানুষ তিনি নন। তিনি বাঁচতে চেয়েছেন সংসারের সাচ্চা বাস্তব জিনিসের প্রাচুর্যের আমেজে। কিন্তু সে জীবন ফেলে-আসা-দিনের স্মৃতির মত ছড়িয়ে আছে তাঁর টেবিলের উপর। একদিন যে ভারনন্ পাহাড় একান্তভাবে তাঁরই ছিল, আজ আর তাকে আপনার বলে মনে করতে পাবছেন না। সে যেন কামনার কল্পলোক।

সীমাহীন তাঁর ধৈর্য। জীবনে চলবাব পথে একটি সহজ নীতি তিনি স্থির করে নিয়েছিলেনঃ বন্ধুদের আমি বিশ্বাস করবো আর শত্রুদের ধ্বংস করবার জন্য তৎপর হবো। এখন আর তিনি কাউকে দোষ দেন না, কাউকে ভর্ৎসনা করেন না বা কারও উপর চটেন না। হামেশাই ভুলচুক হত। কিন্তু কোন ভুলচুক হলে তিনি ধীরস্থিরভাবে বোঝাবার চেষ্টা কবতেন যে এমন অবস্থায় পড়লে দুনিয়াব শ্রেষ্ঠ বাহিনীও ভুলচুক কবে থাকে। এমনি সরল মর্যাদা নিয়ে তিনি এই যুদ্ধের প্রহসন পরিচালনা করতে লাগলেন যে চার্লস্ লী'র মত লোকও তাঁর দিকে কিছুটা আকৃষ্ট না হয়ে পারল না।

মনে মনে ভাবতেন লীঃ আঃ! লোকটা যদি নির্বোধ না হত!

কিন্তু নক্স, মিফ্‌লিন, মার্কার, ম্যাকডুগাল এবং আর পাঁচজন মাথাগরম তরুণ যখন হন্তদন্ত হয়ে তাঁর কাছে নালিশ করত যে লী এটা বলেছে, সেটা

বলেছে, তখন নালিশে কর্ণপাত না করে সরাসরি এই কথা বলে তিনি তাদের বিদায় করে দিতেনঃ জেনারেল লী একজন বাহাদুর এবং অনুগত যোদ্ধা। আমি চাই, আমার স্টাফের সবাই একথাটা মনে রাখুক!

যে ধাঁচের কথা লী বলতেন বা আর পাঁচজন তাঁর নামে বলত, বছরখানেক কি মাসখানেক আগেও যদি এমনি কথা তাঁর কানে আসত, তাহলে রেগেমেগে তিনি অস্থির হতেন। কিন্তু একবছর কি মাসখানেক আগেকার সে-মানুষ আর তিনি নন।

ব্রিগেডের পর ব্রিগেড ইয়াংকি চলেছে উত্তরমুখো। কারও কারও হাতে অস্ত্র আছে : যারা ছুড়ে ফেলে দিয়েছে তাদের নেই। মানহাট্টান দ্বীপের বোতলের গলার মত সরু এলাকা পার হয়ে কিংসব্রিজ অতিক্রম করে ওয়েস্ট-চেস্টারের মধ্য দিয়ে একটানা উত্তরমুখো চলেছে তারা ইংরেজদের ফাঁদ এড়িয়ে। আর এদিকে মার্বলহেডের জেলেদের বিরুদ্ধে জেনারেল হাউ পাঠাচ্ছেন তাঁর রণকুশলী ফৌজ। পশ্চাদপসরণ করতে হতে পারে অনুমান করে ভার্জিনিয়ান হোয়াইট্ প্লেইনস্ নামে একটা জায়গায় রসদ জড়ো করছিলেন। হলোওয়েতে আজাদী ফৌজ যেখানে রক্ষাব্যূহ তৈরী করেছিল, সেখান থেকে হোয়াইট প্লেইনসের দূরত্ব মাইল আঠারো। এই আঠারো মাইল পথ যেতে একটা সুশিক্ষিত ফৌজের একদিনও লাগে না। কিন্তু পরাভূত ভগ্নোদ্যম আমেরিকান বাহিনী পুরা একদিনেও এতটা পথ যেতে পারবে না।

মনে মনে ভার্জিনিয়ান স্থির করেছিলেন যে হোয়াইট প্লেইনসে আর একটা ব্যূহ রচনা করে প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু এখন উপলব্ধি করতে পারলেন যে, সে চেষ্টা করলে তিনি ইংরেজদের চালে ধরা দেবেন। তারা চায় মহাদেশীয় বাহিনীকে বেড় দিয়ে লড়াই খতম করে দিতে। আজ হোক, কি দুদিন বাদে হোক, সে চেষ্টা তারা করবেই। কাজেই তিনি আগেকার পরিকল্পনা পরিবর্তন করলেন। ইতিমধ্যেই তিনি সংবাদ পেয়েছেন যে, গ্লোভারের জেলেসংগীরা সাময়িকভাবে ইংরেজদের রুখেছে। তিনি ঠিক করলেন, মানহাট্টান থেকে তামাম বাহিনী সরিয়ে নিয়ে আসবার পর যতক্ষণ হোয়াইট প্লেইনস্ থেকে রসদ সরান না হয়, ততক্ষণ সেখানে একদল পশ্চাদ্রক্ষী মোতায়েন করবেন। তারপর আবার চলবে পশ্চাদপসরণ।

গ্রীন বেদম ঘৃণা করত লীকে। পুরাপুরি নিউইয়র্ক ত্যাগ না করে

ওয়াশিংটন কেল্লায় হাজার তিনেক সৈন্য রেখে যেতে কমান্ডারকে রাজী করাল সে। গ্রীন ও নক্সের দৃঢ়বিশ্বাস, ওয়াশিংটন কেল্লা চিরকাল রক্ষা করা যাবে।

বিশালকায় আহত সিংহের মত ক্ষতস্থান চেটে বৃটিশ বাহিনী দ্বীপের অভ্যন্তরে ও উত্তরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এদিকে কামারশালাব মরচেধরা জঞ্জাল নিঃশেষে খতম করে অন্ধকারে গা'ঢাকা দিয়ে সরে পড়ল জেলেরা। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তাদের অভিনব তোপ সমরকুশলী বৃটিশ বাহিনীর যতটা ক্ষতিসাধন করেছিল.. যত বৃটিশ সৈন্য এই খণ্ডযুদ্ধে হতাহত হয়েছিল, তেমন মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি ও পরাজয় বৃটিশ ফৌজের সামরিক ইতিহাসে খুব বেশী হয়নি। কিন্তু জেলেদের এই অসামান্য কৃতিত্ব নগণ্য একটি ঘটনা, শত্রুব অবতবণ বিলম্বিত করবার সাময়িক সাফল্য বলেই পরিগণিত হল। পবাজযের বিষাদে ভগ্নহৃদয় বাহিনী এই কৃতিত্বেব দিকে নজবই দিল না।

আর সবাইর কি দশা হল

মানহাট্টান ছেড়ে কিংস-ব্রিজ পার হয়ে আজাদী ফৌজ যখন দক্ষিণ-ওয়েস্টচেস্টারের নীচু টিলার মধ্য দিয়ে একেবেঁকে অগ্রসর হল, প্রধান সেনাপতি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলেন। মানহাট্টান দ্বীপ থেকে সৈন্যবাহিনী হটিয়ে নেবার কথা চিন্তা করতে গিয়ে তিনি সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবার শংকায় আঁৎকে উঠেছেন। আজ সে ছত্রভঙ্গ পলায়নের শংকা কেটেছে। তেমন কিছু ঘটেনি। কিন্তু এ স্বস্তি নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী হল। জলের বাধার জন্য তাঁর লোকজন এতদিন পাইকারীভাবে দলত্যাগের চেষ্টা করতে পারেনি। যেই সে বাধা তিরোহিত হল, অমনিই দলত্যাগের হিড়িক পড়ে গেল। আজাদী ফৌজ অবলুপ্ত হয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনায় তিনি তটস্থ হয়ে পড়লেন। মনে হল, দীর্ঘকায় কদাকার এক চাষীর মত ঘোড়ায় চড়ে দুই হাতে তিনি দুমুঠো বালি আঁকড়ে ধরে আছেন: কিন্তু সে বালি হাতের মুঠোয় ধরে রাখা যায় না। ঝড়ো হাওয়ায় তাঁর মুষ্টিবদ্ধ বালিকণা অনবরত ঝরে পড়ছে...উড়ে যাচ্ছে... ধোঁয়ার মত শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে, আর ক্রমাগত তাঁর কানে আসছে সংক্ষিপ্ত মর্মান্তিক সংবাদঃ

'কি বলবো স্যার, আমার চোদ্দজন লোক পালিয়েছে।'

'আমার কোন দোষ নেই স্যার' ভারমণ্টের রাইফেল রেজিমেণ্ট বাড়ী চলে গেছে।'

'ছ'জন দলত্যাগীকে আমরা পাকড়াও করেছিলাম কিন্তু শ'খানেকের বেশী সটকেছে।'

'ক্যারোলিনা সাধারণতন্ত্রের নিজস্ব অনুগত গোলন্দাজ কোম্পানীটি দু'টো ছয় পাউণ্ডার কামান নিয়ে ভেগে পড়েছে।'

'গ্যাড্‌বি রেঞ্জার্স'রা ভেগেছে স্যার! কখন যে ক্যাম্প থেকে পালালো তাও টের পেলাম না।'

'ক্যাপ্টেন আতারসন্ তার সব লোকজন নিয়ে খসে পড়েছেন।'

'লেফ্‌টন্যাণ্ট জোনস্ এবং তার আরও ছ'জন সংগী ভেগেছে।'

'কর্নেল আর্লেন।'. ....

'গ্রীন বর্ডারার্স' দলের বাষট্টি জন।'...

'পেনসিলভানিয়া রাইফেলসের এগারো জন।'

'ক্যাপ্টেন বিক্সবি।'......

'আমার রেজিমেন্টের সাতজন সমস্ত বারুদ নিয়ে ভেগেছে স্যর! এখন গোলাবারুদ কোথায় পাবো?'

'তৃতীয় নিউইয়র্ক দলের বারো জন......'

এই একটানা একঘেয়ে দুঃসংবাদ শুনতে শুনতে তাঁর কান ঝালাপালা হয়ে গেল। অন্তহীন পুনরাবৃত্তি চলেছে একই ধাঁচের আতঙ্কজনক নিষ্ঠুর সংবাদের। প্রতিটি নালিশ, প্রতিটি দুঃসংবাদ যেন তাঁর মাথায় হাতুড়ি পিটছে। দশজন, ছয়জন, নয়জন, একশো জন, দু'শো জন—এমনি করে যদি দলত্যাগ চলতে থাকে, তাহলে দু'চার দিনের মধ্যেই তো আজাদী বাহিনী শূন্যে মিলিয়ে যাবে!

—সৈনিকদেব একসাথ করে রাত্রে প্রহরী মোতায়েন করবার ব্যবস্থা করুন। স্টাফ অফিসারদের অনুনয় করে বল্লেন তিনি।

—কিন্তু স্যর, প্রহরীরাও তো ভাগছে। ফৌজদারদের একজন জানাল।

এই অবস্থায় তিনি ক্রমাগত উত্তরমুখো এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত করলেন। ভাবলেন, এমনিভাবে এগিয়ে যাবার ঝোঁক থাকলে হয়ত ভাঙন রোধ করা যাবে।

গভীর অরণ্যে ঢাকা ওয়েস্টচেস্টারের পাহাড়িয়া এলাকা অনেকটা বেওয়ারিশ অঞ্চলের মত। মেজর রবার্ট রোজার্স এবং তার দলবল এখানে ইদানীং গেরিলা-যুদ্ধের মত উৎপাত শুরু করেছে। এতদিন পর্যন্ত বিপ্লবের দরদীদের উপর তারা অকথ্য অত্যাচার উৎপীড়ন চালিয়ে এসেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের ঘরবাড়ীতে আগুন লাগিয়েছে. .কচিৎ কদাচিৎ বলাৎকার করেছে. .লুঠতরাজ দাঙ্গাহাঙ্গামা করেছে কিম্বা একতরফা বিচারের প্রহসন করে প্রাণদন্ড দিয়েছে। এ ছাড়া পীড়ন করবার আর একটি উপায়ও তারা উদ্ভাবন করেছিল, যা প্রাণদণ্ডের চাইতেও বীভৎস ও নির্মম। এ শাস্তি অনেকটা শূলে দেবার মত। দু'পায়ে সের পাঁচশেক করে ওজন বেঁধে বন্দীকে একটা ছুঁচলো তক্তার উপর বসিয়ে দেওয়া হত এবং যতক্ষণ লোকটি অজ্ঞান হয়ে না পড়ত, কি মরে না যেত অথবা কাঁদাকাটি আর্তনাদ করে করুণা ভিক্ষা না করত, সেইভাবেই বসিয়ে রাখা হত তাকে। এই বিপ্লবীদলের সংখ্যাশক্তি ওয়েস্টচেস্টারে খুব বেশী ছিল না; বরং বিপক্ষের তুলনায় সংখ্যায় তারা খুবই

কম। কিন্তু তবু তারা এমন একটা অবস্থায় এসেছিল যে বৈপ্লবিক উপাদান হিসাবে তার গুরুত্ব অসীম। আর কিছু হারাবার শংকা তাদের ছিল না। পোকান্টিনো পাহাড়ের জটপাকান গহিন অরণ্য এবং মাহোপাক এলাকার জন-মানবশূন্য সুবিস্তীর্ণ জলাভূমিতে আত্মগোপন করে তারা হামলা ও পালটা-দস্যুবৃত্তি শুরু করে দিল। বেপরোয়া চুরি-রাহাজানি, ঘর জ্বালানি ও উৎপীড়ন-বলাৎকারের হিড়িকে কিছুদিনের মধ্যেই এই বনঘেরা মনোরম অঞ্চলটি সারাদেশে আইনশৃংখলাহীন বিভীষিকাময় উপদ্রুত অঞ্চল বলে প্রসিদ্ধি লাভ করল।

টোরী বা বিপ্লবী যেই হোক না কেন, ওয়েস্টচেস্টারের মধ্য দিয়ে হোয়াইট প্লেইনস্, ট্যারিটাউন, ডবস্ ফেরী কিম্বা হাডসন্ নদী বা প্রণালীর তীরে যে কোন মনোরম সাবেক ওলন্দাজ পল্লীতে যেতে হলে তাকে প্রাণ হাতে করে যেতে হত। সর্বত্র একটা ছন্নছাড়া ভাব। ক্ষেত খামারে আবাদ হয়নি...ফলের বাগান দেখাশুনার অভাবে জঙ্গলাকীর্ণ. নির্জন ঘরবাড়ীর কোনটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে আবার কোনটা কেল্লার মত প্রাকারবেষ্টিত এবং অস্ত্রসজ্জিত। সমস্ত উপনিবেশের মধ্যে কোন মহল্লাকে ওয়েস্টচেস্টারের মত এমন তীব্রভাবে গৃহযুদ্ধের ক্ষমাহীন ক্রূর প্রতিহিংসার প্রকোপ সহ্য করতে হয়নি।

এখন এই ওয়েস্টচেস্টারে আবার নতুন দুটি জিনিস আমদানি হল। এল নতুন দুটি সৈন্যবাহিনী। মানহাট্টান দ্বীপ থেকে এল ভীতত্রস্ত পরাভূত হাজার তেরো মহাদেশীয় ফৌজ; এবং তাদের পেছু পেছু ধাওয়া করে এল ইংরেজ ও জার্মান নিয়ে গড়া সুশিক্ষিত এক বিস্ময়কর সমর-যন্ত্র। আমেরিকানদের ঘেরাও করবার চেষ্টায় উত্তরে এবং পশ্চিমে সাঁড়াশির মত এগিয়ে নৌকো করে তারা নিউ রচেলের কাছাকাছি একটা এলাকা পর্যন্ত এল। ওয়েস্টচেস্টারের পথঘাট জানা ছিল না বলে অতর্কিত আক্রমণের শংকায় অতি সন্তর্পণে আস্তে আস্তে এগুতে হল ইংরেজদের।

এই ভৌগোলিক অজ্ঞতার জন্যই লণ্ডন থেকে বৃটিশ নৌদপ্তর আমেরিকান-দের ধাওয়া করবার জন্য ব্রনস্ক নদী বরাবর অতিকায় বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ-বহরকে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছিল। হুকুম তামিল করবার পুঙ্খানুপুঙ্খ বন্দোবস্ত করা হল। কিন্তু জেনারেল হাউ যখন স্বচক্ষে দেখলেন, ব্রনস্ক মাত্র কয়েক হাত গভীর এবং সামান্য কয়েক গজ চওড়া বিশীর্ণ একটি মনোরম পাহাড়িয়া স্রোতস্বতী বই আর কিছুই নয়, তখন তিনি বিস্ময়ে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। বৃটিশরা এগুতে পারল না অজানা পথঘাটে বেকায়দায় আটকা

পড়বার ভয়ে; কিন্তু আমেরিকানরা চটপট এগিয়ে যেতে পারল না কারণ সৈন্য-বাহিনীর মত মার্চ করবার মুরাদ তাদের ছিল না।

বুভুক্ষু নেকড়ের মত এই দুই বাহিনীর চতুষ্পার্শ্বে ওৎপেতে রইল সশস্ত্র দস্যুদল। দলত্যাগীদের তারা গুলী করে হত্যা করত...পশ্চাতের বিচ্ছিন্ন দলছাড়াদের শিরশ্ছেদ করত আর সান্ত্রীদের ছুরি মারত। দুইটি বিরাট সৈন্যদল যখন কায়দামত ব্যূহ রচনার চেষ্টায় পাল্লা দিয়ে এগুচ্ছে, সেই সুযোগে তারাও অবাধে চালিয়ে গেল তাদের বীভৎস দস্যুবৃত্তি।

চরম আশাবাদী ভার্জিনিয়ান। কি দিনে কিবা রাত্রে, সব সময় তিনি স্বপ্ন দেখতেন যে তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করছেন। কেন? কারণ রণনৈতিক কৌশলে তিনি কোন ভুল করেননি, ঠিক পথেই চলেছেন। তাঁর লোকজনও আর ভয় পেয়ে পালাচ্ছে না। এই ধারণার ফলে মনে মনে তিনি বলতেনঃ এর পর যদি ঠিকঠাক মত চলতে পারি, যদি খাঁটি সৈনিকের মত সব কিছু পরিকল্পনামাফিক চালাতে পারি, তাহলে ফলাফল উল্টো হবেই। আমি জিতবো।

তার পক্ষে এ সিদ্ধান্ত করা খুবই স্বাভাবিক। নিজে তিনি আদৌ ভয় পাননি। যেদিন তিনি বুঝলেন, ফিরবার কোন পথ নেই, এখান থেকে মাত্র একটি লক্ষ্যের দিকেই চলতে পারেন, সেইদিনই তাঁর সমস্ত ভয় কেটে গেল। কাজেই তিনি বুঝতে পারতেন না যে সৈনিকদেরই বা এ বোধ হবে না কেন? এই অনন্ত আশাব প্রলেপে অতীতের অভিজ্ঞতাও মন থেকে মুছে গেল। হোয়াইট প্লেইনসে পেঁছে চার্লস্ লীকে বল্লেনঃ এখানে আমরা যদি ওদের রুখতে পারি তাহলে যুদ্ধের গতি বদলে যাবে জেনারেল। দুর্মদ শত্রুর বিরুদ্ধেও হোয়াইট প্লেইনসেব ব্যূহ রক্ষা কবা কঠিন নয়। কিন্তু তবু তাঁর এ উক্তি বাস্তব অবস্থার বর্ণনা নয়—আশার অভিব্যক্তি মাত্র। আঁকা-বাঁকা ব্রনস্ক নদী থেকে জলাভূমি-ঘেরা একটা হ্রদ পর্যন্ত তাঁর ফৌজ প্রতিরোধ ব্যূহ রচনা করতে শুরু করে দিয়েছে। এখানে সেখানে বহু টিলা পাহাড় আছে। তাছাড়া আমেরিকান বাহিনী রয়েছে চড়াইতে। পুরনো সামরিক কেতাবের গতানু-গতিক নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে মনে মনে লী স্বীকার করলেন যে, রণকৌশলের দিক থেকে এ জায়গাটা বাস্তবিকই প্রতিরোধের উপযোগী। এই নির্বোধ আনাড়ী চাষীর জন্য সাময়িকভাবে তাঁর কেমন একটা মায়া হল। নেতা বা সৈনিক হবার যোগ্যতা তাঁর ছিল না; তাছাড়া ইনিয়ে-বিনিয়ে সবকিছু চিন্তা

করবার অভ্যাসের দরুণ কোন জিনিসেরই সবটা তাঁর নজরে পড়ত না, কেবল খানিকটা অংশই দেখতে পেতেন।

তবু লী'র পরামর্শ উপেক্ষা করে ওয়াশিংটন কেল্লায় সৈন্য মোতায়েন করে যে অপমান তাঁকে করা হয়েছে, সেজন্য তিনি এখনও রাগে টগবগ করছিলেন। কাজেই ওয়াশিংটনের কথার হাঁ-বা-না কোন জবাবই দিলেন না।

—আমরা ওদের প্রণালী অবধি তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি! আশাবাদী শিয়াল-শিকারী বল্লেন।

—না হয় ওরা আমাদের ঘেরাও করে মরণফাঁদে ফেলতে পারে। লী জবাব দিল।

—না না তা ওরা করবে না। চাপা গলায় ধীরে ধীরে বল্লেন শিয়াল-শিকারী।

এ সম্পর্কে কোন সংশয়ই তাঁর ছিল না। তিনি জানতেন, তাঁকে এবং তাঁর সৈন্য বাহিনীকে ইংরেজরা কত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে, কত ঘেন্না করে। সরাসরি সংগ্রামে যে বাহিনীকে অনায়াসেই খতম করা যাবে, সে সৈন্যবাহিনীকে ঘেরাও করবার মেহেনৎ ইংরেজরা ঘৃণাভরেই করবে না।

উত্তরকালে হোয়াইট প্লেইনসের যুদ্ধ নামে পরিচিত সংগ্রামে এমন নতুন বা ব্যাপক কিছু ঘটল না। সামরিক দিক থেকেও তেমন কোন গুরুত্ব ছিল না এ যুদ্ধের। তথাপি এই যুদ্ধের অস্পষ্ট জটপাকান স্মৃতি বহুকাল প্রধান সেনাপতির মনে জাগরুক ছিল। কেন না এখান থেকেই তাদের উর্ধশ্বাসে পলায়নের পর্যায় শুরু হয়। যে পলায়নের বিভীষিকাময় স্মৃতি ক্ষিপ্ত প্রেতের মত দিবারাত্রি, এমনকি স্বপ্নের মধ্যেও তাঁকে ধাওয়া করেছে, এই হোয়াইট প্লেইনস্ থেকেই তার সূত্রপাত।

ইতিপূর্বের লড়াইয়ের তুলনায় এই যুদ্ধে নতুন কিছুই ঘটেনি। কিছু সৈন্য যুঝল: কিন্তু অধিকাংশই পালাল। তবু কিছুটা প্রভেদ ছিল। অন্যান্য যুদ্ধে ভূতের-তাড়া-খাওয়া মানুষের মত হন্যে হয়ে পালিয়েছে ইয়াংকিরা। কিন্তু এবারে পালাল দক্ষিণীরা যাদের উপর খানিকটা ভরসা তিনি করতেন সেই দেলওয়ারে ও মেরিল্যাণ্ডের সৈন্যদল তাঁরই নিজের দেশের লোক: পালাবার বেলা ইয়াংকিদের সঙ্গে কোন প্রভেদ ছিল না দক্ষিণীদের। ইয়াংকিদের মতই দিশেহারা হয়ে হাতের বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে উর্ধশ্বাসে পালাল।

চ্যাটারটন পাহাড় নামে একটা পোক্ত ঘাঁটিতে তিনি এদের মোতায়েন করে-

ছিলেন। পাথুরে দেয়ালের আড়ালে থেকে যাতে যুদ্ধ করতে পারে তার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। পার্শ্বরক্ষার জন্য হ্যামিলটন নামে একটি ছেলের তত্ত্বাবধানে দুটি কামানও দেওয়া হল। ব্রুকলিন ও নিউইয়র্কে বহু কামান হারাবার পর যে কটি কামান অবশিষ্ট ছিল বেপরোয়াভাবে সেগুলি ব্যবহার করতে ভার্জিনিয়ানের কষ্ট লাগত। ওয়াশিংটন কেল্লা এবং লী কেল্লা রক্ষার জন্য কয়েকটি কামান ছেড়ে দেবার পর, এখন হাতে কটি ফিল্ড-গানই বা আছে? একবার এক জায়গা থেকে তাড়া খাচ্ছে, আর তাঁর লোকজন এত সমরসম্ভার ফেলে পালাচ্ছে যে, সে ক্ষতি আর পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তখন খোঁজো হাতের কাছে কোথায় কামানের গোলা, বারুদ, সেকেলে গাদা-বন্দুক, বল্লম, মরচেধরা কীরিচ পাওয়া যায়। হাতড়ে কুড়িয়ে যতটা যা পাওয়া গেল তা-ই যথেষ্ট। প্রতিবার পশ্চাদপসরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নতুন করে সৈন্যদল গড়ে তুলবার মত ঝামেলা করতে হচ্ছে।

যাই হোক হ্যামিলটন যুঝল। পাশে দাঁড়িয়ে থেকে গোলন্দাজদের দিয়ে তোপ দাগবার ব্যবস্থাও করল। কিন্তু যেই একটি লোক উরুতে আহত হল, অমনিই শুরু হল পলায়ন। বারবার যা ঘটেছে আবারও সেই মর্মান্তিক দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হল। ফৌজদাররা গলা ফাটিয়ে চীৎকাব করে সৈনিকদের ফিরে দাঁড়াবার জন্য মিনতি জানাল, কিন্তু কে শোনে তাদের অনুনয় অনুরোধ! সামনে সুশৃংখল বৃটিশ ফৌজ দেখে যে যেদিকে পারে দৌড় দিল। ইঁদুরের মত কিলবিল করে আবারও ছুটে পালাল শত শত মহাদেশীয় গণসেনা। যে যেখানে পারল আত্মগোপন করবার চেষ্টা করল। কেউ আশ্রয় নিল ঝোঁপের আড়ালে কেউ চড়ল গাছে কেউ উবু হয়ে রইল লম্বা ঘাসের পেছনে...কেউ হৈমন্তিক শুকনো পাতার পাঁজার মধ্যে গুড়ি মেরে রইল .আবার কেউ বা হামা-গুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল জন্তু-জানোয়ারের গুহায়।

নিউইয়র্কের প্রশান্ত নীল-চোখো ওলন্দাজ বালক দিয়ে গড়া রেজিমেণ্টটি নিয়ে নিউইয়র্কবাসী জেনারেল ম্যাকড়ুগাল এই পলায়ন রোধ করবার চেষ্টা করলেন। তাঁর লোকজনকে তিনি একটা পাথুরে দেয়ালের আড়ালে দাঁড় করিয়ে দিলেন। কিন্তু তাদের স্থানচ্যুত করবার জন্য ইংরেজরা যেই এক কোম্পানী হালকা অশ্বারোহী পাঠাল, আর দশজনের মত তারাও জোট ভেঙে পিছন ফিরে দৌড় দিল।

আবার নেমে এল ঘোর অন্ধকার। কিন্তু এ দুর্যোগেরও শেষ ছিল।

ভার্জিনিয়ার ভদ্রলোকের বুক তখন অনেক শক্ত হয়েছে। বিপদ দেখে

এখন আর তিনি আগেকার মত হতাশায় মুহ্যমান হয়ে পড়েন না। আগের বার যেমন হাত পা ছেড়ে ঘোড়ার পিঠে বসেছিলেন...সব গেল সব গেল বলে যে শংকা তাঁর হয়েছিল, এবার আর তেমন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বার মত অবস্থা হল না। অত্যন্ত মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে একটু একটু করে এই মানসিক পরিবর্তন তাঁর হয়েছে। নিজে দাঁড়িয়ে তিনি এই পলায়ন দেখলেন। কিন্তু চোয়ালের সামান্য পরিবর্তন ছাড়া পার্ষদরা তাঁর বিশেষ কোন ভাবান্তর মালুম করতে পারল না। তাঁর চোখ-মুখের চারিধার কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। বেশ বোঝা গেল, তাঁর মধ্যে প্রচন্ড বিস্ফোরক কিছু টগবগ করছে। ক্ষুদ্র তরুণ হ্যামিলটনের চোখের জল কিম্বা সাধাসিধে একনিষ্ঠ পুটনামের গুরুগম্ভীর বকুনি তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারল না।

--আমরা এখনও এখানে রয়েছি। তিনি বল্লেন। আমেরিকান বাহিনী সম্পর্কে তার এই মন্তব্য শুনে মনে হল যে, এখনও এখানে টিকে থাকবার জন্য আমেরিকানরা বোধহয় বৃটিশের চাইতে বেশী কৃতিত্ব দাবী করতে পারে।

- তা বটে! তবে শ' পাচেক লোক আজ ভেগেছে এই যা! লী স্মরণ করিয়ে দিলেন।

—তারা আবার আসবে। গম্ভীরভাবে বল্লেন প্রধান সেনাপতি।—গোলমাল থেমে যাক, অন্ধকার হোক, আবার ফিরে আসবে তারা।

রাগে গরগর করে অস্ফুটকণ্ঠে বল্লে ম্যাকডুগালঃ দুত্তোর, বেজন্মা যত ভীরু কাপুরুষ!

– ঘোড়সওয়ার সম্পর্কে তাদের ভীতির জন্য কোন দোষ আমি দিই না। নিরুত্তেজ কণ্ঠে বল্লেন প্রধান সেনাপতি।–অশ্বারোহী সৈনিকের আক্রমণে ওরা এখনও অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু এ ভীতিও কেটে যাবে। ওরা বুঝতে পারবে যে পদাতিকের মত অশ্বারোহী সৈনিককে খতম করাও খুব কঠিন নয়। তেমনি নতুন আরও অনেক জিনিসই শিখবে জেনো।

তাঁর বিশ্বাসের মধ্যে উল্লাসের লক্ষণ ছিল না ; বরং চোখেমুখে সুকঠোর দৃঢ়তা ফুটে উঠেছিল। মুখের দিকে তাকালে কেমন ভয় ভয় লাগত। তাঁর কটা চোখের হিমানী দৃষ্টি দেখে বৃদ্ধ পুটনাম পর্যন্ত ভড়কে গেলেন। পোটোমাকের লাজুক চাষীর মনে দিনের পর দিন কি যে পরিবর্তন ঘটছে, তা তাঁর পার্ষদ, বন্ধু বা শত্রুদের কেউ অনুমান করতে পারল না। তবু একদিন যে লোকটি শুধু কাছের মানুষের ভালবাসার কাঙাল ছিল . যে শুধু শিয়াল শিকার করে জীবন কাটিয়ে দেবার স্বপ্ন দেখত, তার এই রূপান্তর

সকলেই দেখল এবং উপলব্ধি করল। এজন্য মাঝে মাঝে তাদের শংকা হত—আবার মাঝে মাঝে গর্বও অনুভব করত। চ্যাটারটন পাহাড়ে তাড়া খাবার দুদিন পরে রোজার্সের রেঞ্জার্স দলের দুজনকে পাকড়াও করে যখন আমেরিকান শিবিরে নিয়ে আসা হল, সেদিন প্রধান সেনাপতির আচরণ দেখে তারা খুশীই হয়েছিল।

বন্দী দুটি ওয়েস্টচেস্টারের ভদ্রলোক। তাদের হাজিরও করা হল ভার্জিনিয়ার সেরা ভদ্রলোক—পোটোমাক পাহাড়ের শিয়াল-শিকারী অভিজাতের সামনে। বন্দী দুটি ও শিয়াল-শিকারী। তিনজনেই এরা সমসূত্রে গাঁথা। বহু শতাব্দী পূর্বে ঢালাই করা হয়েছে এ জ্ঞাতিত্বের বন্ধন। সাধারণ মানুষের চাইতে, ভীত ছোটলোকের চাইতে, এদের স্থান অনেক উঁচুতে সংরক্ষিত। যতক্ষণ বন্দী দুটি প্রধান সেনাপতির ভাবব্যঞ্জনাহীন মুখের অর্থ উপলব্ধি করতে পারেনি, ততক্ষণ তারা বেশ খানিকটা চালিয়াতি দেখাবার চেষ্টা করল।

—তোমরা কারা? জিজ্ঞাসা করলেন প্রধান সেনাপতি।

বন্দীদের একজন বেশ স্বাস্থ্যবান, লম্বা, লাল টুকটুকে মুখ, সুদর্শন পুরুষ। বয়স বছর পঁয়ত্রিশেক। সবুজে বাফস্কিনের নিখুঁত ছাঁটকাটের সুট পরা লম্বামুখো বালকটির হয়ে সে-ই জবাব দিল।

—আমার নাম ক্যাপ্টেন লেসি, আর এর নাম লেফটন্যাণ্ট আলবার্ট। দুজনেই আমরা মেজর রোজার্সের রেঞ্জার্স দলের লোক।

—মেজর রোজার্স কে আমি চিনি না। গম্ভীরভাবে বল্লেন শিয়াল-শিকারী।

বন্দী দুটি অবাক দৃষ্টিতে তাকাল তাঁর দিকে।

—তবে হাঁ, রোজার্স নামে একটা লোকের কথা শুনেছি। আবার বল্লেন শিয়াল-শিকারী।

বন্দী দুটি চুপ করে রইল। বয়স্ক লোকটি কথা বলবার সুযোগের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

শিয়াল-শিকারী বলে যেতে লাগলেনঃ আমি শুনেছি সে ইংরেজ। তোমরা কি?

কথা বলার সূত্র পেয়েও বয়স্ক লোকটি বিষম ভুল করে বসল। সে বল্লেঃ স্যার, আমরা আশা করি এবং বিশ্বাস করি, ভদ্রলোক হিসাবে আপনি আমাদের প্রতি যথোপযুক্ত সুবিবেচনা করবেন। আপনার সঙ্গে কথা বলবার

সুযোগ পেয়ে নিজেদের আমরা ভাগ্যবান মনে করছি। তা না হয়ে যদি আমাদের ঐ সব...। নিজের ভুল বুঝতে পেরে লোকটি সহসা থমকে গেল।

—কি বলতে চাও তুমি?

—কিছুই না।

—কি বলতে চাও? কি বলতে চাও আমার লোকজনকে?

—মহাদেশীয় স্যর!

—আমরা আমাদের আমেরিকান বলি। সংযতগম্ভীর কণ্ঠে বল্লেন শিয়াল-শিকারী। —তুমিও ইংরেজ নও। জানিনা তোমাকে কি বলবো। কিন্তু যে বাফ্-স্কিনের জামা তুমি পরেছো, তাকে আমরা সামরিক উর্দি বলে গণ্য করি না। এই অবস্থায় তোমরা যখন আমাদের ঘাটির মধ্যে ঢুকে পড়েছো, তখন আইনত আমি তোমাদের ফাঁসি দিতে পারি। কিন্তু ভদ্রলোক হিসাবে তুমি আমার সুবিবেচনা দাবী করেছো। সার্জেন্ট, নিয়ে যাও এদের! প্রত্যেককে দু'শ ঘা চাবুক মারবে।

হোয়াইট প্লেইনসের যুদ্ধের পর এই সময়টায় মহাদেশীয় বাহিনীর অবস্থা ছিল চরম সংকটাপন্ন। অতলস্পর্শী গহ্বরের মুখে দাঁড়িয়েছিল আজাদী ফৌজ। তাদের পশ্চাতে হাডসন নদী; সামনের ব্যূহও ভেঙে পড়ছে। জেনারেল হাউ শেষ আঘাত হানলেই সব খতম হয়ে যেত। কিন্তু কেন যে জেনারেল হাউ এই আঘাত হানলেন না, বহুকাল ভার্জিনিয়ান তার কারণ বুঝে উঠতে পারেননি। পরে অবশ্য একটা জবাব মনে এসেছে। কিন্তু সে জবাবকেও নির্ভুল বলে মেনে নিতে পারেননি। হাউ সম্ভবত কল্পনাই করতে পারেননি যে সম্মুখভাগে আঘাত হানলে তের হাজারের একটি সৈন্যবাহিনী খান খান হয়ে ভেঙে পড়বে।

কিন্তু ভার্জিনিয়ান জানতেন, আঘাত যত সামান্যই হোক, আমেরিকান ফৌজ ভেঙে পড়ত। মনে প্রাণে তিনি জানতেন যে, তিনি সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন। ব্রুকলিন ও হার্লেমে তবু পলায়নের পথ ছিল. .সেই বিভীষিকাময় রবিবারের ভোরবেলাও নিউইয়র্কের মধ্য দিয়ে পালিয়ে হাজার হাজার সৈন্য ত্রাণ পেয়েছিল! কিন্তু এবারে তারা এমনভাবে কোণঠাসা হয়েছে যে পলায়নের পথ পর্যন্ত রুদ্ধ।

পলায়নের পথ রুদ্ধ—সর্বনাশ শিয়রে। যদি তিনি ভগ্নোদ্যম ইয়াংকি-

দের সরিয়ে নেবার চেষ্টা করেন, অমনিই ঝাঁপিয়ে পড়বে ইংরেজসেনা, ধ্বংস করে দেবে আমেরিকান ফৌজ। পন্থা যে একেবারই ছিল না তা নয়। পথ বেছে নিতেও তিনি পারতেন। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত হত ফাঁদে-পড়া প্রাণ-দণ্ডিতের নির্বাচনের মত। তাঁর সৈন্যদল তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একদল রয়েছে নিউইয়র্কের ওয়াশিংটন কেল্লায়, আর একদল হাডসন নদীর ওপারে লী কেল্লায় আর বাকী অংশ এই ওয়েস্টচেস্টারে। তাঁকে ছেড়ে যাবার সাধ্যমত চেষ্টা এই তিনভাগের সর্বত্রই চলেছে ব্যক্তিগতভাবে।

এ সত্ত্বেও তাঁর আচরণের মধ্য দিয়ে অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের ছবি সুপরিস্ফুট হয়ে উঠল। রণজয়ী বীরের মত তিনি কাজকর্ম করে যেতে লাগলেন...সৈন্য পরিদর্শন করলেন..দলত্যাগীদের শাস্তি দিলেন...পত্র লিখলেন কংগ্রেসের কাছে...আবার সন্ধ্যাবেলা পার্ষদদের নিয়ে মাদেরার আসর জমিয়ে কংগ্রেসের সম্মানার্থে এবং ত্বরিত বিজয় কামনা করে মদ্যপানও করলেন।

চলবার পথের সঠিক নিশানা বুঝতে পেরে মনের মধ্যে তিনি খানিকটা শান্তি পেয়েছেন। কত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে তার হদিস জানা ছিল না; তবু চলার গতি তিনি ঠিকমতই বুঝতে পারলেন।

চতুর্থ পর্ব

জার্সি

ওয়াশিংটন কেল্লা

সতেরোশ' ছিয়াত্তর সালের বারোই নভেম্বর কন্‌কনে নির্মল প্রভাতে হাড্‌সন নদীর পাড়ে দাঁড়িয়েছিলেন ভার্জিনিয়ান। খেয়া পার দেখছিলেন। মার্বলহেডের জেলেরা এক ব্রিগেড আজাদী ফৌজ সুশৃংখলভাবে জার্সিতে পার করে দিল। এক পাত্র চা, কেক ও মধুর সঙ্গে দু'মগ ফ্লিপও ইতিমধ্যেই ভার্জিনিয়ানের পেটে গেছে। মাঝে মাঝে দু' একটা ঢেঁকুর উঠছে। সকাল-বেলার পরিতোষ ভোজনে মেজাজটা বেশ খুশীই আছে। তাছাড়া ফুরফুরে হাওয়া লাগছে চোখে মুখে...জীবন মনে হচ্ছে আনন্দময়। আজ স্ত্রীর একখানা চিঠি পড়লেন; জবাবও সকালবেলাই দিয়ে দিয়েছেন। আগের দিন রাত্রে বোতল তিনেক মাদেরা গিলে একটানা ঘণ্টা তিনেক নেচেছেন। আজকের প্রভাতের সোণার বরণ সূর্য, ফুরফুরে হাওয়া, আন্দোলিত বৃক্ষপত্র এবং রৌদ্র-ঝলমল শীতল নদীবক্ষ তাঁর দিলখোশ ভাবটা আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

লোকজনের মধ্যে কাউকে যদি তিনি প্রশংসা করতেন, ভালবাসতেন বা শ্রদ্ধা করতেন তো সে ঐ মার্বলহেডের জেলেরা। তিনি জানতেন, তাঁকে এবং তাঁর সমগোত্রীয়দের জেলেরা ঘৃণা করে। তবু তাদের ধীরস্থির নয়া-ইংলণ্ডী দক্ষতা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। এরা যেমন তাঁর চোখে বিদেশী, তিনি তেমনি ওদের দৃষ্টিতে পরদেশী—অচেনা। তিনি বেশ বুঝতে পারেন যে, ভারনন্‌ পাহাড়ে জর্জিয়ান কায়দায় তৈরী নয়নাভিরাম ঘর বাড়ী দেখে এরা হাঁ করে থাকবে। ক্ষেত-খামারে নিগ্রো ক্রীতদাসদের কাজ করতে দেখে মনে মনে বিষম চটে যাবে কিন্তু মুখে কিছু বলবে না। এদের একটা বিশিষ্ট ধরণ আছে। ধ্যানধারণার নির্দিষ্ট একটা ছক আছে। তাঁর ধ্যানধারণা কোনদিনই ছকে বাঁধা নয়। লক্ষ্য স্থির করে সুনির্দিষ্ট পথে যারা সুনিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে পারে তাদের তিনি হিংসে করতেন। আবার এদের সম্পর্কে ভীতিও ছিল। তিনি জানতেন, এ রকম হাজার পাঁচেক লোক পেলে অনা-য়াসেই বৃটিশদের ঝেঁটিয়ে নদীতে ফেলতে পারেন। কিন্তু ইংরেজদের সঙ্গে

মোকাবিলার পর এই পাঁচ হাজার লোক যে কি করবে তা বুঝতে পারতেন না, —এমনকি কল্পনাও করতে পারতেন না। তাই ভয় হত।

আজকের এই সকালবেলা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করবার কোন চাড় ছিল না। লোকজন এখন জার্সির হাকেনসাকের পথে চলেছে নতুন ছাউনির দিকে। নিজে তিনি জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে লী কেল্লায় যাবার চিন্তায় মশগুল হয়ে আছেন। পশ্চাতে সৈন্য সংস্থাপনার সুব্যবস্থাই করা হয়েছে। মনে হচ্ছে, আগে যে অবস্থা ছিল, তার চাইতে এখন তাঁর অবস্থা অনেক ভাল। জেনারেল হিথের অধীনে দুহাজার সৈন্য হাডসন নদীর উজানে চড়াই অঞ্চল আগলে আছে। ওয়েস্টচেস্টারে আর পাঁচ হাজার আছে জেনারেল চার্লস লীর নেতৃত্বে। বহু লোক দলত্যাগ করে গেছে বটে; তবু সব কিছু মিলিয়ে চিন্তা করলে তাঁকে ভাগ্যবান বলতে হবে। কারণ হোয়াইট প্লেইনসের যুদ্ধের পর ওয়াশিংটনকে মুঠোর মধ্যে পেয়েও জেনারেল হাউ আঘাত হানতে ইতস্তত করেছেন। ভার্জিনিয়ান এই আচরণের কোন অর্থ খুঁজে পাননি। তিনি সুনিশ্চিত জানতেন, হাউ মুখোমুখি আক্রমণ শুরু করা মাত্র গোটা আমেরিকান বাহিনী খান খান হয়ে যাবে। জলে-পড়া মানুষের মত ভার্জিনিয়ান এই সুনিশ্চিত সর্বনাশের জন্য প্রতীক্ষা করেছেন। নিজেকে দৃঢ় করেছেন পরিণামের কথা ভেবে। কিন্তু সে পরিণাম এল না। হাউ যখন হেলায় এই সুযোগ হারান, ইংরেজ শিবিরের তখনকার কিছু কিছু সংবাদ ভার্জিনিয়ান জানতে পেরেছিলেন। কেউ বল্লে, পেলস্ পয়েণ্টের বিভীষিকাময় রক্তাক্ত স্মৃতির ধকল হাউ সামলে উঠতে পারেননি। আর সবাই অনুমান করে বল্লে, জেনারেল হাউ চট করে বিদ্রোহ দমন করতে ভরসা পাচ্ছেন না, কারণ বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতি ইংলণ্ডে ক্রমেই বেড়ে চলেছে এবং এখানকার অগ্নিশিখা অতলান্তিক সমুদ্র ডিঙিয়ে বৃটিশ দ্বীপে আগুন জ্বালাতে পারে এমন সম্ভাবনাও যে নেই তা নয়। কিন্তু এর সব কিছুই অনুমান—নির্ভর করা চলে না। তবে জেনারেল হাউ যখন নিউইয়র্কে ফৌজ ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন, ভার্জিনিয়ান নিশ্চিন্ত হলেন। বুঝতে পারলেন, বিপদ কেটে গেছে। কিন্তু সর্বনাশা ধ্বংসের হাত থেকে কেন যে তিনি ত্রাণ পেলেন, তার কোন সংগত কারণ কোনদিনই বুঝতে পারেননি।

ইতিমধ্যে তাঁর হাজার চারেক সৈন্য জার্সি পৌঁছে গেছে। লী কেল্লায় গোছগাছ করে নিয়ে মানহাট্টানের ওয়াশিংটন কেল্লা থেকে সৈন্য নিয়ে আসবার জন্য জেলেদের যদি কাজে লাগাতে পারেন, তাহলে নদীর উভয় তীরে

তাঁর হাজার আটেক সৈন্য থাকবে। এ পর্যন্ত ইংরেজ ফৌজই কড়াভাবে সাঁড়াশী আক্রমণ চালিয়েছে তাদের ঘের দেবার জন্য, কিন্তু তখন তিনিই সাঁড়াশী অভিযান চালাতে পারবেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে।

মোটামুটিভাবে স্রোত ফিরেছে বলেই মনে হয়।

সৈন্যদল নদী পার হয়ে আসবার পর প্রধান সেনাপতি তাদের সামরিক অভিবাদন গ্রহণ করলেন এবং লক্ষ্য করে দেখলেন, তারা বেশ কেতাদুরস্তভাবেই মার্চ করে গেল। ইংরেজ ফৌজ এবং তাদের মাঝখানে হাডসন নদী থাকায় সৈনিকেরাও আজ বেশ খোসমেজাজে আছে। মাত্র দু'জন স্টাফ অফিসার সঙ্গে নিয়ে প্রধান সেনাপতি পাহাড়ে পথ ধরে লী কেল্লার দিকে চল্লেন।

গোটা দিন এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর উৎফুল্ল ভাব বজায় ছিল। রাত কাটাবার জন্য একটা অগোছাল ওলন্দাজ খামারে তাঁরা অতিথি হলেন। আট বছর ও ছয় বছরের ছোট্ট দুটি মেয়ে ছিল সে বাড়ীতে। মেয়ে দুটির সলজ্জ কৌতূহলী ভাব এবং দীর্ঘকায় ভার্জিনিয়ানের গাম্ভীর্য ঘুচে যেতে যতটা সময় লাগল ততক্ষণে তাদের প্রায় শোবার সময় হয়েছে। আগুনের চুল্লীতে লৌহশলাকা তাতান হচ্ছে ক্লিপ তৈরী করার জন্য। খাবার ঘরে বসে ভার্জিনিয়ান মেয়ে দুটিকে বড়জোর ঘণ্টাখানেক গল্প শোনাতে পারেন। গল্প বলতে কোনকালেই তিনি ওস্তাদ নন। এহুল তাঁর অভিজ্ঞতা। দুনিয়াদারির হাল সম্পর্কে অনেক খোঁজ খবরই রাখতেন। তবু সে সম্পর্কে তাঁর কোন বর্ণনাই প্রাণবন্ত বা রোমাঞ্চকর হত না। কোন মতে একটানা বলে যেতে পারতেন।

ইণ্ডিয়ানদের সম্পর্কে মেয়েদুটিকে গল্প শোনাতে গিয়ে তিনি বল্লেনঃ ছটি ইণ্ডিয়ান লুকিয়ে ছিলো এক জঙ্গলের মধ্যে। জঙ্গলে না ঢুকে তাদের গুলী করবার উপায় ছিলো না। সেদিকে গিয়ে দেখি, আরও জনা দশেক ইণ্ডিয়ান লুকিয়ে আছে পাহাড়ের মাথায়। তখন সবাইকেই আমরা গুলী করে মারলাম।

সহসা আঁতকে উঠল মেয়েদুটি। কমবয়সী মেয়েটি তাঁর কোলে ছিল। আরও কোল ঘেঁষে ঘাপটি মেরে রইল সে। তাঁর গল্প শুনে ঘাবড়ায়নি কেউ। কিছুই হয়নি তাঁর কথায়। কিন্তু কি বিরাট লোক তিনি! আগুনের চুল্লীর স্তিমিত আভা পড়েছে তাঁর মুখের ছোট্ট ছোট্ট ব্রণের দাগে। অমন চমৎকার নীল জ্যাকেট আর বাফ্ পাজামা-পরা তার বিরাট চেহারা দৈত্যের চেয়েও বড়। গল্প-বলা শেষ হলে ওলন্দাজ উচ্চারণ-ভংগীতে আট বছরের মেয়েটি বল্লেঃ

খুব ভাল গল্প! বাবা বলেছেন, আপনি মস্তবড় একজন বীর, কিন্তু বড্ড বেশী মদ খান।

—তাই বুঝি?

—কেন অত মদ খান? গোমরামুখে মেয়েটি আবারও জিজ্ঞাসা করে।

—খুব বেশী খাই না তো! আর পাঁচজনে যতটা খায় আমিও ততটুকু খাই।

এতেও নিরস্ত না হয়ে ম্লানমুখে মেয়েটি আবারও বলেঃ বাবা বলেছেন, একবার যখন এসেছেন তখন আজ রাতে মদ খেয়ে বাবাকে বাড়ী-ছাড়া করবেন।

পরদিন দুপুরবেলা তিনি লী কেল্লায় পৌঁছুলেন। খানিক পরে অবাক হয়ে শুনলেন, মানহাট্টান দ্বীপ থেকে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে আসবার পরিবর্তে গ্রীন সেখানে আরও সৈন্য পাঠিয়েছে বলবৃদ্ধির জন্য। লোকজনের সামনে কোন কথা বল্লেন না। কিন্তু নিজের শিবিরে সুদর্শন তরুণ কোয়েকারকে একলা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেনঃ একি বাজে পাগলামি করেছো নাথানেল?

--পাগলামি কাকে বলছেন স্যর!

—নিশ্চয় পাগলামি। কেল্লা থেকে লোকজন সরিয়ে আনবার ব্যবস্থা কবলে না কেন? কেন আবার নিউইয়র্কে সৈন্য পাঠাতে গেলে?

—আমরা কেল্লা রক্ষা করবো স্যর!

—রক্ষা করবে? কেল্লা রক্ষা করা যায় না।

—এ আপনি কি বলছেন স্যর! কেন রক্ষা করা যাবে না? ঐ ঘৃণ্য স্বপক্ষত্যাগী ইংরেজ লী'র কথায়...

—গ্রীন!

—মাফ করবেন স্যর!

বড় আদমী গম্ভীরভাবে বল্লেনঃ শুধু আমার কাছে মাফ চাওয়াটাই সব কিছু নয় জেনারেল গ্রীন! এই বাহিনীতে জেনারেল লী'র পদমর্যাদা কেবল-মাত্র আমারই নীচে। আমি চাই, সব সময় একথাটা স্মরণ রেখে চলবে। মনে রাখবে, তাঁর আদেশও বিনা-দ্বিধায় শ্রদ্ধার সংগে শিরোধার্য করে নিতে হবে। এ সম্মান তাঁর প্রাপ্য।

স্থির দৃষ্টিতে গ্রীন তাকাল প্রধান সেনাপতির দিকে। তারপর নীরবে মাথা ঝেঁকে অস্ফুট কণ্ঠে বল্লেঃ কি আর বলবো স্যর! আপনি আমায় আর কি করতে বলেন, বলুন? আপনি কি চান, আপনার সামনে নতজানু হয়ে আমায়

হলপ করতে হবে? যদি তাই চান তো বলুন—আমি তা করতেও প্রস্তুত। বিদ্রূপের বিন্দুমাত্র আভাষ ছিল না গ্রীনের কণ্ঠস্বরে।

এর পর দু'এক মিনিট চুপচাপ থেকে ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন ভার্জিনিয়ানঃ তোমার কি বিশ্বাস নাথানেল, ও কেল্লা রক্ষা করা যাবে?

—চিরকাল!

—না না চিরকালের কথা থাক। ধরো এক হপ্তা কি মাসখানেক?

—এক মাসের কথা কি বলছেন স্যর! একবার আমাদের একটা সুযোগ দিয়ে দেখুন না! নিউইয়র্কে যা খুশী করেছে ইংরেজরা। এবারে আমাদের একটা সুযোগ দিয়ে দেখুন না!

—বেশ, সে সুযোগ তোমরা পাবে। ভার্জিনিয়ান রাজী হলেন।

গ্রীন নীরবে ঘাড় নোয়াল; কিন্তু কথা বলতে ভরসা পেল না। কি বলতে কি বলে বসবে - দরকার কি?

লী কেল্লা থেকে মাইল পাঁচেক দূরে পালিসেদ পর্বতমালার মাথায় হাকেনসাক-এ সৈন্যবাহিনী ছাউনি ফেলেছিল। সেইদিন সন্ধ্যাবেলা ঘোড়ায় চড়ে বড় আদমী সৈন্য শিবিরে হাজির হলেন। হাকেনসাকের আবহাওয়া এখনও ভালই আছে। তাছাড়া বৃটিশ বাহিনী খানিকটা দূরে আছে বলে সৈনিকদের মন-মেজাজও বেশ খুশী। অধিকাংশ সৈনিকই জার্সির লোক। এখন যদি কোন সময় দল ছেড়ে ভেগে পড়বার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে আর তো মাইলখানেক চওড়া নদী পার হতে হবে না! ইয়াংকিরা রয়ে গেছে লী'র সঙ্গে ওপারে। কিন্তু এপারে যে সব লোকজন এসেছে, তাদের ক্ষয়ক্ষতি অপেক্ষাকৃত কম হয়েছে। তাছাড়া একদিকে যেমন আশু সংগ্রামের কোন সম্ভাবনা নেই, তেমনি আবার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও ইদানীং অনেক ভাল হয়েছে আগেকার কয়েক সপ্তাহের তুলনায়। ফলে, যেমন করেই হোক এদের মাথায় একটা বিশ্বাস জন্মে গেছে যে তারা বিজয়ী ফৌজ। নতুন শিবিরের আশেপাশে পাভিয়াক্ ও পেটারসনের বেশ কিছু মেয়ে আনাগোনা শুরু করায় এ বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছে। বড় আদমী যখন এসে পৌঁছুলেন চারপাশে ভীড় করে সৈনিকেরা সোল্লাসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। বহুদিন এমনি সাদর অভ্যর্থনা তাঁর ভাগ্যে জোটেনি; তাই প্রজ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের পাশে দাঁড়িয়ে নক্সের কাছে এই অভ্যর্থনার গল্প বলছিলেন।

- এতদিন হালচাল এমন খারাপ যাচ্ছিলো যে এদের ভাবসাব আমার খুবই ভালো লেগেছে। এখন এরা অনেকটা ভালো আছে। ওয়াশিংটন কেল্লা রক্ষা

করবার জন্য নাথানেল পীড়াপীড়ি করতে লাগলো দেখে আমি খানিকটা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম।

এই কেল্লার নামটা তিনি বরাবরই সসঙ্কোচে উচ্চারণ করতেন। তাঁর মত অখ্যাত এক ভার্জিনিয়ার চাষীর নাম অনুসারে সাধারণতন্ত্রের একটি দুর্গের নামকরণ হয়েছে—এ কথা ভেবে ছেলেমানষী এক গোপন-গর্বে তাঁর বুক ফুলে উঠত।

—আপনি কি ওদের দুর্গ রক্ষার অনুমতি দিয়েছেন? সাগ্রহে জানতে চাইল নক্স।

—হাঁ দিয়েছি! কিন্তু লী...

—ও ব্যাটার কথা ছেড়ে দিন! মাফ করবেন স্যার! আমার ভুল হয়ে গেছে! সত্যিই আমি দুঃখিত। কিন্তু...একটা লড়াই করার সুযোগ আমাদের দিতেই হবে। বলুন, দেবেন কি না?

—দেবো। তবে হাঁ. সে যদি কেল্লাটা রক্ষা করতে পারে, তাহলে ওটা হাউয়ের পথে বেশ ভাল একটা কাঁটা হয়ে থাকবে। কংগ্রেসও কেল্লাটা রক্ষা করবার পক্ষপাতী।

—আমায় বিশ্বাস করুন স্যার, নরক সৃষ্টি হলেও আমরা রুখতে পারবো। আমরা তো পরাজিত হয়নি—পিছু হটে এসেছি। লড়াইয়ে ইংরেজরা আমাদের হারাতে পারেনি। আমার কথাই ভাবুন না স্যার। গোলন্দাজ দলের ফৌজদার আমি। কিন্তু কোথায় গেলো আমার কামান? ব্রুকলিনে নিউইয়র্কে ওয়াশিংটন কেল্লা আর লী কেল্লায় পড়ে আছে। কিন্তু ভগবানের দোহাই. আমি হলপ করে বলতে পারি স্যার, সব কামান হারালেও কিছু এসে যাবে না। কিছুতেই আমরা পরাভূত হবো না। প্রথম যখন শুরু করেছিলাম, তখনও কোন কামান ছিলো না আমাদের...। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল তরুণ বই-বিক্রেতা।

—নক্স!

—বলুন স্যার!

—শোওগে যাও। খানিকটা বিমর্ষভাবে বল্লেন বড় আদমী। নক্স খানিকটা ইতস্তত করছে দেখে আবার বল্লেনঃ আমি বলছি, ঘুমোও গে।

বিস্মিতভাবে নক্স তাকাল প্রধান সেনাপতির দিকে। কিন্তু কোন ওজর আপত্তি না করে নীরবে চলে গেল। আর তিনি কলরব মুখর ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত শিবিরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। সামনে সামান্য একটু ঝুঁকে অর্ধ-

নিমীলিত চোখে মেপে মেপে লম্বা লম্বা পা ফেলে ধীরে ধীরে হাঁটছেন। বহু আগুন জ্বালিয়েছে সৈনিকেরা। কোনটার আলোই তাঁর আধ-বোঁজা কটা চোখে প্রতিফলিত হচ্ছে না। তাঁর দীর্ঘ বাহু ঝুলান রয়েছে দুই পাশে। যদিও নাক-সোজা চেয়ে হাঁটছেন, তবু চারিধারের হরেক রকম হাবভাব নড়াচড়া গুঞ্জন তাঁর দৃষ্টি এড়াচ্ছে না। তাঁকে আসতে দেখেই সৈনিকদের কলগুঞ্জন হিসহিস ফিস্‌ফাস্‌ শব্দে পরিণত হচ্ছে। জটলা করে যারা হাসিঠাট্টায় মশগুল হয়ে আছে...কিম্বা মুখ গোমরা করে নীরবে যারা ক্ষোভে গরগর করছে ...আনমনে একলা বসে উদাসভাবে যারা ওলন্দাজ স্কচ্‌ কি ওয়েল্‌শ বিষাদ-সংগীত গাইছে, তাদের সবাইকেই লক্ষ্য করলেন প্রধান সেনাপতি। পাঁচশ' বছর এদের সাবেক দেশে যে লোকসংগীতের সুর বেঁচে রয়েছে, জার্সির দেশ-গাঁয়ের পথেঘাটেও শতাধিক বছর সে সুর ভেসে বেড়াত। সৈন্যশিবিরের অগোছাল বিশৃংখল অবস্থাও তাঁর দৃষ্টি এড়াল না। তিনি লক্ষ্য করলেন যে তাঁবুগুলি শতছিন্ন...পরিহাসউচ্ছল দেশগাঁয়ের হৃষ্টপুষ্ট আলুলায়িত-কেশ যুবতী বারবনিতারা তাঁকে আসতে দেখে আড়ালে লুকোবার চেষ্টা করছে। শিবিরের যত্রতত্র আঁস্তাকুঁড়। জঞ্জাল সাফ করবার কোন চেষ্টাই করেনি সৈনিকেরা। নোংরা জঞ্জাল জড়ো করে এখানে সেখানে আঁস্তাকুঁড় বানিয়ে রেখেছে আর কতগুলো শুয়োর পরমানন্দে তার মধ্যে বিচরণ করছে। মরচে-ধরা কীরিচ লাগান বন্দুকের পাঁজা...নড়বড়ে রসদের গাড়ীটানা অস্থিসার গুটি কয়েক ঘোড়া...এখানে ওখানে টাল দেওয়া অযত্নরক্ষিত খাদ্য ও গোলা-বারুদ... এমনি অনেক কিছুই তাঁর নজরে পড়ল।

হাঁটতে হাঁটতে গত কয়েকদিনের উৎফুল্ল ভাবটা উবে গেল। ভাবী বিপদের শংকায় মনটা কেমন আতঙ্কিত হয়ে উঠল। প্রতিনিয়ত মেলামেশা করলেই উপলব্ধি করতে পারেন, কি রকম ফৌজের নেতৃত্ব তিনি করছেন। দু' একদিন খানিকটা দূরে সরে থাকলে নতুন চোখে দেখতে পারেন এদের। আজ যেমন নতুন করে দেখলেন। তখনই আবার সাবেক অন্তহীন নৈরাশ্য তাঁকে ঘিরে ধরে। নক্স বা তার মত আর দশজনকে দোষ দেওয়া নিরর্থক—মনে মনে ভাবলেন তিনি। সাধ্যমত চেষ্টার কসুর তারা করছে না। নির্ভীক—অকুতোভয় তারা। তাদের সাহসিকতা হয়ত ভার্জিনিয়ার ভদ্রলোকের মত নয়। এই দোকানদার আর কারিগরদের সাহসিকতার মধ্যে নির্বোধ হোঁতকামি হয়ত আছে। তবু তারা যে নির্ভীক, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

নিজের তাঁবুতে ফিরে দুখানা মোমবাতির মিটমিটে আলোয় তিনি স্ত্রীকে

পত্র লিখতে বসলেন। টেবিলের উপর কাগজ ছড়িয়ে কলমে কালি তুলে যেই লিখতে গেলেন, অমনিই কম্প জ্বরের মত বাড়ীর টান সহসা তাঁকে অস্থির করে তুলল। এমন আকস্মিক, এমনি উদগ্রভাবে ঘরমুখো টান তাঁকে উতলা করে তুলল যে, হাতের কলম ফেলে দিয়ে টেবিলের পর ঝুঁকে দুই হাতে মুখ চেপে তিনি আঙুলের ফাঁকে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন। মন চলে গেল ভারনন পাহাড়ে। বাড়ী ফিরবার তেমন আগ্রহ কোন কালেই তিনি অনুভব করেননি। কিন্তু এই মুহূর্তে শিয়াল-শিকারী চাষী জীবনের জন্য মনটা আঁকুপাঁকু করে উঠল। একান্তভাবে ফিরে পেতে চাইলেন ভারনন পাহাড়ের চিরঅভ্যস্ত জীবনধারা। মনে পড়লঃ সূর্যোদয়ের পূর্বে উঠে একলা রান্নাঘরে বসে প্রাতরাশের সঙ্গে কড়া দুতিন পেয়ালা ভাল চা খেয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেড়িয়ে পড়তেন রাত্রির শিশির-ভেজা প্রান্তরে। ডোরাকাটা কুকুরগুলো যেত পেছু পেছু। খোসমেজাজে অবজ্ঞার ভাব দেখিয়ে কয়েকটা ধমক দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা ছুটে দৃষ্টির অন্তরালে অন্তর্হিত হয়ে যেত। কখন-সখন শিয়ালের সন্ধান পেলে সেটা নাগালের বাইরে ছুটে না পালান পর্যন্ত দু' এক মাইল তাড়া করে নিয়ে যেত, তারপর ব্যর্থকাম হয়ে জিভ বার করে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে আসত প্রভুর কাছে বিমূঢ় ভাবে। শিকারের পালা সাঙ্গ করে বেশ কিছুটা চাঙ্গা হয়ে খোসমেজাজে ঘরে ফিরতেন। তখন মার্থার সঙ্গে দ্বিতীয়বার প্রাতরাশ খাওয়া হত। কিন্তু সকালবেলা মার্থার মেজাজটা খিট্‌খিটে থাকত বলে খাবার আসর তেমন জমত না। এর পর হিসাবের খাতাপত্তর নিয়ে বসতেন। মনে মনে একাজ তিনি খুবই পছন্দ করতেন। তারপর কিছুক্ষণ গত হপ্তা দুয়েকের তাসখেলার জিতের কথা ভেবে মশগুল হয়ে থাকতেন। কখনও বা শুয়োর কেনা-বেচায় তাঁকে ঠকাবার জন্য কোন পড়শীর উপর সাময়িকভাবে বিগড়ে যেতেন। কোনদিন হয়ত দু'একজনকে লাঞ্চে নেমন্তন্ন করে ভাল ভাল কথা শুনতেন, ভাল খাবার খেতেন, ভাল মাদেরা খেতেন, ভাল ব্রাণ্ডিও চেখে দেখা হত। তারপর বারান্দায় আড্ডা জমিয়ে ঘণ্টাখানেক রাজনীতি নিয়ে আলোচনা চলত। বিকেলে আবার বেরিয়ে পড়তেন মাঠে। সেখান থেকে তাসের আড্ডায়। ডিনারের সময় পর্যন্ত ঘণ্টা দুয়েক তাসের আড্ডাতেই কাটত। আর দশজনের মত এই ছিল তাঁর দৈনন্দিন জীবন। এমন আয়াসীও নয়, তেমন কঠোরও নয়। কিন্তু ছকে বাঁধা সন্তুষ্ট জীবনধারার একঘেয়েমিতে হাঁপিয়ে উঠলেন তিনি। চমকপ্রদ অভিনবত্বের জন্য, মহান গৌরবোজ্জ্বল কোন য়্যাড্‌ভেঞ্চারের জন্য মন উতলা হয়ে উঠল।

হাতের তেলোয় মুখ চেপে অনেকক্ষণ বসে রইলেন শিয়াল-শিকারী।

তিনি হাকেনসাক পেঁছুবার তৃতীয় দিন শেষ বেলায় লী কেল্লা থেকে স্বেদসিক্ত ঘোড়ায় চড়ে একজন বার্তাবহ এসে সংবাদ দিল যে ইংরেজরা ওয়াশিংটন কেল্লা আক্রমণ করেছে এবং জেনারেল ওয়াশিংটনকে অবস্থা জানাবার জন্য জেনারেল গ্রীন তাকে পাঠিয়েছেন।

—অবস্থা কি রকম? বড় আদমী জানতে চাইলেন।

—আমার মনে হয় স্যর, অবস্থা ভালোই। সৈনিকদের মধ্যে খুব উৎসাহের ভাব দেখে এলাম। এতক্ষণে তারা অনেক বৃটিশ খতম করেছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

বড় আদমী স্বেদসিক্ত উৎফুল্ল বার্তাবহটির মুখের দিকে তাকালেন। তারপর সহসা এক লাফে ঘোড়ায় চড়ে পালিসেদ পাহাড়ের দিকে ছুটলেন। হাডসন নদী ও মানহাট্টান দ্বীপের মুখোমুখি উঁচু পাহাড়টির প্রন্তদেশে যখন পেঁছুলেন, তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। ওয়াশিংটন কেল্লার দিক থেকে কামানের গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে অন্ধকারের বুক চিরে আগুনের মত দু' চারটি আলোর ঝলক ছুটে যাচ্ছে। কিন্তু নিশ্চয় ব্যাপক কোন আক্রমণ হয়নি এখনও। বন্দুকের কোনও আওয়াজই তাঁর কানে এল না।

—জেনারেল গ্রীন কোথায়? মেজর গ্যালোওয়েকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি। লী কেল্লা রক্ষার ভার তার উপরেই পড়েছে।

—ওপারে গেছেন স্যর।

—জেনারেল পুটনাম?

—তিনিও ওয়াশিংটন কেল্লায় আছেন স্যর!

মিনিট পনেরো নীরবে পায়চারি করলেন বড় আদমী। শংকা ও উৎকণ্ঠায় মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। বার বার ঘড়ি দেখতে লাগলেন। কান খাড়া করে রইলেন হাডসনের ওপার থেকে শব্দ শুনবার আশায়। বার বার ওপারের দিকে চেয়ে আঁচ করবার চেষ্টা করলেন যে লড়াই হচ্ছে কি না। অবশেষে এই অনিশ্চিত সংশয়াকুল অবস্থা অসহ্যবোধ হল। মেজরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেনঃ খেয়াঘাটে কোন নৌকা পাওয়া যাবে?

—পাওয়া যেতে পারে স্যর।

—তাহলে মশাল দিয়ে পথটা দেখিয়ে দেবার জন্য কাউকে ডাকুন তো! আমি ওপারে যাবো।

—বেশ, যাওয়া যদি উচিত মনে করেন তো ডাকছি।

—বাজে বকবেন না মেজর! আমার কাজের ভালমন্দ বিচার করবার জন্য আপনার পরামর্শের কোনো আবশ্যক হবে না।

ধমক খেয়ে মেজর নীরবে সরে পড়ল এবং একটু বাদেই পাইন কাঠের মশাল হাতে একটি গণসেনাকে নিয়ে ফিরে এল। মশালের লালচে দপদপে আলোয় আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে দু'-চারটে হোঁচট খেয়ে বড় আদমী পারঘাটায় হাজির হলেন। ঘুমন্ত একজন মাঝিকে জাগিয়ে হালের কাছে বসে নিজেই ঠেলে ভাসিয়ে দিলেন নৌকাখানা। জলের মধ্যে দাঁড় পড়ল কিন্তু মাঝিরা বাইচে না দেখে খেঁকিয়ে উঠলেনঃ করছিস কি—দাঁড় টান।

নৌকাখানা মাঝগাঙে আসতেই ভার্জিনিয়ান আর একখানা নৌকার দাঁড়-টানার শব্দ ও জলের ছপাৎ ছপ্ শুনতে পেলেন।

--কে যায়? ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন।

—আমেরিকান।

—আমরাও আমেরিকান! তাঁর নৌকার মাঝিরা হেঁকে জবাব দিল।

—হ্যালো, কে যায়?

—কে? নাথানেল নাকি? ভার্জিনিয়ান জিজ্ঞাসা করলেন।

নৌকা দু'খানি কাছাকাছি এগিয়ে এল। মাঝিরা বেঁধে নিলে নৌকা দু'খানি। তখন জেনারেল গ্রীন ও জেনারেল পুটনামকে চিনতে পারলেন বড় আদমী। পুটনামের মুখে সুস্পষ্ট বিরক্তির ভাব। কুঞ্চিত মুখেই মাথা নেড়ে ভার্জিনিয়ানকে অভিবাদন জানালেন তিনি। গ্রীন কিন্তু প্রসন্ন হাসিভরা মুখে হাত বাড়িয়ে কমাণ্ডারের হাত চেপে ধরল।

—আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে বড় খুশী হয়েছি স্যর! সত্যিই খুব খুশী হয়েছি। সে বল্লে।

—ওদিকে কি হয়েছে বলো। ইংরেজরা আক্রমণ করেছে? সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন বড় আদমী।

—না স্যর, এখনও করেনি। আমাদের চমকে দেবার জন্য দু'একটা তোপ দাগছে মাত্র। আমরাও ওদের চমকে দেবার জন্য দু' একটা তোপ দেগেছি। এখনও আক্রমণ করেনি। একটা ভারী চমৎকার ব্যাপার হয়েছে স্যর! বলছি শুনুন, ভারী মজার ব্যাপার! ম্যাগকে আত্মসমর্পণের অনুরোধ জানিয়ে হাউ একজন লোক পাঠিয়েছিলো। জানেন স্যর, লোকটা এসে নাক সিটকে ইংরেজদের মতো টেনে টেনে বল্লেঃ স্যর কর্নেল ম্যাগ, আপনি যদি আত্ম-

সমর্পণ করেন তো জেনারেল হাউ আপনাকে মোলায়েম এবং উদার শর্ত দিতে সম্মত আছেন; কিন্তু তিনি যদি আক্রমণ করে কেল্লা দখল করতে বাধ্য হন তবে...শুনেছেন স্যর, আপনার নামের কেল্লা আক্রমণ করে দখল করবে!

—যা বলছিলে বলো নাথানেল।

—কিন্তু তিনি যদি আক্রমণ করে কেল্লা দখল করতে বাধ্য হন তবে তাঁর লোকজন যে চরমে উঠবে না, এমন প্রতিশ্রুতি তিনি দিতে পারেন না। কর্নেল ম্যাগও তেমনি চাপা বিরক্তির ভাব দেখিয়ে জবাব দিলেঃ আক্রমণ করবেন? সত্যি স্যর, ম্যাগ বল্লে, আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে হিজ্ এক্সেলেন্সী তাঁর এবং বৃটিশ জাতির পক্ষে অপমানকর এমন একটা হুমকি কাজে পরিণত করবেন। তার পর স্যর, ম্যাগ আরও বল্লে, আমার হয়ে হিজ এক্সেলেন্সীকে এইটুকু জানিয়ে দেবেন, মানবজাতি যে মহত্তম আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে চিরকাল সংগ্রাম করেছে, সেই আদর্শের জন্য শেষ সৈন্যটি জীবিত থাকা পর্যন্ত এই কেল্লা রক্ষা করতে আমি দৃঢ়সংকল্প। কথাটা হিজ এক্সেলেন্সীকে জানিয়ে দেবেন! বুঝলেন স্যর! শেষ সৈনিকটি জীবিত থাকা পর্যন্ত...

—ম্যাগ যে এমন বাক্‌বিন্যাস জানে এতো এতদিন বুঝতে পারিনি। চাপা গলায় বল্লেন ভার্জিনিয়ান।

—কিন্তু স্যর, জবাবটা চমৎকার হয়নি? এটা লিখে রেখে আমি নক্সকে দিয়ে দোবো। আজ যে ইতিহাস আমরা রচনা করছি, যেদিন তার কাহিনী লেখা হবে সেদিন কাজে লাগবে।

পুটনাম কেশে উঠলেন। শিয়াল শিকারী বল্লেনঃ বাক্‌বিন্যাসের কথা এখন থাক নাথানেল, কেল্লার খবর বলো। আমি বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়েছি!

—না না স্যর, চিন্তা করবার কিছু হয়নি। কিছু ভাববেন না। সব ঠিক আছে। এবার আমরা ওদের বাগে পেয়েছি। মাথা কুটে মরলেও কিছুই করতে পারবে না। আমি আপনাকে বলে রাখছি স্যর, এতকাল যে দিনটির জন্য আমরা প্রতীক্ষা করেছি, আজ সেদিন এসেছে। এখান থেকেই আমরা মোড় ফিরবো—হাল বদলে যাবে।

ভার্জিনিয়ান মাথা ঝাঁকলেন—সায় দিতে পারলেন না। কিন্তু পুটনাম বল্লেনঃ আমার মনে হয়, নাথানেল ঠিক কথাই বলেছে স্যর!

—আগে থাকতেই আমাদের সরে পড়া দরকার। চাপা গলায় বল্লেন

ভার্জিনিয়ান।—এখান থেকে পিছু হটবার কোন পথ নেই। আচ্ছা, কেল্লায় এখন কত ফৌজ আছে?

—এখন হাজার তিনেক হবে। আমি আপনাকে বলে রাখছি স্যর, এবার আর আমরা হটবো না, হটবে ওরা!

—দেখা যাবে নাথানেল! আজ রাত্রেই আমি ওপারে যাবো ঠিক করে-ছিলাম; কিন্তু এখন ভাবছি. .না থাক! মাঝি, নৌকা জার্সিতে ফিরিয়ে নিয়ে চলো।

পালিসেদ শৈলশ্রেণীর পাদদেশে পারঘাটায় নৌকা ফিরে না আসা অবধি নীরবে কোলকুঁজো হয়ে বসে রইলেন বড় আদমী।

আঙুলের মত সরু এই উত্তর-মানহাট্টান দ্বীপের ভূপরিচয় জানা আদৌ কঠিন নয়। কোন জটিলতা নেই এর মধ্যে। এই এক ফালি জায়গা আড়ে মাইলখানেক, আর লম্বায় উত্তর সীমান্ত থেকে মাইল চারেক হবে। এই উত্তর সীমান্ত থেকে দ্বীপটি আবার ভুঁড়ির মত প্রসস্ততর হয়ে গেছে।

স্থানটি যে প্রতিরোধের পক্ষে চমৎকার একথা শিয়াল-শিকারী, গ্রীন, নক্স, ম্যাগ, সবাই উপলব্ধি করতেন। এমনকি মানহাট্টান দ্বীপের অন্তত কিছুটা জায়গা মরিয়া হয়ে আয়ত্তে রাখতে যারা আগ্রহী, তেমন যে কোন রণকৌশল-অনভিজ্ঞ সাধারণ সৈনিকের কাছেও বিষয়টি স্পষ্ট ছিল। স্থানটি তারা যে শুধু দখলে রাখতে চাইত তাই নয়, এজন্য একটা লোভও ছিল। প্রতিরোধের জন্যই যেন স্থানটি এমনিভাবে তৈরী হয়েছে। মরণপণ শেষ সংগ্রামে করতে হয় তো এই জায়গাই তার প্রকৃষ্ট স্থান। পলায়নপর পরাভূত বিপ্লবী-দের সম্বোধন করে স্থানটি যেন বলছেঃ আমার বক্ষে এসো' উড়াও তোমাদের বিজয় পতাকা! যতদিন একজন সংগ্রামী জীবিত থাকবে, আমি আছি তোমাদের সহায়!

অন্তরের অন্তস্তলে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার ব্যর্থতা সকলেই সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করত। তবু ফৌজদার এবং তাদের অধীনস্থ লোকজন এই পলায়নের পালা খতম করে এমন একটি স্থান পেতে চেয়েছে, যেখানে দাঁড়িয়ে আদর্শের জন্য তারা লড়তে পারে। হতে পারে তাদের আদর্শের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তবু এই আদর্শ ছাড়া আর যে কিছুই তাদের ছিল না। তারা চেয়েছে শত্রু নিধন করতে—শত্রুকে প্রত্যাঘাত হানতে। মনে মনে বলেছেঃ এই তো রয়েছি আমরা এখানে। পারো, এগিয়ে এসো। পালাতে চাইলেও পালাবার

উপায় আমাদের নেই। কিন্তু প্রতিপদ অগ্রসর হবার জন্য চড়া দাম দিতে হবে তোমাকে। এক একটি পাহাড়ে চড়বে, আর তোমার সঙ্গীর রক্তে পিছল হবে তোমার পথ। এত সহজে এগুতে পারবে না। ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক বা হোয়াইট প্লেইনসের পুনরাবৃত্তি আর হবে না। যদি বাঘ মারতে চাও, তবে তাকে বাসা থেকে খুঁচিয়ে বার করতে হবে। একদিনে, এক সপ্তাহে কি এক মাসে এ কাজ হবার নয়!

এই ধাঁচেই চিন্তা করেছে তারা। অনেক পিছুহটা হয়ে গেছে, আর নয়। তাই হাজার তিনেক লোক বন্দুক তাক করে শেষ পর্যন্ত স্থানটি রক্ষা করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে।

আমেরিকান ফৌজ মানহাট্টান দ্বীপে প্রথম তাদের রক্ষাব্যূহ রচনা করে হলোওয়েতে। ঐ দ্বীপটির উত্তর প্রান্ত থেকে হলোওয়ের দূরত্ব মাইল পাঁচেক। হলোওয়ে থেকে উত্তরমুখো মাইল তিনেক পথ ক্রমেই উঁচু হয়ে গেছে। তারপর দুটি পাহাড়ে বিভক্ত হয়ে একটি ছড়িয়ে আছে হাডসন নদীর পাড় বরাবর, অপরটি হার্লেম নদীর পাড়ে। দুটির উচ্চতাই প্রায় সমান। সমুদ্র বক্ষ থেকে কয়েকশ' ফুট মাত্র। উভয়ের প্রান্তদেশই খাড়া ও ঢালু এবং এদের মাঝখানকার জমি গড়ানেভাবে নেমে গেছে স্পয়তেন দয়ভিল খাড়ি অবধি। হার্লেম আর হাডসন নদীকে যুক্ত করেছে এই শীর্ণ-স্রোতা জলধারাটি। শৈলশ্রেণী দুটি মাইল চারেক লম্বা এই সরু স্থানটির সবটা জুড়ে ছিল না। খাড়িটির মাইলখানেক দক্ষিণে পাহাড় দুটি শেষ হয়ে গেছে। তারপর গভীর একটি খাদ দ্বীপটির বুক চিরে দিয়েছে। এই খাদের উত্তর প্রান্তেই শুরু হয়েছে তৃতীয় আর একটি পাহাড়। উচ্চতায় সেটিও অপর দুটির সমান।

আত্মরক্ষার ঘাঁটি হিসাবে প্রতিটি পাহাড়ই চমৎকার। তবু স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটির একটা গুরুতর অসুবিধা ছিল। কোন একটি পাহাড় যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, তাহলে অপর দুটি রক্ষা করা দুঃসাধ্য। শিয়াল-শিকারীর নামাঙ্কিত কেল্লাটি ছিল হাডসন নদী কিনারের পাহাড়ে। অখ্যাত এক চাষীর প্রতি অখ্যাত এক প্রাদেশিক কনফেডারেশনের শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের একক প্রতীক, পাথর-দিয়ে-গড়া এই ক্ষুদ্র কেল্লাটিতে বড়জোর দু' তিন শ' লোকের স্থান সঙ্কুলান হতে পারে। নদীর ওপারের লী কেল্লার মত দুর্গ ও খেয়াঘাটের মধ্যে রয়েছে খাড়া পাথুরে একটি পথ।

দুর্গ রক্ষার ভারপ্রাপ্ত সেনানী কর্নেল ম্যাগ বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে, ওয়াশিংটন কেল্লা রক্ষা করা কষ্টকর। দু' তিন শ' দৃঢ়সংকল্প লোক পাথুরে

রক্ষাব্যূহের অন্তরালে থেকে হয়ত দু' এক সপ্তাহ দুর্গটি রক্ষা করতে পারে। কিন্তু পরিবেষ্টিত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে অচিরেই তারা খাদ্যাভাবের সম্মুখীন হবে। আর ততদিনে অপর দুটি পাহাড়ে সাজান কামান প্রতিনিয়ত হাতুড়ি পেটা করবে তাদের। দুর্গরক্ষার এই অসুবিধা উপলব্ধি করে তিনি গোটা সরুস্থানটি রক্ষার এক ব্যাপক পরিকল্পনা করলেন। শক্তি সঞ্চয় করে ভার্জিনিয়ান যতদিন খোদ নিউইয়র্ক আক্রমণ করবার সাহসী না হন এবং পুনরায় ইংরেজদের সমুদ্রে তাড়িয়ে দিতে না পারেন, ততদিন যাতে স্থানটি আগলে রাখা যায়, তেমন ভাবেই রক্ষা ব্যূহ রচনা করা হল। গ্রীন ও পুটনামের কাছে ম্যাগ তার গোটা পরিকল্পনার কথা খুলে বলল এবং উত্তর-মানহাট্টানে আরও বেশী করে সৈন্য পাঠাতে রাজী করাল।

যেদিন রাত্রে নৌকা করে গ্রীন ও পুটনাম হাডসন নদী পার হলেন, ম্যাগ'র অধীনে সেদিন তিন হাজারের মত সৈন্য ছিল। এদের সবাইকেই বিভিন্ন রক্ষাব্যূহে মোতায়েন করা হয়েছিল। জেনারেল দুজনের সামনে একটি মানচিত্র খুলে ধরে সগর্বে ম্যাগ বিভিন্ন রক্ষাব্যূহের সংস্থান দেখিয়ে দিতে লাগল এবং তার ব্যূহরচনার মধ্যে ফাঁক বার করবার জন্য চ্যালেঞ্জ করল।

সরু স্থানের মাইল দুয়েক দক্ষিণে একটি স্থানের উপর আঙুল দিয়ে বল্লেঃ এখানে রয়েছে পেনসিলভানিয়ার সৈনিকেরা—আটশ। গলদা চিংড়ি ব্যাটারা দক্ষিণ দিক থেকে আসুক, ভালো অভ্যর্থনার ব্যবস্থাই আমরা করবো। বেঁটে খাঁটো লোক ম্যাগ। গোলগাল চেহারা, ড্যাবডেবে চোখ, কিন্তু উচ্চাভিলাষী। নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ। মানচিত্রে আর একটি জায়গা দেখিয়ে বল্লেঃ এইখানে রয়েছে মেরিল্যাণ্ডের সৈনিকেরা—রাইফেলধারী। এমনভাবে কথাটা বল্লে, যেন ব্যাপারটা গ্রীন আর পুটনামের অজানা। সে বলে চল্লঃ ব্যক্সটার তার গণসেনা নিয়ে রয়েছে হার্লেমে, কিন্তু ইংরেজরা ওপথে আসবে না। যাই হোক, আমার বিশ্বাস, সব দিকের আঁটঘাট আমি বেঁধেছি।

—সমস্ত আঁটঘাট কেউই বাঁধতে পারে না। বিরক্তভাবে বল্লেন পুটনাম।

গ্রীন বল্লেঃ আমরা যদি না পালাই তাহলে কোনো অসুবিধাই হবে না।

শিয়াল-শিকারীর মনে হল, তিনি বুড়িয়ে যাচ্ছেন। আজ ঠাণ্ডা সকালবেলা উঠে মনে হল, সারা গা বিষ-বেদনায় টনটন করছে। কেমন একটা রসস্থ অস্বস্তিকর ভাব। বাঁ হাতখানা যখন তুলবার চেষ্টা করলেন, বাহুমূল টনটন

করে উঠল। আজ যদি বাড়ীতে থাকতেন, তাহলে মার্থা তাঁকে বিছানায় শুইয়ে রেখে নিজ হাতে কাঁধে কটুগন্ধী ভালুকের চর্বি মালিশ করে দিত। কিন্তু এখানে কিছুই হয়নি ভান করে অসহ্য বেদনা সইতে হচ্ছে। বিলিও যদি কাছে থাকত, তাহলে সেই নিগ্রো খানসামার কাছে হয়ত নিজের দুঃখের কথা জানাতে পারতেন। কিন্তু সেও রয়েছে হাকেনসাকে। এখন আর একজন আর্দালী ডেকে কাঁধে মালিশ করে দিতে বলাও যা, আর লোকজনের সামনে উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ানও তাই।

খালিপায়ে শুধুমাত্র একটা পশমী আন্ডার-উইয়ার পরে আনাড়ীর মত নিজে নিজে তিনি পোশাক পরতে লাগলেন। উঁচু গোড়ালির কালো বুট-জুতোয় পা ভরতে বেশ বেগ পেতে হল। প্রথমে শার্ট পরে জ্যাকেটে হাত ভরতে গিয়ে বাহুমূল টনটন করে উঠল। প্রসাধনের জিনিসপত্রও আগোছাল হয়ে ছিল। মোটকথা যা-ই তিনি করলেন, কিছুতেই মনের খুঁতখুঁতানি গেল না। মনে হল, কিছুই ঠিক হল না। যখন তাঁবুর বাইরে এলেন, সোজা হয়ে দাঁড়াতে বেশ কষ্ট হল।

তখনও অরুণোদয় হয়নি। তবু গ্রীন, পুটনাম এবং মার্কার ইতিমধ্যেই সাজপোশাক পরে তাঁর জন্য বাইরে অপেক্ষা করছিল। যতটুকু সময় তিনি ঘুমিয়েছেন তার চাইতে বেশীক্ষণ এরাও ঘুমোতে পারেনি—এই কথা ভেবে মনে মনে যেন খানিকটা সান্ত্বনা পেলেন। নিজে তিনি সারাক্ষণ অসংখ্য দুশ্চিন্তা উদ্বেগে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁর স্টাফের অকুতোভয় দুঃসাহসী লোকজন পলকের জন্যও মৃত্যু বা পঙ্গুতার শঙ্কায় মনমরা হয় না। সহচরদের সঙ্গে এই পার্থক্য সর্বদা তাঁর বিবেক দংশন করত। এদের নিয়ে তিনি প্রাতরাশ খেতে বসলেন। খাবার সময় একটি কথাও বললেন না। এমন-কি পিরিচ থেকে চোখও তুললেন না। তিনি জানতেন, মুখ খুললে হাডসন নদীর ওপারের তিন হাজার দুর্গরক্ষী সম্পর্কে তাঁর দুশ্চিন্তা ধরা পড়ে যাবে। কাজেই খাবার টেবিলে মানহাট্টানের দিকে পেছন ফিরে বসলেন। খেতে খেতে বহুবার পেছনে তাকাবার আগ্রহ দমন করেছেন। অবশ্য একথাও তাঁর জানা ছিল যে পেছন ফিরে তাকালেও কিছু দেখা যাবে না; কেননা মানহাট্টান উপ-কূল তখন কুয়াশায় ঢাকা।

তাঁর নীরবতায় আর তিনজনের কথাবার্তাও বন্ধ হয়ে গেল। বক বক করার অভ্যাস অবশ্য মার্কারের কোন কালেই নেই, তবু সে রাটি করল না। পুটনামের ফুলো ফুলো মুখখানা খানিকটা হলদেটে দেখাচ্ছিল। বিমর্ষভাবে

তিনি যকৃতের অসুখের অনুযোগ করলেন। গ্রীনও চুপ করেই ছিল। কিন্তু খাওয়া শেষ হয়ে এলে সে মুখ খুললঃ দেখুন স্যর, কুয়াশা কেটে যাচ্ছে।

—কুয়াশা কতক্ষণ আর থাকে। পেছন ফিরে তাকাবার আগ্রহ দমন করে সায় দিয়ে বল্লেন বড় আদমী।

—ঐ দেখুন, পতাকাটা কেমন উড়ছে। সোৎসাহে বলে উঠল গ্রীন। তার এই উক্তির মধ্যে বেশ খানিকটা গর্বও ছিল। র‍্যাট্‌ল-সাপ লাঞ্ছিত রক্তনীল বর্ণরঞ্জিত পুরনো পতাকাটি জীর্ণ হয়ে গেছে। তবু ম্যাগ ঐ জীর্ণ পতাকাটির জন্য অস্বাভাবিক গর্ববোধ করত। শপথ করে বলত, কাপড় পচে খসে না যাওয়া অবধি ঐ পতাকা ঐখানে অমনিভাবেই উড়বে।

সশ্রদ্ধ নীরবতায় গ্রীনের কথায় সায় দিল মার্কার। এই আজব বাহিনীতে মার্কারের চরিত্র সব চাইতে বিস্ময়কর। বহুদিনের পেশাদার সৈনিক এই কৃশকায় স্কচ্‌ম্যান। অধিকাংশ সময় মুখবুজে বিমর্ষভাবে থাকত। তবু বিদ্রোহের অনির্বাণ বহ্নিশিখা কোনদিনই তার অন্তরে ম্লান হয়নি। স্বাধীনতা, আজাদী কিম্বা এমনতর আর পাঁচটা বাঁধাবুলি কোনকালেই সে কপ্‌চাত না। বাগাড়ম্বরের মধ্য দিয়ে কোনদিনই সে উদ্দেশ্য জাহির করত না। তার চিন্তাধারার আঁচ পাওয়া যেত কটা চোখের প্রদীপ্ত চাহনিতে।

প্রাতরাশের পর প্রধান সেনাপতি সৈন্যশিবির পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়লেন। এ তদারকি উদ্দেশ্যমূলক। দোষ ত্রুটি খুঁজে বার করা মোটেই কঠিন ছিল না। দশ বারোটা জিনিস সম্পর্কে তিনি খুঁত ধরলেন। দিন তিনেক না কামাবার জন্য দু'জন ক্যাপ্টেন এবং এক লেফটন্যান্টকে বেশ দু'চারটে কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন। মোটের উপর এইভাবে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে তিনি ফিরে এলেন নদীকিনারের পাহাড়ের চূড়ায়—হাডসনের ওপারের হালচাল স্বচক্ষে দেখবার জন্য। গ্রীন আগে থেকেই সেখানে প্রতীক্ষা করছিল। তিনি আসা মাত্র সে তাঁর হাতে একটা দূরবীণ দিল। দূরবীণে ফোকাস করবার জন্য নিবিষ্টমনে বড় আদমীকে হাত দৃঢ় করতে হল। কেল্লার ক্ষুদ্র তারকাচিহ্ন, প্রভাতী রোদ মাখান উড়ন্ত পতাকা, সৈন্য সামন্তের খর্বাকৃতি চেহারা তখন এক পুতুলের জগতের মত তাঁর চোখে ধরা দিল। সব কিছু এমন সুশৃংখল ও নির্বিঘ্ন বলে মনে হল যে, গত তিন দিনের দুশ্চিন্তা কাটিয়ে এই সর্বপ্রথম তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

—আমায় বিশ্বাস করুন স্যর, কেল্লাটি চমৎকার! গ্রীন বল্লে।

বড় আদমী কোন জবাব দিলেন না। একবার ঘাড় ঝাঁকানি দিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন ওপারের দিকে।

এগারোটা বেজে গেল তবু ইংরেজদের আক্রমণের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। ভার্জিনিয়ানের মনে হল, কোন কিছু না করে তিন-পোয়া মাইল চওড়া নদীর এপারে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করলে নিজেকে বেশীক্ষণ সংযত রাখতে পারবেন না! তিনি জানতেন, কেল্লায় যাওয়া না যাওয়া সমান। তবু একটা কিছু অবশ্যই করতে হবে। আচমকা তিনি গ্রীনকে বল্লেনঃ আমি ভাবছি নাথানেল, ওপারে গিয়ে আমাদের হালচাল তদারক করা উচিত।

—ভালো কথা স্যর! দেখে শুনে আপনি খুশীই হবেন। জেনারেল পুটনামকে সঙ্গে নেবার দরকার হবে?

—ইচ্ছে হলে যেতে পারেন!

পারঘাটায় যাবার পথে মার্কার এসে জুটল। বিমর্ষভাবে মার্কার জিজ্ঞাসা করল যে এপারে বসে একলা তাকেই কি এই 'খেল' দেখতে হবে না কি?

—তুমিও আসতে পারো জেনারেল! এদিকে তো আর তেমন কিছু ঘটবার সম্ভাবনা নেই!

পালিসেদ পর্বতমালার পাদদেশে এসে তারা নৌকায় চড়ে বসল। এক গণ্ডা জেনারেলকে একসঙ্গে খেয়াপার করবার গর্বে মার্বলহেডের জেলে দুটি থুক করে হাতের তেলোয় থুথু ফেলে জোরসে দাঁড় টানতে শুরু করল। কিন্তু তাদের কান খাড়া হয়ে রইল জেনারেলদের কথাবার্তা শুনবার আশায়। দু'চার কথা শুনে নিতে পারলে আর পাঁচজনের কাছে গল্প করা যাবে তো! কিন্তু হজমের গোলমাল সম্পর্কে পুটনামের একঘেয়ে অনুযোগ এবং মার্কারের সেকেলে স্কচ দাওয়াইর ব্যবস্থাপত্র ছাড়া আর কোন কথাই কানে এল না। মার্কার বল্লেঃ এক কাপ বার্লির সঙ্গে কিছুটা ভেড়ার খুরের কাথ্ আর আঙুল চারেক হুইস্কি মিশিয়ে তিনভাগ করে রোজ তিনবার খাবার পরে খেয়ে যান, যকৃতের উপকার হবে। গ্রীন কোন কথাই বল্লে না। প্রধান সেনাপতির দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল মানহাট্টান উপকূলে।

তারা মাঝগাঙে আসতে না আসতেই কামানের গুরু গর্জনে বায়ুস্তর বিদীর্ণ হল। মনে হল, নিকটেই কোথাও বাজ পড়েছে।

—ঐ, ঐ শুরু হয়েছে। গ্রীন চীৎকার করে উঠল।

বড় আদমী ধমক দিয়ে বল্লেনঃ করছিস কি? জোরসে দাঁড় টান।

—টানছি তো! নিরুত্তেজ কণ্ঠে জবাব দিল মাঝিরা।

নৌকা পাড়ের কাছাকাছি আসতেই বড় আদমী জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে হন্তদন্ত হয়ে কেল্লার দিকে ছুটলেন। বাকী তিনজনও ছুটল তাঁর পিছু পিছু। খাড়াপথ। আধাআধি গিয়েই বড় আদমী হাঁপাতে শুরু করলেন। বুকের মধ্যে ধরাস্ ধরাস্ শুরু হল। তখন তিনি ইচ্ছে করে আস্তে আস্তে হাটতে লাগলেন। ভাবলেন, কেল্লায় ঢুকবার সময় লোকজনের সামনে তাঁকে নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন ভাব দেখাতে হবে। তিনি কেল্লার কাছাকাছি আসতেই কর্নেল ম্যাগ হাসিমুখে লাফিয়ে ছুটে এসে অভিবাদন করে তাঁকে অভ্যর্থনা করল। কামানের গুরুগর্জনের মধ্যে গলা শোনাবার জন্য চেঁচিয়ে বল্লেঃ ঐ শুনুন স্যর, ওরা শুরু করে দিয়েছে।

—আমি বুঝতে পারছি কর্নেল, বলবার দরকার হবে না। আপনার লোক-জন প্রতিরোধ করছে তো!

—বলেন কি স্যর! মহাপ্রলয়ের দিন পর্যন্ত তারা যুঝবে! অবশ্য খোদ কেল্লার উপর আক্রমণ করতে পারেনি। এখন পর্যন্ত শুধু আমাদের বহির্-ব্যূহের উপর আঘাত করছে। কিন্তু ঐ পাহাড় দুটো থেকে আমাদের রক্ষী-দের হটাতে নাজেহাল হতে হবে। আমরা সবাই—শেষ সৈনিকটি পর্যন্ত, প্রাণ বিকোতে প্রস্তুত। কিন্তু তার জন্য চড়া দাম দিতে হবে।

—আমি প্রাণ বিকিয়ে দেবার পক্ষপাতী নই। বিরক্তভাবে বল্লেন ওয়াশিং-টন।—আমি চাই কেল্লা রক্ষা করতে।

—কেল্লা আমরা রক্ষা করবো স্যর!

—পারঘাটায় যাবার পথটা সতর্কভাবে রক্ষা করবে। লী কেল্লার সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র হিসাবে, কিম্বা তেমন অবস্থা দেখা দিলে পেছু হটবার পথ হিসাবে এ পথ খোলা রাখা চাই।

—তার দরকার হবে না স্যর!

—না হয় ভালোই! তবু কর্নেল ম্যাগ, এই পথ খোলা রাখার গুরুত্ব সবসময় মনে রাখবে। আর যদি প্রয়োজন হয়, যদি মনে করো যে লড়াই আমাদের অনুকূলে যাচ্ছে না, তাহলে সন্ধ্যার পর বলবৃদ্ধির জন্য আমার কাছে সংবাদ পাঠাবে।

এর পর ম্যাগ আর বাক্‌বিন্যাসের লোভ সামলাতে পারল না। বল্লেঃ আমায় বিশ্বাস করুন স্যর! আমার বড় সাধ, আজ আমরা ওদের এমন আঘাত

হানবো যাতে টলতে টলতে নিউইয়র্কে ফিরে গিয়ে আমাদের প্রিয় দেশের মাটি ছেড়ে ওদের পালাতে হয়!

—ও বাবা! এ যে নক্সেরও উপরে যায়! পুটনাম বলে উঠলেন।

নীরবে ঘাড় ঝাঁকানি দিয়ে ভার্জিনিয়ান কেল্লায় প্রবেশ করলেন। সৈন্য সামন্তেরা তাঁকে দেখে উল্লাসে চীৎকার করে উঠল। এদের অধিকাংশই দক্ষিণী। চীৎকার করে তারা জানাল যে ইয়াংকি ব্যাটাদের বদলে এক হাত নেবার সুযোগ তারাই পেয়েছে। বন্দুক বা টুপী হাতে করে লাফিয়ে, দুর্গ প্রাকারের উপর নেচে তারস্বরে চীৎকার করে তারা বলছেঃ একবার আয় না গলদা চিংড়ি শালারা! আয়! দেখিয়ে দিচ্ছি মজাখানা! আর শালারা একবার! এসে দেখ কেমন লাগে! এই গলদা চিংড়ি শালারা!

সৈনিকদের এরকম আচরণ শিয়াল-শিকারীর মোটেই ভাল লাগল না। কয়েক ঘণ্টা পরেই যাদের স্থির মস্তিস্ক কঠোর নির্মম কাজ করতে হতে পারে, এ আচরণ তাদের সাজে না। এমন কোন কারণ ছিল না, যার জন্য দুর্গটিকে এরা দুর্ভেদ্য মনে করতে পারে। কেমন করে এরা ধরে নিল যে কতগুলো চাতকপাখি কিচির-মিচির করে কেল্লা রক্ষা করতে পারবে? তাঁর মনে পড়ল, এই সব লোকজন বহুদিন তাঁর তদারবির বাইরে ছিল। কিন্তু সংগে সংগে এও বুঝলেন, শৃংখলা স্থাপনের সময় এ নয়।

এর পর ভার্জিনিয়ান নিজে ছেঁদাওলা দুর্গপ্রাকারের উপর চড়ে চোখে দূরবীণ লাগিয়ে আক্রান্ত পাহাড় দুটিব দিকে তাকালেন। তাঁরই সামনাসামনি হার্লেম নদীতীরের পাহাড়টির বন-জংগলের মধ্যে লোকজনের চলাফেরা নজরে পড়ল। কিন্তু কোথাও বৃটিশের লাল-উর্দি বা হেসিয়ানদের সবজে-কোট দেখতে পেলেন না। উত্তর দিকের অপর পাহাড়টি এত জংলা যে সেখানকার লড়াইয়ের কিছুই দেখা যায় না। কেল্লাটির দক্ষিণে যে জায়গায় আটশ' পেনসিলভানিয়াবাসী দ্বীপটির সংকীর্ণতম অংশ রক্ষা করছিল সেদিক থেকে অবিরাম বন্দুকের আওয়াজ কানে এল। কিন্তু গাছের পর্দা ভেদ করে সেখানকার যুদ্ধেরও কিছু মালুম করা গেল না।

প্রধান সেনাপতি দুর্গপ্রাকারে উঠবার মিনিট দশেক পরেই গ্রীন তাঁর পাশে এসে ব্যস্তসমস্ত হয়ে বল্লেঃ স্যার, এখন আমাদের চলে যাওয়াই ভালো।

—কেন?

—আমার চাইতে কেউই বোধহয় বেশী বিশ্বাস করে না যে স্থানটি রক্ষা করা যেতে পারে। কিন্তু ওরা যদি পারঘাটায় যাবার পথ কেটে দেয়, তাহলে

আপনাকে হয়তো এক হপ্তা কি মাসখানেকের জন্য আটকে পড়তে হবে।

—কিন্তু আমি যে লড়াইর কিছুটা দেখবো বলে স্থির করেছিলাম নাথানেল!

—দেখে কাজ নেই স্যর। যদি প্রয়োজন মনে করেন তো আমি থাকছি।

ঘাড় ঝাঁকানি দিয়ে বড় আদমী ভাবলেন, গ্রীন নেহাৎ বাজে কথা বলেনি। ভাল পরামর্শই দিয়েছে। বল্লেনঃ আচ্ছা চলো, সবাই আমরা এখন যাচ্ছি। ওপারে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে ইচ্ছে হলে আবার রাত্রিবেলা চলে আসবো!

চলে যাবার পূর্বে তিনি ম্যাগ'র সঙ্গে করমর্দন করলেন। সাগ্রহে তাঁর বড় হাতখানা চেপে ধরে ম্যাগ আবারও শপথ করে বল্ল যে, প্রয়োজন হলে ছ' মাস সে দুর্গরক্ষা করবে।

নৌকায় চড়ে প্রধান সেনাপতি আর একবার ঘাড় ফিরিয়ে কেল্লাটির দিকে তাকালেন।

—কি স্যর? গ্রীন জিজ্ঞাসা করল।

—না, ও কিছু নয়।

পুটনাম বল্লেনঃ এরা বড্ড বেশী নিশ্চিন্ত। এত নিশ্চিন্ততা ভাল নয়!

মাঝি দুটি ছাড়া আর সবাই জার্সি উপকূলের দিকে মুখ করে বসেছিলেন। এবারে তাড়াহুড়া করবার কোন হুকুম না থাকায় ধীরে ধীরে বাইছিল তারা। থেকে থেকে দাঁড় টানছিল বিলম্বিত তালে। সহসা মাঝিদের দাঁড়টানা বন্ধ হয়ে গেল। শূন্যে দাঁড় তুলে প্রধান সেনাপতির কাছে-বসা মাঝিটি আচম্বিতে তাকাল ছেড়ে আসা পাড়ের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে। ক্রমে শিয়াল-শিকারী, গ্রীন, পুটনাম এবং নাকারাও ফিরে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে স্রোতে ভাসান নৌকাখানি আড়াআড়িভাবে দুলতে লাগল। যা তারা দেখল, তা' এত অসম্ভব এবং এমন হতবুদ্ধিকর যে কারও মুখে কথা ফুটল না। সামান্য পূর্বে যে পারঘাটা তারা ছেড়ে এসেছে, ইতিমধ্যেই সে স্থানটি লাল-উর্দিয়ালারা দখল করে বসেছে। শুধু তাই নয়, একদল লাল-উর্দিয়ালা ছুটে যাচ্ছে কেল্লার দিকে! অথচ যাই ঘটুক, পারঘাটা থেকে কেল্লায় যাবার এই পথটি উন্মুক্ত রাখা একান্ত আবশ্যক ছিল। যে করেই হোক, এ পথ নির্বিঘ্ন রাখা উচিত ছিল।

হাডসন নদীর মাঝামাঝি নৌকাখানি দুলছে। কিন্তু যতটা দূরে তারা এসেছেন, সেখান থেকে ওয়াশিংটন কেল্লার দক্ষিণ দিকের মাঠ এবং উত্তরের বনে-ঢাকা পাহাড় অর্থাৎ দ্বীপটির গোটা সবুজ ফালিটির নদীকিনার একসঙ্গে

অক্ষা করা যায় না। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী খাদের মধ্য দিয়ে ড্রাম বাজিয়ে পতাকা উড়িয়ে এক ডিভিসন বৃটিশ সৈন্য আসছে। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বার শংকায় উত্তর দিককার বনে-ঢাকা পাহাড়ের মধ্য থেকে আমেরিকান ফৌজ দৌড়ে হামাগুড়ি দিয়ে ছুটে আসছে কেল্লার দিকে। এরা তখনও টের পায়নি যে, পারঘাটা আর সেখান থেকে কেল্লায় যাবার পথ দখল করে ইংরেজরা ইতিমধ্যেই তাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে।

বড় আদমী হাত বাড়ালেন। কে যেন তাঁর হাতে একটা দূরবীণ তুলে দিল। কে যে দিয়েছিল কোনদিনই তিনি তা জানতে পারেননি।

দক্ষিণ দিকের অবস্থা আরও মারাত্মক! সেখানে আটশ' পেনসিলভানিয়ানকে আক্রমণ করেছে হেসিয়ানরা। পেনসিলভানিয়ানরা ছুটছে। জার্মানরাও ছুটছে তাদের পেছু পেছু। সবজে-উর্দিপরা জার্মানরা আর একটা মজার দিন পেয়েছে। রণক্ষেত্রের সমস্ত কোলাহল ছাপিয়ে উঠছে তাদের রণহুংকার, তাদের ইয়ংকি ইয়ংকি রব।

পেনসিলভানিয়ানদের দিগ্‌দিশাহীন উর্ধশ্বাস পলায়ন দেখলে মনে হয় যেন নরকের সমস্ত পিশাচ এক সংগে তাদের তাড়া করেছে। এদের মধ্যেও অনেকেই জার্মান। প্রুশিয়ান জুলুমবাজী থেকে অব্যাহতি পাবার আশায় বহু বছর আগে এই সরল চাষাভুষারা এসেছিল আমেরিকায়। কিন্তু তিন হাজার মাইল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এখানেও তাড়া করেছে সবুজে-টুপীপরা বিভীষিকাময় জ্যাগাররা। প্রতিশোধ নেবার জন্য বীভৎস চীৎকার করে দীর্ঘ চওড়া কীরিচ সেঁধিয়ে দিচ্ছে পেনসিলভানিয়ানদের পিঠে। শুয়োরের মত ঢিবে ফেলছে। পাদপ্রদীপমালা যেমন রংগমঞ্চ উদ্ভাসিত করে, তেমনি দুপুরের খররৌদ্রে এই মর্মান্তিক দৃশ্য নৌকায় বসা জেনারেল চতুষ্টয়ের চোখে বড় কাছের জিনিস বলে মনে হল। অথচ নির্বাক দর্শকের মত এই হত্যাকাণ্ড দেখা ছাড়া কিছুই করবার ছিল না।

লড়াইয়ের ভাবগতি দেখে মনে হয়, জার্মানরা বুঝি জানে যে মহাদেশীয় ফৌজের চারজন জেনারেল একত্রে বসে এই অভিনয় দেখছেন। ব্যাপারটা তাই আরও মর্মান্তিক হল। পেনসিলভানিয়ানদের ঘের দিয়ে জার্মানরা কচুকাটা করল। গাছের সংগে কীরিচ দিয়ে ফুঁড়ে রাখল। আর্তনাদ করে যারা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, নদী কিনারে ওৎ পেতে থেকে তাদের পটাপট গুলী করে মারল।

পুটনাম গাল দিতে শুরু করলেন। নৌকার মধ্যে দাঁড়িয়ে তারস্বরে

চীৎকার করে বল্লেনঃ এই বেজম্মারা! এই খান্‌কির বাচ্চারা। এই বেজম্মা খুনী শালারা! জাহান্নামে যাবি। জাহান্নামে যাবি বলে রাখছি!

দুই হাতে মুখ চেপে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল গ্রীন। চাপাগলায় মার্কার বল্লেঃ আহা রে! অমন সুন্দর ছেলেগুলোর এই দশা হলো!

মার্বলহেডের জেলেদের একজনে বলে উঠলঃ ভগবানই একমাত্র ভরসা। তিনিই বিপদতারণ! ভয় কিসের? তিনিই আমার সমস্ত শক্তির আধার। তাঁকে ছাড়া আর কাকে পরোয়া করবো? শয়তান কি দুশমন যখন আমার মাংস ছিঁড়ে খেতে এসেছে, তখন আপনা থেকেই তারা বাধ্য হয়েছে হটে যেতে।

বড় আদমী টুঁ শব্দ করলেন না। তাঁর মুখ এত ফ্যাকাশে হয়ে গেছল যে, ব্রণের দাগগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। অত্যন্ত কুৎসিত দেখাচ্ছিল তাঁকে।

স্রোতের টানে নৌকাখানা দুলছে। দুলছে আর টাল খাচ্ছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফেনিল তরঙ্গ মৃদু কল্লোল তুলেছে হালে ধাক্কা খেয়ে। পালিসেদ শৈলশ্রেণীতে নয়নাভিরাম হেমন্তের শোভা। বিচিত্র বর্ণের মিছিল। গোটা পাহাড়টাকে মনে হচ্ছে বর্ণরাগ রঞ্জিত চোখ ধাঁধাঁনো প্রাচীরের মত। হাডসনের বিস্তীর্ণ উদারবক্ষ চিকমিক ঝলমল করছে মধ্যাহ্নসূর্যের সোনালী কিরণে।

এরপর দ্বিতীয় অঙ্কের শুরু হল। দুর্গরক্ষার জন্য ম্যাগ সযত্নে যতগুলো আত্মরক্ষার ঘাঁটি তৈরী করেছিল, একে একে সব ঘাঁটি ভেঙে পড়ল। খোদ কেল্লায় বড়জোর দু' তিনশ' লোকের স্থান হতে পারে। কিন্তু চারিদিক থেকে দলে দলে মহাদেশীয় সেনা ছুটল ক্ষুদ্র কেল্লাটির দিকে। খাদের উত্তর দিকে যারা ছিল গুঁতোগুঁতি ঠেলাঠেলি করে তারা এল পাহাড়ে পথ ভেঙে। এল দক্ষিণ দিকের মাঠের ওধারের রক্ষীরা। এমনকি হার্লেম নদীর পাড়ে যারা ছিল, তারাও পালাল রক্ষাব্যূহ ছেড়ে। সবাইর লক্ষ্য প্রাচীরঘেরা কেল্লাটি। নৌকায় বসা জেনারেল চতুষ্টয় এই পলায়নের খানিকটা দৃশ্য দেখতে পেলেন। বনবাদাড়ের জন্য খানিকটা দেখা গেল না। তবে কি মর্মান্তিক ব্যাপার যে ঘটছে, তা বুঝতে কারও কষ্ট হল না। ক্রমেই ভীড় বেড়ে চলল। পাঁচশ...হাজার... দেড় হাজার...দু' হাজার লোক ভীড় জমাল খোদ কেল্লার আশেপাশে। গরু-ছাগলের মত এমন গাদাগাদি ঠাসাঠাসি করে তারা ভীড় করল যে বন্দুকে তাক করা তো দূরের কথা, কারও পাশ ফিরবার মত ফাঁক রইল না। তোপ দাগতে

পারা গেল না স্বপক্ষের শখানেক সৈনিক মারা পড়বার ভয়ে। এ সত্ত্বেও পাথুরে দেয়াল আঁচড়ে হিঁচড়ে মহাদেশীয় ফৌজ ছুটে আসছিল কেল্লার দিকে।

শেষে এমন অবস্থা হল যে ভীতিবিহ্বল বিলম্বে আগত সৈনিকদের অনেকেই মানুষের ঠেলায় দুর্গপ্রাচীর অবধি পৌঁছুতে পারল না। প্রাচীরের বাইরে তখন মানুষের ভীড়ে দ্বিতীয় একটি প্রাচীর সৃষ্টি হল।

এ অবস্থায় প্রতিরোধ করবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। পাকা ফলের মত আমেরিকান ফৌজের হাজার তিনেক সৈনিক বৃটিশের হাতের মুঠোয় ঝরে পড়ল। শত্রুর বেড়াজাল ক্রমেই আরও পোক্ত হল। বিজয়োল্লসিত খুশী-ভরা জার্মানরা এগিয়ে এল দক্ষিণ থেকে। হালকা পদাতিক দল এল পূব দিকের পাহাড় থেকে। লাল-কোটয়ালারা ঘনসন্নিবিষ্ট লাইনে দৃঢ়পদক্ষেপে মার্চ করে এল পারঘাটা থেকে। আর উত্তর দিকের বন জংগলে ঢাকা পাহাড় থেকে জোর কদমে ক্লান্ত ঘোড়া ছুটিয়ে এল বৃটিশ অশ্বারোহী দল।

এরপর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সমস্ত ব্যাপার চুকে গেল। র‍্যাটল সাপ লাঞ্ছিত টকটকে লাল পতাকার স্থলে কেল্লার মাথায় উড়ল বৃটিশের ইউনিয়ন জ্যাক।

বড় আদমী চোখ থেকে দূরবীণ সরিয়ে নিলেন। হাতের মুঠোয় শক্ত করে দূরবীণটা চেপে ধরে চাপা শুষ্ক কণ্ঠে মাঝিদের বল্লেনঃ ওপারে চলো।

গ্রীন তাঁর দিকে তাকাতে পারল না। দুঃখে ক্ষোভে হতাশায় পক্ষাঘাতে পংগুর মত অবশ ভাবে হাত পা ছেড়ে দিয়ে হেঁট মাথায় বসে রইল এই প্রিয়-দর্শন তরুণ কোয়েকার। চাপা কান্নায় মুহুর্মুহুঃ তার সারা দেহ কেঁপে উঠছিল।

পুটনাম যেন আরও খানিকটা বুড়িয়ে গেলেন। একখানা হাত তুলতেই সেখানা থর থর করে কাঁপতে লাগল। কথা বলবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু গলা আটকে ভাংগা আওয়াজ বেরুল। শিয়াল-শিকারীর দিকে যখন তিনি তাকালেন, তাঁর সারা মুখে ছিল রুদ্ধ বেদনার সুস্পষ্ট ছাপ। তিনি বলবার চেষ্টা করছিলেনঃ দোষ আমারই।

গ্রীন মুখ তুলে তাকাল। অপরাধীর মত করুণ সুরে আবার বল্লেন পুটনামঃ আমারই দোস!

—না না না! ভাংগাগলায় বাধা দিয়ে বল্লে গ্রীন।—আমিই চেয়েছিলাম। আমিই চেয়েছিলাম কেল্লা রক্ষা করতে। বরাবর আমি তাই চেয়েছি।

ভার্জিনিয়ার শিয়াল-শিকারী তখন বল্লেনঃ জেনারেল গ্রীন! জেনারেল পুটনাম! জেনারেল মার্কার! যা বলছি শুনুন! লী কেল্লায় যখন আপনারা ফিরে যাবেন, তখন সব সময় মনে রাখবেন যে আপনারা আমার সেনানী। নিজেদের প্রতি যেমন আপনাদের কর্তব্য আছে, তেমনি লোকজনের প্রতিও আপনাদের একটা কর্তব্য রয়েছে। কেল্লায় ফিরে লোকজনের সামনে নিজেদের পদমর্যাদা অনুসারে চলবার চেষ্টা করবেন!

সামনে পেছনে হর্ষোৎফুল্ল জার্মান ফৌজ নিয়ে হেসিয়ান ফৌজদার ক্লাইপহাউজেন লোকজন হটিয়ে দিয়ে পথ করে কেল্লায় প্রবেশ করল।

—তোদের ক্যাপ্টেন কোথায়? জার্মান ভাষায় জিজ্ঞাসা করল হেসিয়ান।

উদ্যত কীরিচের মুখে পেছনে হটে গিয়ে মহাদেশীয় ফৌজ বিহ্বল দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

—ক্যাপ্টেন কোথায়? ধমকে উঠল হেসিয়ান ফৌজদার।

আঙুল দিয়ে ম্যাগকে দেখিয়ে কম্পিত দেহে পেনসিলভানিয়ার দেশগাঁয়ের এক জার্মান সভয়ে জবাব দিলঃ ঐযে। সর্বস্বান্ত হৃতজ্ঞান মানুষের মত ঝাপসা চোখে ম্যাগ দাঁড়িয়ে ছিল পেছনে।

—লোকটা জার্মান জানে দেখছি! হেসে বল্লে ক্লাইপহাউজেন।

বিমূঢ়ভাবে মাথা ঝাকাতে ঝাঁকাতে সামনে এগিয়ে এল ম্যাগ।

—তোর নাম কি?

জার্মান ভাড়াটিয়া ফৌজ, উদ্যত কীরিচ এবং তার পরাভূত সৈনিকের ভীড়ের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ম্যাগ। জার্মান সেনানীর জিজ্ঞাসার অর্থ কিছুই বুঝল না।

—নাম কি বল! আবার জিজ্ঞাসা করল ক্লাইপহাউজেন।

ঠিক মত তার কথার অর্থ না বুঝলেও, কি সে বলতে চাইছে তা বুঝতে পেরে চাপাগলায় বল্লেঃ কর্নেল ম্যাগ।

—তোর র‍্যাংক কি?

অসহায়ের মত আবার মাথা নাড়ল আমেরিকান সেনানী। তখন ম্যাগর কোমরের তরবারিখানা দেখিয়ে খেঁকিয়ে বল্লে ক্লাইপহাউজেনঃ দুত্তোর কুত্তা কাঁহাকার! তরবারিখানা দে!

কথার অর্থ না বুঝে আবার ধীরে ধীরে মাথা ঝাকাল ম্যাগ। জার্মান সৈনিকেরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

—তরবারিখানা দিতে বলছি!

এতক্ষণে ম্যাগ ব্যাপারটা বুঝতে পারল। সংগে সংগে সাধারণতন্ত্রের সেনানীর পদমর্যাদার পক্ষে শোভন ভংগীতে শিরদাঁড়া টান করে উন্নত শিরে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। তারপর কোমর থেকে খুলে ফেলল বন্ধুবান্ধবের দেওয়া শিলিং এবং তাদের সন্তান-সন্ততির দেওয়া পেনি দিয়ে কেনা তরবারিখানা। ছোট্ট সাদা একটি গীর্জায় এই তরবারিখানা তার হাতে তুলে দিয়ে এক ক্যাথলিক পুরোহিত তাকে ভগবানের নামে শপথ করে বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী চলবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ক্লাইপহাউজেনের হাতে সেই তরবারিখানা তুলে দিতে গিয়ে তার চোখে জল এল। সেজন্য নিজের একটু লজ্জাও হল। কিন্তু জার্মান ফৌজদারটি তরবারিখানা নিয়ে ঈষৎ মাথা নেড়ে বল্লেঃ ব্যস্!

এবারে জার্মান জ্যাগাররা পর্যন্ত হাসল না।

গ্রীন চোখে অন্ধকার দেখল। মনে হল যেন নরকের অতল অন্ধকারে খাবি খাচ্ছে। লোকজনের সামনে পদমর্যাদা অনুযায়ী স্থৈর্য দেখাবার দায় এড়াবার জন্য সে নিজের তাঁবুতে লুকিয়ে রইল। উপুড় হয়ে বিছানায় শুয়ে সে ভাববার চেষ্টা করল, মানুষ নিজের ভুলে যখন শুধু নিজের মৃত্যুই ডেকে আনে না, সংগে আর দশজন প্রিয় পরিজন বন্ধুবান্ধবেরও সর্বনাশ করে বসে, তখন কি সে করে? তার মনে হল, সে একাই দেশের সর্বনাশ করেছে। এর বেশী চিন্তা করা গ্রীনের মত লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। সে ভাবতেই পারে না যে, ওঁচা লোক নিয়ে গড়া এই ছিন্নভিন্ন ক্ষুদ্র বাহিনী এমন মারাত্মক সর্বনাশা আঘাত সামলে উঠতে পারে।

অন্যের ত্রুটি বিচ্যুতির চুলচেরা বিচার সে করল না। একমাত্র নিজেকেই দোষ দিল। সে জানত, একমাত্র তার অনুরোধ ওকালতির জন্যই ভার্জিনিয়ান নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, লীর মতামত উপেক্ষা করে কেল্লা ছেড়ে না দেবার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু আজ সব খতম হয়ে গেছে। আশা, ভবিষ্যৎ, বিপ্লব সবই ডুবেছে। মনে মনে সে ভাবতে লাগলঃ কেন সে কেল্লায় রয়ে গেলো না? কেন সে প্রাণ দিলো না? কেন পেন্সিলভানিয়ানদের সংগে থেকে জার্মান বেয়নেটের উপর ঘৃণাভরে থুথু ফেললো না? আর দশজন সাচ্চা লোক যেমন পুরস্কার পেয়েছে তেমনি ভাবে কেন সে অন্ধকারে তলিয়ে যেতে পারলো না?

এইসময় হঠাৎ সে তাঁবুতে একজন লোক ঢুকবার শব্দ শুনতে পেল।

মোড় ফিরে দেখল, তাঁবুর প্রবেশদ্বারে সামান্য কুঁজো হয়ে শিয়াল-শিকারী দাঁড়িয়ে আছেন। অন্ধকারে কালো ছায়ার মত শুধুমাত্র তাঁর কায়াটিই দেখা যাচ্ছে। কোন মুখভংগী বা ভাবব্যঞ্জনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল গ্রীন।

—বসো নাথানেল! শিয়াল-শিকারী বল্লেন।

গ্রীন বসল এবং অনিবার্য আঘাতের জন্য নীরবে নিজেকে শক্ত করে নিল।

—বড্ড বেশী আঘাত পেয়েছো, না নাথানেল?" শিয়াল-শিকারী বল্লেন।

—স্যর!

—আমার ধারণা, আরও জোর আঘাত পাবে।

বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টিতে গ্রীন তাকাল লম্বা লোকটির দিকে। তাঁর মুখ-ভংগী দেখবার চেষ্টা করল। দেখতে চাইল যে, মুখমণ্ডলের কোন অভিব্যক্তি থেকে তাঁর চিন্তাধারার কোনও হদিস পাওয়া যায় কি না।

—এই তো সবে শুরু হলো! মাথা নেড়ে শান্তভাবে বল্লেন শিয়াল-শিকারী।--কোথায় আমরা চলেছি, কি আমরা করছি, আর কবেই বা এর শেষ হবে, এ শুধু ভগবানই জানেন। কিন্তু তবু আমরা চলেছি।

—স্যর!

—বুঝলে নাথানেল, তবু পথ চলছি আমরা।

আবার উঠে দাঁড়াল গ্রীন। হাত বাড়িয়ে বড় আদমীর হাতখানা চেপে ধরল। মনে হল, সংসারের এই বিভীষিকাময় গোলকধাঁধায় এই হাতখানাই একমাত্র সাচ্চা জিনিস।

—স্যর। শিয়াল-শিকারী তার অশ্রুভরা চোখ দেখতে পারল না বলে সে খুশীই হল।

—চিরকাল আমরা চলবো নাথানেল।

—চিরকাল স্যর!

ধুলোভরা পথে ২৮১৮ জন মহাদেশীয় সৈনিকের প্রায় মাইলখানেক লম্বা এক মিছিল চলেছে। রক্ত ও ধুলো-কাদা-মাখা নোংরা বিবর্ণ মুখে অবশভাবে হাত ঝুলিয়ে পা টেনে টেনে চলেছে তারা নিউইয়র্কের দিকে। নিহত আর আহতদের বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাড়াহুড়া করে বানানো স্ট্রেচারে। আর এদের অন্তরে সমাধিস্থ হয়ে আছে একটা গোটা সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা। এদের পথ চলার সংগে সংগে বাজছে হেসিয়ানদের ড্রাম আর বৃটিশের বাঁশী। বাতাসে

ঝরে পড়ছে হেমন্তের পাটল পাতা। আর বিজয়োল্লসিত এক দল হেসিয়ান পতাকাবাহীর হাতে পত্ পত্ করে উড়ছে র‍্যাটল সাপ লাঞ্ছিত ঝান্ডা।

মিছিলটি শহরের কাছাকাছি আসতেই পথের দুধারে পরিহাসউচ্ছ্বল কৌতূহলী নাগরিকদের ভীড় বেড়ে চল্ল। শত শত ভ্রষ্টা আর বেশ্যা ছুটে চল্ল মহাদেশীয় সৈনিকের সারির দুই পাশ দিয়ে...পরাজিত ফৌজ সম্পর্কে খেয়ালখুশী মাফিক মন্তব্য প্রকাশ করল...বৃটিশ সৈনিকের বেড়ার ফাঁক দিয়ে মুখ বার করে খিস্তি খেউড় করল.. থুথু দিলে। লাল-কোটয়ালারা তাদের আটকাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল। ছোট ছেলে-মেয়েরা মহাদেশীয় সৈনিকদের মাথায় কাদার ডেলা ও পাথরের কুচি বর্ষণ করল। চীৎকার চেঁচামেচি করে তারা যে রব তুলল, শেষ পর্যন্ত সমস্ত নাগরিকই তার ধুয়া ধরলঃ ওয়াশিংটন কোথায়? ওয়াশিংটন কই? ওয়াশিংটন কে? ওয়াশিংটনকে দেখাও! মহান ওয়াশিংটন কোথায়? কে ওয়াশিংটন? কোথায় সে? দেখাও না তাঁকে! কোথায় সেই আলাল? আমেরিকার শ্রেষ্ঠ ধনীর চেহারাটা দেখাও না একবার!

কোরাসে গান ধরে দিল জনতাঃ শিকারে যাবো, আমরা শিকারে যাবো; শিয়াল ধরে মোরা খাঁচায় পুরবো; তারপর আবার তাকে ছেড়ে দেবো।

—আরে ওয়াশিংটন কোথায়? জনতা দাবী জানাল।

—ওয়াশিংটনকে দেখাও না!

আবার গান ধরল জনতাঃ শিয়াল ধরলে কে বলো, শিয়াল ধরলে কে?

প্রধান সেনাপতির মত বাফ্ ব্রিচেস আর নীল জ্যাকেটপরা প্রতিটি সেনানীর চারপাশে পাক খেয়ে তারা জিজ্ঞাসা করতে লাগলঃ ওয়াশিংটন? এই ওয়াশিংটন?

বার বার লাল-কোটয়ালারা তাদের মেরে তাড়াল। তবু বার বার ফিরে এসে তারা বলতে লাগলঃ ওয়াশিংটনকে দাও না একটিবার। আমরা তার বিজয়োৎসব করবো।

জার্মান জ্যাগারদের ড্রাম আর বাঁশীতে 'ইয়াংকি ডুডলের' সুর বেজে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে কুলটারা গান ধরলঃ

টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে
ইয়াংকি বাবু গেলেন লণ্ডনে,
মাথায় চড়লেন পালক,
বলেন ওটা ম্যাকারোনি।

এই সোরগোলের মধ্যে বৃটিশ কোয়ার্টার মাস্টার বিভাগের এক সার্জেণ্ট তার কর্নেলকে আটক অস্ত্রশস্ত্রের এক ফিরিস্তি শোনাচ্ছিল। একটানা সুরে পড়ে গেল সার্জেণ্টঃ

—কামান একশো ছিয়াল্লিশটি।

—গোলাগুলী এবং কেস বারো হাজার।

—বন্দুক আঠাশশো।

—বল্লম ন' শো।

—কীরিচ চোদ্দশো। বাঁকানো আর মরচেধরা, দেখলে ঘেন্না করে স্যার।

—কার্তুজ চারলাখ।

—তরবারি দুশো সত্তরখানা...

একটু থেমে বল্লেঃ আঃ! মাফ করবেন স্যার, এই সোরগোলের জন্য...

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা প্যালিসেদ শৈলশ্রেণীর মাথায় পায়চারি করতে করতে শোকাতুর নিঃসঙ্গ আতঙ্কিত শিয়াল-শিকারী সমস্ত অনুভূতি নিজের মধ্যে শৃংখলিত করে রাখলেন। বরাবর অকৃতকার্য হয়েছেন তিনি। ভবিষ্যতেও হবেন। তাঁর মত হাঁদা ভার্জিনিয়ান ভদ্রলোক দিয়ে কোন কাজ হবে না। বরাবর তিনি হাতের মুঠোয় জল আর বালি ধরেছেন; কিন্তু আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে পড়ে গেছে। কোনদিন কোন কঠিন পদার্থ ধরতে পারেননি। অকৃত্রিম ঘনিষ্ঠ বন্ধুর স্ত্রীকে ভালবেসে বিস্ফোরকের মত অন্তরে বয়ে বেড়িয়েছেন সে ভালবাসা। দগ্ধে মরেছেন। কিন্তু যেদিন সে দূরে সরে গেল, শুধু চেয়ে দেখলেন। হতাশা এসে বেদনার বোঝা আরও ভারী করে তুলল। ভালবেসেছিলেন হাঁদা একটা সৎ মেয়েকে। যেদিন সে মরণের মুখে এসে দাঁড়াল, নতজানু হয়ে তার বিছানার পাশে বসে ফুঁপিয়ে কেঁদে কত কাকুতি করলেন তাকে না-মরবার জন্য। না না, নেহাৎ জ্ঞানগম্যি রসকসহীন গেঁয়ো ভূত তিনি। না জানেন শোভনভাবে চলবার কায়দা-কৌশল, না আছে শোধরাবার আশা।

বৃটিশরা ওয়াশিংটন কেল্লা দখল করবার দিনকয়েক পরে, হাকেনসাক থেকে পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়ে লী কেল্লায় যাবার পথে হেনরি নক্স বড় আদমীকে দু'চারটে কথা বলতে চাইল। ওয়াশিংটন কেল্লার কেলেঙ্কারী ঘটবার সময় নক্স ছিল হাকেনসাকে। এ সম্পর্কে খাঁটি খবর সর্বপ্রথম সে জানতে পেল

গ্রীনের পত্রে। তার অসংবদ্ধ হতাশ স্বীকারোক্তিতে। অবশ্য তারা দুজন, মিফ্লিন, মার্কার ও পুটনাম—এই পাঁচজনই সৈন্যবাহিনীতে বলতে গেলে প্রধান সেনাপতির একমাত্র নির্ভর। কিন্তু সে কথা ছেড়ে দিলেও মানুষ হিসাবে, বন্ধু হিসাবে, নক্সের ভাল লাগত গ্রীনকে। তাই গ্রীনের স্বপক্ষে দু'চার কথা সে বলতে চাইছিল।

—একটা ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু এমন ভুল তো যে কোনো লোকে করতে পারতো। ভূমিকা করে আরম্ভ করল নক্স।

—স্যর? উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালেন ভার্জিনিয়ান।

—আমি বলছিলাম স্যর, সে কারও এমন ভুল হতে পারতো। নাথানেলের একখানা চিঠি পেয়েছি আমি। আপনাকে কি বলবো স্যর, আমার তো ভয় হয়েছিলো, সে আত্মহত্যা না করে বসে!

—হাঁদার মতো যা তা বলো না হ্যারি।

নাক সোজা চেয়ে কদমে এগিয়ে চল্লেন বড় আদমী। নক্স বুঝতে পারল যে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। কিন্তু এ ভুল কেমন করে যে শোধরান যায় তাও ঠাহর করে উঠতে পারল না। চিন্তাশীল লোক সে নয়। চোখের সামনে বাস্তব যেটুকু দেখে ততটাই বোঝে। একথা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না যে বিপ্লবের দম খতম হয়ে গেছে। আজকের অবস্থায় এইটেই সত্য। আজাদী ফৌজের মত ক্ষুদ্র একটি বাহিনী যদি সুশিক্ষিত এবং সুসজ্জিত হয়, তাহলেও তার পক্ষে অস্ত্রশস্ত্র এবং রসদসহ তিন হাজার সৈন্য হারাবার আঘাত সহ্য করা দুস্কর। কিন্তু আমেরিকান ফৌজ সুশিক্ষিতও নয়, রসদ জোগান দেবার সুব্যবস্থাও তার নেই।

—কিন্তু আমি অপেক্ষা করবো। মনে মনে ভাবল বই বিক্রেতা। কিন্তু কতদিন যে অপেক্ষা করতে হবে ভেবে কূল পেল না। তিন সপ্তাহ, না তিন-মাস, না...

আর সবাইর মত পুটনাম যুবক নন। আটান্ন বছরের বৃদ্ধ ইয়াংকি চাবী তিনি। ইদানীং স্বাস্থ্যও তেমন ভাল যাচ্ছে না। তিনি চান শান্তি ও নির্বিঘ্নতা। সংসারের আর সব কিছুর চাইতে নির্বিঘ্নতার কাঙাল তিনি। এখন আর কোন আগুনের শিখাই তাঁর মধ্যে জ্বলে না। বুড়িয়ে গেছেন। শুকিয়ে গেছেন। এখন মাথা গুঁজবার মত ঠাঁই পেলেই খুশী।

কোন উন্মাদনাবশে কিম্বা সাচ্চা কিছু পাবার আশায় তিনি বিপ্লবীদলে

যোগ দেননি। একদিন দিনমজুর নিয়ে খামারের একটা পাথুরে দেয়াল তৈরী করছিলেন। পাথর কেটে বসাতে পিঠ টন্‌টন্‌ করছিল। সেদিন একটিমাত্র কথাই তাঁর মনে জেগেছিল। ভাবছিলেন, নয়া ইংলণ্ডের সুপ্রাচীন একটি প্রবাদের কথাঃ সৎ পড়শীরাই ভাল দেয়াল বানায়। অপর কোন চিন্তাই ছিল না তাঁর মনে। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে এক ঘোড়সওয়ার এসে লেকসিংটন এবং কনকর্ডের খবর জানাল।

—ও আমার ভালো লাগে না। মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিলেন পুটনাম।

—বুড়ো শেপ ফেদারালিকে মনে পড়ে? সে মারা গেছে। গুলী করে মেরেছে তাকে। .

—কাজটা ভালো করেনি। না করাই উচিত ছিলো। পুটনাম বল্লেন। কিন্তু বয়স হয়েছে বলে তখনই বুঝতে পারলেন যে, তাঁর শান্তি ও নির্বিঘ্নতার আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। বুঝলেন, এই বুড়ো হাড় কখানা টেনে টেনে কোথাও কোন একটা কিছু তাঁকে করতে হবে। বিদ্রোহী হিসাবে নয়, গণ-তন্ত্রী হিসাবেও নয়, সৎ পড়শীরা ভাল প্রাচীর বানায় এই প্রবাদবাক্য অনুসারে একটা কিছু না করে উপায় নেই। তার পর এই দেড় বছরের মধ্যে বিপ্লব আর ইতর ভীতু ইয়াংকিদের সংগ্রামের প্রসহন ধুয়ে মুছে গেছে। এখন সংশয় হচ্ছে, খামারে ফিরে গিয়ে বাকী দিনকটা তিলে তিলে নিজেকে খুইয়ে দেওয়া ছাড়া সত্যিই আর কিছু করবার আছে কিনা।

মাস বা বছর গুনতিতে খুব বেশীদিন না হলেও, দিনকাল যে ভাবে বদলে যাচ্ছে সে অনুপাতে বেশ কিছু দিন পূর্বে, রোডস্‌ দ্বীপে জনকয়েক মিলে এক গণফৌজ গড়ে তোলে। তরুণ নাথানেল গ্রীনকে এই ফৌজের জেনারেল বানান হল। **'ইয়োরোপ খণ্ডের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত সামরিক কলাকৌশল —সুযোগ্য ফৌজদার তৈরী করবার পক্ষে প্রয়োজনীয় গুণাবলীর সংক্ষিপ্তসার সম্বলিত**—এই নামের একখানি কেতাব গ্রীন প্রায় সর্বদাই পড়ত। সেই কারণেই তাকে সেনাধ্যক্ষের পদে নিয়োগ করা হল। কেতাবখানি বগলে নিয়ে সে গণসেনাদের কুচকাওয়াজ করিয়েছে। আর হাসিখুশী খুপসুরৎ মেয়েরা মুগ্ধ সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাই দেখে অবাক হয়ে গেছে। গ্রীনের বয়স তখন মাত্র তেত্রিশ বছর। সুদর্শন জোয়ান চেহারা। তাছাড়া নিজের পায়ে ভর করে মানুষ হয়েছিল সে।

তার বাবার এক বৃদ্ধ কোয়েকার বন্ধু ছিল। একদিন কুচকাওয়াজের পর

বিকেল বেলা তাকে একান্তে ডেকে নিয়ে পিতৃবন্ধু বল্লেনঃ তোমায় দু'একটা কথা বলবো নাথানেল।

—বলুন! আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে কোয়েকাররা তাকে সমাজচ্যুত করে। সে রাগ গ্রীনের তখনও যায়নি। নতুন উর্দি পরে বিরক্তভাবে সে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

—তুমি লড়াইয়ে যাচ্ছো নাথানেল?

—হাঁ।

—এ কাজে বিবেকের সমর্থন পাবে?

—কি করতে হবে বা না হবে, সে আমি বুঝবো।

—নিশ্চয় বুঝবে নাথানেল! কিন্তু একথাটা কি ভেবে দেখেছো যে অমঙ্গলের মধ্য দিয়ে কোন দিন মঙ্গল আসে না।

—মঙ্গল অমঙ্গলের ধার আমি ধারি না। আর দু'পাঁচটা কথা ভেবে বল্লে গ্রীন। মানুষের অধিকার, স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা—এ সবের ধারও সে ধারত না। লড়াইয়ের মহান দুঃসাহসী অভিযান তার সম্মুখে সীমাহীন ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে। আসলে সেই মোহই আকৃষ্ট করেছে তাকে। তবু যে কারণেই হোক, পিতৃবন্ধুর কাছে কথাটা তখন সে খুলে বলতে পারল না।

কিন্তু আজ এত মাস পরে, পিতৃবন্ধু বৃদ্ধ কোয়েকারের কথা স্মরণ করে, সীমাহীন ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পরিবর্তে সম্মুখে সুনির্দিষ্ট মর্মান্তিক পরিণতির ছক দেখে, সে নিজের সম্পর্কে যে কোন একটা পরিকল্পনা স্থির করবার চেষ্টা করল। চেষ্টা করল নিজেকে আবার নতুন করে ভার্জিনিয়ান এবং আজাদী ফৌজের সঙ্গে জড়িয়ে দিতে।

শিয়াল-শিকারী এবং নক্স ঘোড়ায় চড়ে যাবার পর হাকেনসাকে একটা আগুনের চুল্লীর পাশে বসে এড্‌জুটান্ট রীড ভূত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক কথাই চিন্তা করল। তবু দীর্ঘ ভার্জিনিয়ার চাষীর হাতুড়ে নেতৃত্বের মধ্যে কোন আশার আলো খুঁজে পেল না। তাঁর সব কিছুই বিশ্রী, ভুলচুকে ভরা বলে মনে হল। মনে হল, সে এমন একটা ঐতিহাসিক মুহূর্তের মধ্য দিয়ে চলেছে, যখন একটা আন্দোলন ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। আকস্মিক দুশ্চিন্তায় সহসা তার কোমল আঙুল কটা গলার শিরা ও পেশী অনুভব করতে লাগল। ফাঁসির

চিন্তা আদো সুখকর নয়। লকলকে অগ্নিশিখার প্রতিটি কম্পনের মধ্যে সে ফাঁসির মঞ্চের ছবি দেখতে লাগল।

সামান্য আগে ভারমণ্টের পাঁচশো চাষীকে সে ঠান্ডামাথায় ছাউনি ছেড়ে চলে যেতে দেখেছে। গোপনে দল ছেড়ে পালাবার চেষ্টা তারা করেনি। তারা বেশ বুঝতে পেরেছে যে জিগ-নাচের আসর ভেঙেছে। তাই সুস্থমস্তিস্কে ইয়াংকিদের মত ঘাড়ের উপর মাথাটা থাকতে থাকতেই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেছে। হাডসন নদীর পশ্চিম পাড়ে এরাই ছিল ইয়াংকিদের শেষ দল। এরা চলে যাবার পর পেছনে পড়ে রইল শুধু মধ্যদেশ, পেনসিলভানিয়া এবং জার্সি'র লোকজন। সবাইর মুখগোমরা ক্ষুব্ধ ভাব।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে রীড নিজের তাঁবুতে চলে গেল। পালকের কলম, দোয়াত এবং কাগজ বার করে সে জেনারেল চার্লস্ লী'র কাছে পত্র লিখতে বসল।

'......আর দশজনের সঙ্গে তুলনা করে আপনাকে প্রশংসা বা তোষামোদ করবার অভিপ্রায় আমার নেই। আমি বিশ্বাস করি, কেবলমাত্র আপনার জন্যই এই বাহিনীটি এখনও সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েনি; এবং আমেরিকার স্বাধীনতা যতটা এর উপর নির্ভর করে, তার আশাও একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা আপনার আছে। অন্যান্য গুণপনা সত্ত্বেও এ গুণ আর কারও নেই। আমি বিশ্বাস করি যে আপনার এই গুণের জন্যই ইয়র্ক দ্বীপ, কিংসব্রিজ এবং প্লেইনসের ফাঁদ এড়িয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আপনি এখানে উপস্থিত থাকলে ওয়াশিংটন পাহাড়ের গ্যারিশন আজও এই ফৌজের অংশ হয়ে থাকত। এই অবস্থায় আমি অকপটে জানাচ্ছি যে, যেখানে আপনার বিচারবুদ্ধি ও ভূয়োদর্শিতার প্রয়োজন নেই বললেই চলে, সেখান থেকে আপনি এমন জায়গায় চলে আসুন যেখানে তার প্রয়োজন ঘটতে পারে। এ আমার ঐকান্তিক কামনা। শুধু আমার কেন, অনেকেই এ ধারণা পোষণ করে। প্রত্যেকটি ভদ্রলোক, বহু ফৌজদার ও সৈনিকের আস্থা আছে আপনার উপর। আপনি কোথায় আছেন শত্রুপক্ষও প্রায়শ তার খোঁজ খবর নেয় এবং আপনি উপস্থিত আছেন জানতে পারলে তেমন ভরসা নিয়ে কাজ করতে পারে না।. ....'

নক্স ও ভার্জিনিয়ান লী কেল্লায় পেঁৗছানমাত্র নতুন এক দুঃসংবাদ জানাল গ্রীন। লী কেল্লার মাইল ছয়েক উত্তরে ছ'হাজারের মত বৃটিশ সেনা হাডসন নদী পার হয়েছে। কেল্লা এবং হ্যাকেনসাকের ছাউনি একসঙ্গে ঘের দিয়ে বিচ্ছিন্ন করবার আশায় ইতিমধ্যেই তারা বৃহৎ বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ছে দেশের অভ্যন্তরে।

—এইবার আমাদের সবশুদ্ধ খতম করে দিতে চায়। ক্ষুব্ধকণ্ঠে নিরাশ-ভাবে বল্লে গ্রীন। —তারা বেশ জানে, একাজ তাদের পক্ষে কঠিন নয়। আমি হলপ করে বলতে পারি, তাদের ঠেকাবার কোন উপায় নেই।

—তুমি কেল্লা থেকে সৈন্য সরিয়ে নিতে শুরু করেছো? ভার্জিনিয়ান জানতে চাইলেন।

—কোন ঘোড়া নেই, গাড়ি নেই, কি করে সরিয়ে নেবো? আমি ভাবছি-লাম খানিকটা সময়ও যদি আমরা ওদের রুখতে পারতাম! গ্রীন ও নক্স মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। তারপর একটু থেমে অসহায়ের মত গ্রীন বল্লেঃ হায় ভগবান! কোথায় যে শেষ হবে!

—এখুনি কেল্লা ছেড়ে যাবার বন্দোবস্ত করো। বড় আদমী বল্লেন।

—সে কি স্যর! তাঁবু, রসদ, কামান, এগুলো সব কি করবো?

—যা বলছি করো। এখুনি কেল্লা ছেড়ে যাও!

—সব কিছু ফেলে যাবো?

—সব কিছু।

—কাল হয়তো কামান কটা টেনে নেবার ঘোড়া পাওয়া যেতে পারে। অনুনয়ের সুরে নক্স জানায়।

—না, এখুনি ছেড়ে যেতে হবে।

ঘোড়ার পিঠে বসে শিয়াল-শিকারী দেখলেন, স্রোতের মত লোকজন কেল্লা থেকে বেরিয়ে আসছে। তাঁবুগুলো যেমন খাটান ছিল তেমনিভাবেই পড়ে রইল। সৈন্যশিবিরের বিরাট বিরাট লোহার কেত্‌লিগুলো রইল উনুনে চড়ান। তোপভরা কামান রইল মুখ উঁচু করে ঠিক যেমনটি ছিল সেইভাবে। সৈনি-কেরা হ্যাকেনসাকের দিকে পালাবার সময় তিনি রইলেন সবাইর পেছনে। রাখালের মত তাদের তাড়িয়ে নিয়ে চল্লেন। যখনই তারা ঢিমা-ঢিলা ভাবে চলতে লাগল, কিম্বা হোঁচট বা আছাড় খেয়ে পড়ল, ধমকানির সঙ্গে সঙ্গে সপাসপ চাবুক চালালেন বড় আদমী। এ এক অদ্ভুত দিশাহারা কুৎসিত দৌড়। শত শত লোক ছুটছে, হাঁপাচ্ছে, হাঁটছে, আবার ছুটছে হ্যাকেনসাকের

পথ ধরে। একটা জাতির নবজন্ম শেষ পর্যন্ত মুখে ব্রণচিহ্নওয়ালা দীর্ঘকায় এক চাষীর তদারকে পলায়নের দৌড় প্রতিযোগিতায় পরিণত হল। আর তার দর্শক হল গুটি চারেক ওলন্দাজ শিশু। রুটি আর দই চিবোতে চিবোতে আশ্চর্য নির্লিপ্তভাবে তারা দেখছিল এই পলায়ন। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে একটি হালকা বৃটিশ অশ্বারোহী দলও দেখল, এবং ফিরে গিয়ে লর্ড কর্ন-অয়্যালিসের কাছে রিপোর্ট করল।

—বড্ড দেরী হয়ে গেছে স্যর!

—ওরা কেল্লা ছেড়ে গেছে?

—হন্যে হয়ে পালাচ্ছে হাকেনসাকের দিকে। দেখলে মনে হয়, ভূতে তাড়া করেছে বুঝি।

লোকজন গুণে দেখবার ইচ্ছা হল তাঁর। নক্সকে বললেন গুণতে।

—স্যর! নক্স ডাকল।

—গুণেছো? সাতবার একটা কথা না বললে কি কোনো কাজ হবে না নক্স?

—মাফ করবেন স্যর! আমি বলছিলাম. যারা দল ছেড়ে গেছে...

—আমি অন্ধ নই। জানি, অনেকে ভেগেছে।

—কিন্তু স্যর। দু'দশজন তো নয়! গোটা রেজিমেণ্টকে রেজিমেণ্ট ভেগেছে।

—যারা আছে আমি তাদের সংখ্যা জানতে চাই।

মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নক্স গোণা গুণতি শেষ করতে পারল। ফিরে এসে বল্লেঃ দু'হাজার ন'শো এগাবো জন স্যর!

বড় আদমী অবাক বিস্ময়ে তাকালেন নক্সের দিকে। সে বল্লেঃ কসুর মাফ করবেন স্যর!

—তুমি ঠিক বলছো তো?

—ঠিকই বলছি স্যর!

বড় আদমী ঘাড় নেড়ে জানালেনঃ আচ্ছা ঠিক আছে।

হাকেনসাক থেকে আজাদী ফৌজ ক্লান্তপদে এগিয়ে চল্ল নিউআর্ক অভিমুখে। পথিমধ্যেই বৃষ্টি আরম্ভ হল। টিপটিপে বৃষ্টি নয়, শুরু হল হিমশীতল অবিশ্রাম ধারাবর্ষণ। একটু পরেই রাস্তা কর্দমাক্ত হয়ে উঠল। তাদের পা-ফেলার একটানা পচ্‌পচ্‌ শব্দ ছাড়া আর কোন সাড়াশব্দই ছিল না। কুঁজো হয়ে ঘাড় গুঁজে দু'হাতে বন্দুক জড়িয়ে ধরে চলছিল সৈনিকেরা। সামনে যারা ছিল, তাদের পায়ের চাপে কাদা পেষাই হল। তাদের

পেছনের লোকজনের পা কাদায় আরও খানিকটা বেশী ঢ়ুকে গেল।...কিন্তু মাইলখানেক লম্বা এই সারের শেষের দিকে যারা ছিল, তাদের কাছে পথটি জলায় পরিণত হল। দুই পাশে পুটনাম আর রীডকে নিয়ে শিয়াল-শিকারী যাচ্ছিলেন সবার আগে। তিনজনেই ভিজে চুপচুপ হলেন। পুটনামের সর্বাঙ্গে বাতের বেদনা ছিল বলে তারই কষ্ট হল সব চাইতে বেশী। এদের খানিকটা পেছনে হাড্ডিসার একটি ঘোড়ায় চড়ে আসছিল গ্রীন। অবশিষ্ট সামান্য কয়েকটি কামান নিয়ে নক্স হেঁটে আসছিল ক্যাপ্টেন হ্যামিলটনের সঙ্গে সঙ্গে। আর মার্কার তদারকি করছিল সবার পেছনে। আতঙ্কগ্রস্ত কংগ্রেসের কাছে আবেদন করে আরও কিছু সৈন্য সংগ্রহের আশায় মিফলিন সেইদিনই রওনা হয়ে গেছল ফিলাডেলফিয়ায়।

পথ চলতে চলতে ভার্জিনিয়ানকে জিজ্ঞাসা করল রীডঃ কোথায় গিয়ে ছাউনি ফেলবো আমরা?

—সম্ভব হলে নিউআর্কে।

—সেখান থেকে আবার পিছু হটবো?

বড় আদমী নীরবে মাথা নাড়লেন।

—কতদিন এইভাবে চলবে?

—জানি না।

—এমনিভাবে চিরকাল আমরা পালিয়ে বেড়াতে পারি না। রীড বলে।

—আমার বিশ্বাস, পারি। প্রায় চিরকাল পারি।

—কোথায় যাবো?

—পেনসিলভানিয়ায়।

—সেখানেও ওরা যদি ধাওয়া করে? রীড আবার জিজ্ঞাসা করে।

—তাহলে আরও পশ্চিমে যাবো!

—কোথায়?

—এলিঘেনিজ পর্বতমালা পার হয়ে।

যে বিশাল দশ লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত অজ্ঞাত রহস্যময় শ্বাপদসঙ্কুল তমসাচ্ছন্ন কান্তারের ইঙ্গিত ভার্জিনিয়ান করলেন, সে গহিন অরণ্য রীডের কল্পনাতীত। পুটনামের পক্ষে সেখানে যাবার অর্থ আরও দুর্ভোগ, আরও ক্লেশ, আরও যন্ত্রণা ভোগ করা। কিন্তু ভার্জিনিয়ানের কাছে এই বিশাল কান্তার স্থির লক্ষ্যে পৌঁছুবার একটানা পথের একটা বাঁক মাত্র।

পাঁচ হাজার নয়া-ইংলণ্ডের ইয়াংকি সৈন্য সহ জেনারেল চার্লস লী ছিলেন ওয়েস্টচেস্টারে। যখনই তেজীয়ান কষ্টসহিষ্ণু দূরপাল্লায় দৌড়াবার পক্ষে নির্ভরযোগ্য ঘোড়া পাওয়া যেত, তখনই এক সানুনয় পত্রসহ সেটাকে পাঠান হত লীর কাছে। সব কখানা পত্রেরই সুর এক। প্রতি পত্রেই তাঁকে হাডসন পার হয়ে সসৈন্যে ভার্জিনিয়ানের সঙ্গে মিলিত হবার বিনীত অনুরোধ জানান হত। কিন্তু লী তখন নতুন মতলব আঁটছেন।

ভাড়াটিয়া সৈনিকের কাছেও ত্রিশ হাজার ডলার এবং ভাগ্যোন্নতির মধ্যে প্রভেদ আছে। যত দিন যাচ্ছে ততই যেন ভাগ্যদেবী লীর উপর সুপ্রসন্না হচ্ছেন। বরাত খুলবার দিন ক্রমেই এগিয়ে আসছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে লী যখন তাঁর চোয়াড়ে বিশ্রী মুখ নিরীক্ষণ করতেন, মনে হত যেন ভাগ্যদেবী তাঁর কাঁধে ভর করেছেন। অস্ফুটভাষায় যখন তিনি কুকুরগুলোকে আদর করতেন, তখনও ভাগ্যদেবীর প্রসন্ন হাসি অনুভব করেছেন। জোসেফ রীড সহ আনাড়ী ভার্জিনিয়ানের উপর অসন্তুষ্ট এবং ধৈর্যচ্যুত আর দশজনের কাছ থেকে যত চিঠি তিনি পেতেন, তার মধ্যেও বরাত খুলবার শুভ ইঙ্গিত থাকত।

চাষী, কারিগর আব ব্যবসাদারের এই বিদ্রোহের তামাসার সঙ্গে লী নিজের ভাগ্য জড়িয়ে ফেলেছেন। তাসের ঘরের মত এই উন্মাদ পরিকল্পনা ভেঙে পড়ছে। এ থেকে ভেগে পড়া খুবই সহজ। কিন্তু তাতে লাভ নেই। বৃটিশ-দের কাছে ঘৃণা আর অসম্মান ছাড়া আর কিছুই পাবার আশা নেই। যদি তিনি এই প্রাণহীন কংকালে প্রাণসঞ্চার করতে পারেন! বিদ্রোহ করে নয়। আজীবন সৈনিক হিসাবে মানুষ হয়েছেন তিনি। বিদ্রোহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কবা তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। কোনই অর্থ হয় না তার। কিন্তু পাকা ফল আপনা থেকে হাতের মুঠোয় খসেপড়া অবাধ তিনি যদি ধৈর্য-ধরে অপেক্ষা করেন? ভবিতব্যের ছক সুস্পষ্ট। ভিজা বালিব মত গলে যাচ্ছে শিয়াল-শিকারীর বাহিনী। আর দশদিন বিশদিন বড় জোর একমাস এই বাহিনীর বাঁধুনি থাকতে পারে। এ ব্যাপার ঘটতে ত্রিশ দিনের বেশী লাগতে পারে না, এই তাঁর দৃঢবিশ্বাস। ত্রিশ দিনেব মধ্যেই হাডসন নদীর পশ্চিম তীরের আজাদী ফৌজ উপে যাবে—শিয়াল শিকারী থাকবে বৃটিশ সামরিক আদা-লতের কাঠগড়ায়। এটা ওটা অজুহাত দেখিযে ভার্জিনিয়ানের অনুরোধ এড়িয়ে গিয়ে তাঁর পক্ষে এখন সুযোগের অপেক্ষা করাই সমীচীন। তাহলেই মাসখানেক কি তারও আগে তিনি মহাদেশীয় বাহিনীর প্রধান সেনা-

পতি হতে পারবেন। এ পদের উপযুক্ত আর কোনও লোক নেই। আর তখন তাঁর ফৌজ ছাড়া গোটা আমেরিকায় ধর্তব্যের মত বিদ্রোহী ফৌজই বা থাকবে কোথায়?

ভার্জিনিয়ান কিছুতেই সেই বালির উপমা ভুলতে পারছেন না! বার বার নিজের বড় বড় হাতের পাতার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে একবার মুঠ করতেন আবার খুলতেন। এ অভ্যাস শেষ পর্যন্ত মুদ্রায় পরিণত হল। তাঁর হাত এত বড় যে পালকের কলম দিয়ে লিখতে রীতিমত অসুবিধা হত। তিনি যদি পণ্ডিত হতেন, বাছা বাছা শব্দ চয়ন করে বানান ভুল এড়িয়ে কলমের ডগায় সুন্দর সুন্দর বাক্যরচনার এলেম যদি তাঁর থাকত, তাহলেও পালকের কলম ধরবার অসুবিধা তাঁকে ভুগতেই হত। কোন কিছু লেখা তাঁর পক্ষে যন্ত্রণা বিশেষ। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতিদিন রাত্রে মোমবাতি পুড়িয়ে নিউ-আর্কের তাঁবুতে বসে তিনি সৈন্য, রসদ ও কামান চেয়ে সানুনয় পত্র লিখতেন চার্লস্ লী, আতঙ্কিত কংগ্রেস এবং বিভিন্ন উপনিবেশের গবর্ণরদের কাছে। আর লেখবার ফাঁকে ফাঁকে নিজের গলায় হাত দিয়ে ভাবতেন, রাষ্ট্র-দ্রোহিতার জন্য যখন কারও ফাঁসি হয়, তখন কি ভাবে সেই ফাঁসটা দুলতে দুলতে গলায় আটকে যায়? কিছুদিন আগে একথা মনে হলে অপমানের জ্বালায় সর্বাঙ্গ রী রী করে উঠত। কিন্তু আজ ফাঁসি তাঁর কাছে আর দশরকম মৃত্যুর মত এক ধাঁচের শেষ পরিণতি বলেই মনে হল। তাই নিজের রোদে পোড়া লম্বা ভাঁজপড়া গলা রগড়াতে রগড়াতে আজ তাঁর মুখে বিষণ্ণ হাসিরেখা ফুটে বেরুল।

আজকাল প্রায়ই তাঁর ভারনন পাহাড়ের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে সূর্যস্নাত জীবনের কথা...ছোট্ট মোটাসোটা মার্থা...সাদা কোঠাবাড়ি ও সবুজ মাঠের কথা। শীত সমাগমে আজকাল স্মৃতিপটেও তার ছবি আঁকা দুষ্কর। ব্যাপারটা মাঝে মাঝে অদ্ভুত লাগে। তবু একথা তিনি সত্য বলেই মেনে নিয়েছেন যে, ভারনন পাহাড় আর কোনদিনই তিনি চোখে দেখতে পাবেন না। তাহলেও এর জন্য আজকাল তেমন অস্বস্তি বোধ করেন না। পাঁচ বছর কি ছ বছর আগেও যে মানুষ তিনি ছিলেন, তাঁর কাছে দ্রুত-বিলীয়মান বাহিনীর পরাভূত সেনাপতির আজকের অবস্থা যে কত অবিশ্বাস্য মনে হত, তা তিনি ছাড়া কেউই এত ভাল করে জানে না। রঙ-ওঠা কোঁচকান উর্দিপরা, নিউজার্সি ও পেনসিল্ভানিয়ার ভগ্নোদ্যম তরুণ ইতর জনতাবেষ্টিত ছেঁড়া-ফুটো তাঁবুতে বসা আজকের এই বিভ্রান্ত মানুষটির কথা তখন তিনি কল্পনাই

করতে পারতেন না। কিন্তু আজ আর সে-মানুষ তিনি নেই। সেদিনকার সে-মানুষের এমন একক, অটুট গর্ব থাকতে পারে না। আজকে ঐ গর্ব-টুকুই তো তাঁর সর্বস্ব। তখনও সে গর্বের বস্তুর কোন অস্তিত্ব ছিল না। এমন কি সে বস্তু যে কি, তাও কথায় বুঝিয়ে বলতে পারতেন না। তবু তাঁর গর্বের বস্তু যে মানুষের কতগুলো অধিকার, এ তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতেন।

বৃটিশ ফৌজ যখন নিউআর্কের এক প্রান্তে প্রবেশ করল, খণ্ডবিখণ্ড আমেরিকান ফৌজ তখন শহরের অপর প্রান্ত দিয়ে ভাগছে। ইংরেজদের খানিকটা হকচকিয়ে দেবার জন্য নক্স, হ্যামিলটন এবং আরও জনকয়েক মরিয়া হয়ে একটা বারো-পাউন্ডার কামানে গ্রেপ্-গোলা ভরে রাস্তাময় ধাতুর টুকরো ছড়িয়ে দিল। তারপর কামান ফেলে রেখে তারাও দৌড় দিল। নয়া-ব্রুনস্‌ভিকের পথ ধরে গোটা বাহিনী এলোপাথারিভাবে দৌড়োচ্ছে। বৃটিশের আগুয়ান প্রহরী দল সংখ্যায় এত অল্প ছিল যে তারা মহাদেশীয় বাহিনীকে আক্রমণ করতে ভরসা পেল না। কিন্তু বৃটিশ অশ্বারোহী সৈনিকেরা নিউ-আর্কের ঘরের চালে উঠে সোল্লাসে আজাদী ফৌজকে বিদায় অভিনন্দন জানাল।

নয়া-ব্রুনস্‌ভিক্ পেঁাছে তারা এই প্রথম আচমকা তুষারপাতের সম্মুখীন হল। ব্রুকলিন পাহাড় থেকে যখন তারা পিছু হটতে আরম্ভ করে, গ্রীষ্ম তখনও শেষ হয়নি। আর আজ নভেম্বর মাস প্রায় শেষ হতে চলেছে। এখনও সেই একই পোশাক পরে আছে। সত্যি কথা বলতে গেলে, যা ছিল তারও কিছু খোয়া গেছে। পালিয়ে পিছিয়ে আসবার সময় এখানে সেখানে এটা সেটা—একখানা কম্বল, একটা গাঁটরি, কি একটা জ্যাকেট পড়ে রয়েছে; কিন্তু নতুন কিছুই জোটে নি। অনেকদিন আগেই মোজা ছিঁড়ে গেছে। নতুন মোজা জুটবার কোন আশা নেই। ছেঁড়া জুতো এবং শতচ্ছিন্ন সোলের মধ্য দিয়ে নোংরা পায়ের আঙুল উঁকি মারছে। যাদের সোল ছিঁড়ে যায়নি, তাদেরটা ক্ষয়ে কাগজের মত পাতলা হয়ে গেছে। পশমী বস্ত্র প্রস্তুত করা আমেরিকায় নিষিদ্ধ। তাই পশমী পোশাক তাদের নেই বললেই চলে। গায়ে তাদের সুতির শার্ট, পরনে তাঁতে বোনা ব্রিচেজ্। কোনটাই টেঁকসই বা গরম নয়।

ধীরমন্থরে শীত এগিয়ে আসছিল। এতদিন পরে অবশেষে এখানে

পোঁছে গেল জার্সির সমতলভূমির হাড়কাঁপান কদর্য শীত। যেমন আর্দ্র তেমনি কনকনে। জার্সির কর্দমসিক্ত বা বরফচাপা পথে পথে তারা রেখে গেল তাদের ট্রেড মার্ক—তাদের পদচিহ্ন। বহু বৎসর এই একটিমাত্র চিহ্ন অন্য সমস্ত পথিকের চাইতে তাদের বিশিষ্টতামণ্ডিত করেছে। তারা রেখে গেল রক্তের দাগ—সহস্র পদের তাজা খুনের স্বাক্ষর। পথে পথে আঁকা এই রক্তের আলপনা সমস্ত পথচারীর কাছে ঘোষণা করেছেঃ এই পথ দিয়ে হেঁটে গেছে আজাদী ফৌজ, ইচ্ছে হয় চোখ ফিরিয়ে দেখো।

শুধু শীতের কাঁপুনিই নয়। তার সঙ্গে পেটে ক্ষিদের অনির্বাণ জ্বালাও তাদের অনুভব করতে হয়েছে। মাঠ ফসলশূন্য। সাফ করে কেটে নিয়ে গেছে। পথেঘাটে গরু ঘোড়ার সাক্ষাৎ পাবার জো নেই। খামারের দরজাও তালাবন্ধ। নিউইয়র্কের সদাশয় নাগরিকদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছে জার্সির ভদ্রলোকেরা। কতগুলো পরদেশী, নাবালক আর উন্মাদের এই পাঁচ-মিশালি ইতর জনতা তো আর তাদের বাহিনী নয়! জার্সির সমস্ত খড়খড়ি বন্ধ। চাষীদের বন্দুকে গুলী ভরা। ইংরেজদের গুলীতে যত সৈনিক প্রাণ দিয়েছে, তার চাইতে বেশী মারা গেল জার্সির খামারের দরজায়। দু দশজন নয়, শত শত দলত্যাগী সৈনিক ক্ষুধার তাড়নায় ভিক্ষা চাইতে গিয়ে গুলীর আঘাতে প্রাণ দিল গৃহস্থবাড়ির সামনে। কেমন করে অকস্মাৎ এমনতর পরিবর্তন ঘটল? কিছুতেই ঠাহর করে উঠতে পারল না বুভুক্ষুর দল। তারাও জার্সি এবং পেনসিলভানিয়ার লোক। তবু চট করে তারা নিজ দেশে পরদেশী পল্টন হয়ে গেছে! সবাই তাদের বিরুদ্ধে! সমস্ত দরজা রুদ্ধ . সমস্ত জানালা খিলআঁটা! মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কয়েক শ গজ দূরে গেলেই মৃত্যু অবধারিত!

খাদ্য ও বস্ত্র যেমন চাই, এর জবাবও তাদের একান্ত প্রয়োজন। একটি-মাত্র লোক এ প্রশ্নেব জবাব দিতে পারতেন। বেঁটে, কুৎসিৎ, লম্বা আপেলের মত মাথা—সে ইংরেজের নাম টমাস পেইন।

তাঁর চোখে আগুন ছিল। কাঁধের উপর একটা গাদা বন্দুক ঝুলিয়ে তিনি তাদেরই সঙ্গে সঙ্গে চলতেন। বন্দুকটি প্রায় তাঁর সমান লম্বা। সৈনিকদের সঙ্গেই তিনি খাওয়া-দাওয়া করতেন এবং অগ্নিকুণ্ডের কাছে তাদের নিয়ে বসতেন। তদেরই মত তিনি অসুস্থ, তাদেরই মত ক্লান্ত,

তাদেরই মত নোংরা এবং তাদের মতই তাঁর সর্বাঙ্গে উকুন। তবু তাদের প্রশ্নের জবাব একা তিনিই দিতে পারতেন।

প্রচার করতেন তিনি। যদি তিনি পরিচ্ছন্ন কি সুদর্শন হতেন, তাহলে তাঁকে ঘৃণা করতো এরা। কিন্তু তিনি ছিলেন কুৎসিত, নোংরা। তারা বুঝে উঠতে পারত না, তিনি কি? অফিসার না সাধারণ সৈনিক? কোন সময় মনে হত, তিনি সেনানী। আবার কখনও মনে হত, সাধারণ সৈনিক। আবার সন্ধ্যাবেলা অগ্নিকুণ্ডের কাছে দাঁড়িয়ে থেট্ফোর্ড ঢংএ যখন তিনি বলতেন—'দেশভক্তগণ, আমার কথা শোনো! এসো, সান্ত্বনার কথা শোনো। আমি হলপ করে বলতে পারি, সান্ত্বনার কথা আছে।' সেই সময় তাঁকে কোন কিছু বলেই মনে হত না।

চারিদিক থেকে এসে তারা অগ্নিকুণ্ডের কাছে তাঁকে ঘিরে ধরত। কনুই দিয়ে পরস্পরকে ঠেলা মেরে খানিকটা আত্মপ্রত্যয়ের ভাবে প্রসন্নমুখে বলতঃ টম পেইন! সকলেই অভিবাদন করত।

তখন জনতার মধ্য থেকে একজনকে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা করতেনঃ দেশভক্ত, বলো তোমার নাম কি?

—বার্ক হপার।

—বার্ক হপাব? বেশ! আচ্ছা বলো তো, কেন তুমি এই বাহিনীর হয়ে লড়াই করছো?

—আমি কি ছাই তা জানি নাকি?

—তাহলে আমি বলছি শোনো। যে পতাকা ও প্রতীক তোমাকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করবে, তার জন্য আমি যা বলছি শোনো। মানুষের স্বাধীনতার চাইতে এ দুনিয়ায় মহত্তর কিছুই নেই! কোন আদর্শই স্বাধীনতার আদর্শের চাইতে শ্রেষ্ঠ নয়!

টম পেইন ছাড়া আর কোন লোক যদি একথা বলত, তাহলে তারা হেসে উড়িয়ে দিত। কিম্বা তাকে উত্তম মধ্যম দুচার ঘা লাগাত। এমন কি খুন করেও ফেলতে পারত। কিন্তু টম পেইনের কণ্ঠে একথা শোনাত প্রার্থনার মত, আশীর্বাণীর মত। তাছাড়া তাঁর চোখে আগুন ছিল। তারা যে শহীদ একথা তিনিই তাদের বুঝিয়ে দেন। এই নতুন কথা তাদের অন্তরে প্রচণ্ড বিস্ময় সৃষ্টি কবত। জীর্ণ বাস ও ময়লাব অন্তরালে জাগিয়ে তুলত নতুন প্রেরণা। তাঁর আরও কাছে ঘেঁষে, নাক কুঁচকে, মাঝে মাঝে থুথু ফেলে উৎকর্ণ হয়ে শুনত তাঁর কথা। দাড়ির উপর থেকে লম্বা কোঁকড়ান চুল

সরিয়ে, কনুই দিয়ে পরস্পরকে ঠেলা মেরে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত তাঁর দিকে।

—হক কথাই বলছে।

যখন তিনি জিজ্ঞাসা করতেনঃ আমি কি কুসংস্কারাচ্ছন্ন?

সমস্বরে জবাব আসতঃ না! না!

—আমি কি সালেমের জঘন্য নিষ্ঠাচারীদের মত?

—না! না!

—কোনোদিন কি আমি য়িহুদীদের উপর খৃস্টানদের, কিম্বা ক্যাথলিক-দের উপর প্রোটেস্টাণ্টদের অত্যাচার সমর্থন করেছি?

—না!

—তাহলে শুধু মানুষ হিসাবে আমি তোমাদের বলছি যে ভগবান আছেন। মানুষ ছাড়া অন্য কোন দাবী নিয়েই আমি একথা বলছি নে।

উৎসুক আগ্রহে অপেক্ষা করত সৈনিকেরা। তারা জানত এর পর তিনি কি বলবেন। কেননা ইতিপূর্বে বহুবার বলা হয়েছে সেকথা।

—আমি বলছি সর্বশক্তিমান ভগবান আছেন। কিছুতেই তিনি অত্যা-চারের মুখে তাঁর প্রিয় ভক্তদের ফেলে যাবেন না।

তখন যুক্তিবাদী কেউ বাধা দিয়ে বলতঃ আমায় একটা কথা বলতে দাও টম! দ্যাখো, তোমার কথা অবিশ্বাস কবছি নে। কিন্তু চেয়ে দ্যাখো আমা-দের অবস্থা। কি নোংরা, কত উকুন গায়ে! এ দেখে কি মনে হয়, ভগবান রয়েছেন আমাদের সংগে? আমরা কি জিতছি, না হারছি?

—আমি বলি আমরা জিতছি। গর্জে ওঠেন টম। —আমি বলি, বসুন্ধরা দ্বিধা হয়ে যদি আমাদের সবাইকে গ্রাস করেন তাহলেও আমরা জিতবো। দুনিয়া আমাদের ভুলে যাবে না। শান্তিকামী জাতি আমরা। কিন্তু আমরা অস্ত্র-ধারণ করেছি মানুষের পবিত্র অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। রণক্ষেত্রে যারা জয়-লাভ করে, চুলোয় যাক তাদের কথা! আমাদের জয় এইখানে! শীর্ণ বক্ষ চাপড়ে দেখান টম।

একদিন রাত্রে অস্থিসার হাঁটুর ফাঁকে ছেঁড়া একটা লম্বা ড্রাম নিয়ে, সেটাকে ডেস্ক হিসাবে ব্যবহার করে একমনে খস্‌খস্ করে লিখে যাচ্ছিলেন টম। ড্রামের উপরে যাতে অগ্নিকুণ্ডের আলো পড়ে সেজন্য কাত করে নিয়েছিলেন ড্রামটা। অনুগত একটি সৈনিক পাশে বসে এক হাতে দোয়াত ধরেছিল। আর একটি সৈনিক পালকের কলম সূঁচালো করে দিচ্ছিল। দ্রুত

লিখতে গিয়ে অনেক কলমই নষ্ট করছিলেন। যেখানে বসে তিনি কাজ করেছিলেন, তার চারপাশে সব চুপচাপ। কেননা খবর রটে গেছল যে, টম পেইন লিখতে বসেছেন। সেই গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন দ্রুত লেখনী চালনায় ড্রামের উপর কেবলমাত্র অতি মৃদু অস্ফুট একটি শব্দ হচ্ছিল।

নিবিষ্ট মনে লিখে যাচ্ছেন টম। দু'চারজন করে লোক অগ্নিকুণ্ডের পাশে জমায়েৎ হচ্ছে। ভীড় ক্রমেই বাড়তে লাগল। অবশেষে চোখ তুলে দেখেন, প্রায় একশো জোড়া লাল চোখ একদৃষ্টে চেয়ে আছে তাঁর দিকে। তখন ড্রামের উপর ঝুঁকে তিনি যা লিখেছেন তাই পড়ে শোনালেন। তাঁর চাপাকণ্ঠে যে আহ্বান ধ্বনিত হল সর্ব যুগে তা সত্য : এমনি সময়েই সাচ্চা মানুষ চেনা যায়। সখের সৈনিক এবং নামসর্বস্ব দেশভক্তেরা এমনি সংকট-কালে দেশসেবার জন্য এগিয়ে আসতে ভয় পায়। কিন্তু দুর্যোগ মাথায় করে যারা অকুতোভয়ে এগিয়ে চলে, নরনারীর ভালবাসা ও অভিনন্দন তাদেরই প্রাপ্য। নরকের মত, অত্যাচারকে সহজে বিনাশ করা যায় না। তবু এই সান্ত্বনা আমাদের আছে যে, সংগ্রাম যত কঠোর হবে, জয়লাভের গৌরবও তত বেশী।.. কোন জিনিসের প্রকৃত মূল্য কি, ভগবানই জানেন। কিন্তু স্বাধীনতার মত এমন স্বর্গীয় জিনিস যদি চরম ও পরম মূল্যে না বিকোয় তবে আশ্চর্য হতে হবে বই কি!

এদিকে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে লী'র কাছে পত্রের উপর পত্র লিখছিলেন শিয়াল-শিকারী। চেয়ে পাঠাচ্ছিলেন হাজার খানেক সৈন্য, না হয় কয়েক শ' ইয়াংকি। যদি তাও সম্ভব না হয় তবে, অন্তত জেলেদের রেজিমেন্টটি যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। টম পেইনের উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চারের চেষ্টা সত্ত্বেও প্রতিদিনই দলত্যাগের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। অপর পক্ষে ইংরেজরাও তাড়া করছে দিনরাত। এই উভয়-সংকটের মধ্যে পড়ে তিনি বুঝতে পারলেন যে গ্লোভারের লোকজনের উপর কতটা নির্ভর করেছেন। বুঝতে পারলেন, পালাতে চায় না এমন ছয় সাতশ' লম্বামুখো জেলে আজ যদি থাকত তাহলে মনে কতটা ভরসা পেতেন! আজকাল আর সমর মন্ত্রণা-সভায় কোন কথাবার্তা হয় না। নক্স, গ্রীন, মার্কার আর পুটনামকে নিয়ে বসে প্রতিদিন তিনি একটিমাত্র আদেশনামা জারী করেন: পিছু হটো। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা সনির্বন্ধ অনুরোধও প্রত্যহই জানান—লোকজন গুণতে বলেন। তাতে অন্ততঃ আর কজন রইল তাও তো জানা যাবে!

নয়া-ব্রুনস্‌ভিক্‌ পৌঁছে গোটা দুই পেনসিলভানিয়ার ব্রিগেড্‌ প্রকাশ্যে

বাড়ী ফিরে যাবার অভিপ্রায় ঘোষণা করল। যে কজন অনুগত লোক পাওয়া যায়, তাই নিয়ে ওদের ঘিরে রাখবার আদেশ দেওয়া হল গ্রীনের উপর। নক্সকে হুকুম দিলেন কামানে গ্রেপ্-গোলা সাজাতে। কিন্তু পেনসিলভানিয়ার সৈনিকেরা যদি অস্ত্রত্যাগ করতে অস্বীকার করে তাহলে যে কী করবেন নিজেই জানতেন না। বন্দুকে তাক করে এগিয়ে চল্ল মধ্যদেশীয়রা। আজকের মত এমন বেপরোয়া দৃঢ়তা ইংরেজদের বিরুদ্ধেও দেখায় নি। অসহায়ের মত নক্স ভার্জিনিয়ানের দিকে তাকাল। সেই মুহূর্তে বিপ্লবের ছিন্ন গ্রন্থি আত্মঘাতী রক্তস্রোতে বিলীন হয়ে যেতে পারত : কিন্তু লম্বা আদমী মাথা নেড়ে নিষেধ করলেন। বিনা বাধায় ব্রিগেড্ দুটি ছাউনি ছেড়ে চলে গেল।

এ ব্যাপারটা লম্বা আদমী নীরবে হজম করতে পারলেন না। পরে বৃদ্ধ পুটনামকে কাতর কণ্ঠে বল্লেনঃ আব কি করতে পারতাম আমি?

—জানি না।

—আপনি হলে কি করতেন? গুলী করতেন?

—জানি না। নিজের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারেই মানুষ চলে।

—কিন্তু কোন কিছু দেখবার ক্ষমতা যদি না থাকে?

রীডকে বিশ্বাস করতেন তিনি। তাই তার কাছে মন খুলে বলতে পারতেনঃ তুমি তো জানো জোসেফ, সবনাশের কত কাছাকাছি আমরা এসে পড়েছি। মাথা নেড়ে সায় দিল রীড।

—বার বার লী'র কাছে পত্র লিখেছি আমি। কি করছেন তিনি ভগবানই জানেন। তিনি বিচক্ষণ, রণকুশলী। তবে সমালোচনা আমি করতে চাই না। কিন্তু তিনি আমাদের সাহায্য করবেন না। হয়তো সাহায্য করবার ক্ষমতাও তাঁর নেই।

রীডের মুখে-চোখে সহসা একটা ভয়চকিত অদ্ভুত ভাব দেখা দিল।

হতাশভাবে বল্লেন শিয়াল-শিকারীঃ তুমি বার্লিংটন যাও। তাদের বলো যে লোকজন আমাদের চাই। আরও বোলো, এইবার সব শেষ হয়ে যাবে! সত্যি সত্যিই শেষ হয়ে যাবে সব কিছু। আমার গলায় যার স্পর্শ অনুভব করছি, তাদেরও স্মরণ করিয়ে দিও সেই পরিণতিব কথা।

বার্লিংটনে জার্সি'র আতঙ্কিত আইনসভার বৈঠক চলছিল।

—তাতে কোনো ফল হবে না। রীড আপত্তি জানাল।

—তাহলেও তুমি যাও জোসেফ! আঁকড়ে ধরবার মত ঐটুকু কুটোই রয়েছে আমার হাতের কাছে। আর কিছুই নেই!

রীড চলে যাবার সামান্য কয়েকদিন পরে এড্‌জুটাণ্ট-জেনারেল জোসেফ রীডের শিরোনামা লেখা একখানি পত্র এল লী'র কাছ থেকে। পত্রবাহক প্রধান সেনাপতির হাতেই দিল চিঠিখানি। প্রথমে তিনি ভাবলেন, চিঠিখানা এড্‌-জুটাণ্টের কাছেই ফেরৎ পাঠিয়ে দিই। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, যে-আশার আলো তিনি খুঁজে মরছেন, এই পত্রের মধ্যেই হয়ত তার সন্ধান মিলবে। লী তাঁর নামে কোন পত্র লেখেননি। কিন্তু পত্রালাপের কাজটা রীডই যখন বেশীর ভাগ দেখাশুনা করে, তখন তার কাছে লেখা প্রধান সেনাপতির কাছে লেখার সামিল। খামখানি খুলে তিনি পড়লেন।

"প্রিয় রীড্‌—আপনার সবিনয় প্রশংসামুখর পত্র পেয়েছি। অব্যবস্থিত চিত্ততার মারাত্মক পরিণতির জন্য আমিও আপনার সঙ্গে এক-যোগে দুঃখপ্রকাশ করছি। যুদ্ধের ব্যাপারে এই গুণপনার অভাব মূর্খতা কিবা সাহসিকতার অভাবের চাইতেও ক্ষতিকর। চূড়ান্ত ভ্রান্ত লোকও দুর্ঘটনায় পড়ে ঠিক পথে চলতে পারে। কিন্তু চিরপরাজয় এবং অকৃতকার্যতা অব্যবস্থিচিত্ততার রাহুগ্রস্ত বিশেষ গুণবান ব্যক্তিরও নিত্য সহচর। আমার অধীনস্থ মহাদেশীয় সৈনিকদের ওপারে নিয়ে যাবার জন্য জেনারেল এমনভাবে পীড়াপীড়ি করছেন যে, তাঁর সুপারিশ আদেশ বলেই মনে করা যায়। কিন্তু তাঁর সেই সুপারিশ বা আদেশ কয়েকটি কারণে আমাকে উভয়-সংকটে ফেলেছে. . ।"

প্রধান সেনাপতি পত্রখানি পড়ে যেতে লাগলেন। তাঁর মন সংকীর্ণ অন্ধকার এক গলির মধ্যে হাতড়াতে লাগল। অন্তহীন আলোহীন এ পথ। পত্রখানির সম্বোধনের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি বারবার মনে মনে আওড়াতে লাগলেনঃ প্রিয় রীড! প্রিয় রীড। চার্লস্‌ লী'র সইটা আঙুল দিয়ে চেয়ে ধরলেন।

—আপনার সঙ্গে একযোগে দুঃখপ্রকাশ করছি. । আপনমনে অস্ফুট-কণ্ঠে বললেন।

প্রায় সর্বশক্তি জড়ো করে গা ঝাঁকানি দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর তাঁবুর নোংরা পর্দার আড়ালে হতাশভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। মনে হল, দুনিয়ার সব কিছুর ভিৎ টলছে। দৃঢ় ভিত্তির উপর আবার সব-

কিছু ঠিকঠাক করে সাজাতে চাইলেন। রীড তাঁর বন্ধু, তাঁর সঙ্গী, তাঁর এড্‌জুটাণ্ট। আর লী তাঁর কংগ্রেসের সেবক। না, পত্রখানি ডাহা মিথ্যা। বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্য প্রণোদিত জালিয়াতি। কার্যোপলক্ষে রীড যখন বার্লিংটন চলে গেছে, সেই সুযোগে কার্যসিদ্ধির আশায় পত্রখানি তাঁর হাতে পেঁৗছে দেওয়া হয়েছে।

—ডাহা মিথ্যা! চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। সহসা তাঁর চেঁচানি শুনে তাঁবুর মধ্যে উঁকি মারল শাস্ত্রী।

—কিছু বললেন স্যর?

—না, কিছু না!

চোখে চশমা পরে প্রতিটি শব্দ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দ্বিতীয়বার তিনি পত্রখানি পড়লেন। তাঁর হাত তখন কাঁপছিল। না, লী'র হিজিবিজি হাতের লেখা নকল করা যায় না। নিজের হস্তাক্ষরের মতই তিনি চেনেন তাঁর হাতের লেখা। রীডের একখানি 'সবিনয় প্রশংসামুখর' পত্রের জবাবে লেখা হয়েছে এই চিঠি। তাঁর সৈন্যবাহিনী খান খান হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেনানীরাও তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করেছে! অথচ এদের তিনি ভালবাসতেন, বিশ্বাস করতেন! কিন্তু এখন আর কাকে বিশ্বাস করা যায়? গ্রীনকে? গ্রীন তাঁর জন্য মরতেও প্রস্তুত। কিন্তু সে কথা তো রীড সম্পর্কেও বলা যেত। মিফ-লিনকে? কিন্তু কেন সে অত ব্যগ্র হয়ে ফিলাডেলফিয়া চলে গেল? মার্কারের কটা মুখোশের অন্তরালে কি লুকান আছে কে জানে? নক্সকে বিশ্বাস করতে পারেন? পুটনামকে?

—হায় ভগবান! আর্তকণ্ঠে ফিসফিস করে বললেন।

তাঁবুর সঙ্কীর্ণ স্থানটুকুতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি পায়চারি করতে লাগলেন। রাতের খাবার প্রস্তুত করে কালো খানসামাটি যখন জিজ্ঞাসা করল, খেতে যাবেন কি না, বিমূঢ়ভাবে একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে ঘাড় নাড়লেন। কিন্তু নক্স যে সংবাদটি পাঠিয়েছে, তা না শুনে একটানা পায়-চারি করে চল্লেন। মাঝে মাঝে অস্থিসার কাঁধ দিয়ে দেয়ালে ঘসা দিচ্ছিলেন। মুক্তির কোন আশাই নেই—নেই কোন সমাধান। শুধু আছে একটিমাত্র পথের নিশানা। সে নিশানাও সুনির্দিষ্ট অপরিবর্তনীয়। তাঁর জীবনপথে সে আলোকবর্তিকা চিরঅচঞ্চল। অনেকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে তিনি শ্রান্ত হয়ে পড়লেন। নিজের নিঃসঙ্গতার কথা মনে হয়ে কেমন একটু ভয়ভয় করতে লাগল। কিন্তু খানিক বাদেই আবার আত্মস্থ হলেন। আবার পায়ের

তলায় মাটি অনুভব করলেন। তিনি জানতেন, শেষ পরিণতি যাই হোক, পথের শেষে না পৌঁছান অবধি তাঁর পায়ের তলার মাটি কোনকালেই সরে যাবে না।

স্থির হয়ে বসে তিনি রীডকে লিখলেনঃ

'সঙ্গের পত্রখানি হোয়াইট প্লেইনসের এক পত্রবাহক আমার হাতে দিয়েছিল। এখানি যে ব্যক্তিগত পত্র তা বুঝতে না পেরে এবং পত্রালাপের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না থাকায়, পত্রখানি আমি খুলেছিলাম। তোমার অফিসের করণীয় কাজ সম্পর্কে যে ধারণা আমি পোষণ করি এবং ঐ বিষয়ে যা আমি দেখেছি তদনুসারে পিকস্ হিল এবং ঐ স্থান থেকে তোমার কাছে লেখা অন্যান্য সমস্ত চিঠিপত্র যেমন আমি খুলে থাকি, এ পত্রখানিও সেইভাবেই খুলেছিলাম। পত্রখোলা সম্পর্কে এইটুকুই আমার সাফাই এবং সে সাফাই অকপট সত্য। না হলে, এই জাতীয় পত্র পড়বার আগ্রহ বা অভিপ্রায় আমার আদৌ নেই। বার্লিংটন যেতে যে শ্রম ও কষ্ট তোমাকে সহ্য করতে হয়েছে, তার জন্য শত ধন্যবাদ। ঐকান্তিকভাবে কামনা করি, তোমার শ্রম ঈপ্সিত ফললাভ করুক। শ্রীমতী রীডকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিও।' ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
জর্জ ওয়াশিংটন।

জেনারেল লী'র ভাগ্যবিপর্যয়

চার্লস লীকে যারা চিনত বা ভাল বাসত, তারা বলত যে রাজা হয়েই তাঁর জন্ম নেওয়া উচিত ছিল। বস্তুত তাঁর বিটকেল চেহারা এবং সদাবিষণ্ণ ভাবের মধ্যে রাজকীয় এবং দানবীয় উভয় লক্ষণই ছিল। শিয়াল-শিকারীর মত ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি তিনি খেলেননি। যতদূর স্মরণ পড়ে, ভাগ্যদেবী তাঁর অন্তরেই ছিলেন এবং বরাবরই সে সম্পর্কে বিশেষ সচেতন ছিলেন তিনি। তবু ভাগ্যদেবী বরাবর তাঁকে ফাঁকি দিয়েছেন। কিন্তু আজ জীবনে এই সর্বপ্রথম ভাগ্যদেবী তাঁর কাঁধে ভর করেছেন।

ভাগ্যদেবীকে কাঁধের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর তিনি। আমেরিকার বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত উপনিবেশসমূহে, তার ত্রিশ লক্ষ লোকের মধ্যে কি বিরাট ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ঘুমিয়ে রয়েছে তা তিনি ভালভাবেই জানতেন এবং এই সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হয়েছিলেন যে, সেই জড়শক্তিকে সঞ্জীবিত করবার, সে বিস্ফোরকে আগুন জ্বালিয়ে তুলবার যোগ্যতম ব্যক্তি একমাত্র তিনি। বৃটিশদের বিতাড়িত করবার যোগ্যতা তাঁর আছে কিনা, তা নিয়ে কোনকালেই মাথা ঘামাতেন না। সে পরের কথা। সৈন্যবাহিনী তাঁর হাতে রয়েছে; এখন সর্বময় কর্তৃত্ব পেলেই হয়।

ঢের ঢের বিলম্ব করা হয়েছে, কিন্তু এখন আর অপেক্ষা করা সমীচীন নয় মনে করে, চৌঠা ডিসেম্বর মার্বলহেডের জেলেদের সাহায্যে তিনি সসৈন্যে হাডসন নদী পার হলেন। জার্সিতে বৃটিশ বাহিনী ছিল তাঁর ফৌজ এবং শিয়াল-শিকারীর লোকজনের মাঝখানে। বলা বাহুল্য, সাজসজ্জা ও সংগ্রামশক্তির দিক থেকে তাঁর ফৌজ সব চাইতে শক্তিশালী। আর এও জানা কথা যে, বৃটিশরা তাঁর দিকে নজর না দিয়ে শিয়াল-শিকারীর ফৌজ নির্মূল করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। এসব তিনি আগে থেকেই ভেবে রেখেছেন। কাজেই নিজের চালে মনে মনে এত খুশী হলেন যে, কুকুরের পাল-সহ নদী পার হবার সময় তাঁর বিরস মুখেও হাসিরেখা ফুটে উঠল। খুশীর

আনন্দে চিৎ হয়ে শুয়ে তিনি কুকুরগুলোকে আদর করতে লাগলেন, আর তাদের ঘেউ ঘেউ চীৎকারে নদীবক্ষ সচকিত হয়ে উঠল।

সংসারে আর কিছু ভাল না বাসলেও চার্লস লী প্রাণাধিক ভালবাসতেন তাঁব কুকুরগুলোকে। মানুষ যেমন সযত্ন সতর্কতায় নিজের সন্তানকে ধরে ধরে নৌকায় তোলে লী'ও ঠিক তেমনিভাবে এক একটি করে কুকুর খেয়া-নৌকায় চড়ালেন। জার্সির পাড়ে এক একটি করে কুকুর কোলে কবে ডাঙায় তুলে দিলেন। জেনারেল সুলিভানের নেতৃত্বে সৈন্যদল ধীর মন্থরে এগুতে শুরু করল। ব্রুকলিনে বন্দী হবার পব বন্দী বিনিময়ের মারফতে সুলিভান সম্প্রতি ফিরে এসেছে। পদমর্যাদায় তার স্থান লী'র নীচে। কিন্তু কুকুর-গুলোকে না খাইয়ে লী এক পাও নড়তে রাজী হলেন না। মাংস নিয়ে আসবার পর প্রতিটি টুকরা তিনি সযত্নে পরীক্ষা করে দেখলেন। রাগ করে কয়েকটা টুকরা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। যে পর্যন্ত পছন্দমত মাংস না এল, সে অবধি গলামন্দ চেঁচামেচি করে সবাইকে অস্থির কবে তুললেন।

সপ্তাহ দুয়েক পূর্বে ভার্জিনিয়ান যে পথে গেছেন, জার্সিব নদীতীর ছেড়ে এরাও এগুতে লাগল সেই পথে। কিন্তু লী এমন শম্বুক গতিতে এগুতে লাগলেন যে, নয়া-ইংলণ্ডেব ইয়াংকিরাও তাঁর মন্থর অগ্রগমনে আপত্তি না জানিয়ে পারল না। কচিৎ কদাচিৎ তারা সারাদিনে দশ মাইল পথ মার্চ করেছে। কোন কোন দিন পাঁচ ছয় মাইল পথ এগিয়েই থামা হত। আবার কখনও দিনের পর দিন এক জায়গায় বসে থাকত। কাজের মধ্যে খাওয়া আর ঘুমোন। সুলিভানের মনে হত যে প্রধান সেনাপতিব ফৌজের অবস্থা হয়ত ভাল নয়। এই শঙ্কাব ফলে সে অস্বস্তি বোধ কবতে লাগল। কিন্তু লী'র চিঠি বা নথিপত্র তাকে দেখতে দেওয়া হত না বলে তার শঙ্কার সংগত কারণ আছে কিনা ঠিক বুঝে উঠতে পাবত না। নিউ জার্সি এবং পেন-সিলভানিয়ার লোকজনের ভাগ্যে যে কি ঘটেছে, সাধারণ ইয়াংকি সৈনিকদের সে সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণাই ছিল না। যতটুকু যা শুনেছে তা থেকে এই ধারণাই হয়েছে যে, বসুন্ধরা হয়ত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে তাদের গিলে ফেলেছে। তাদের নিজেদের কথা বলতে গেলে, বেশ ধীরেসুস্থে নির্বিবাদে এগিয়ে চলেছে তারা। চটপট এগুবার মত বিশেষ আগ্রহও ছিল না। কেননা ব্রুকলিন ও নিউইয়র্কের বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতার স্মৃতি তখনও তারা ভুলতে পারেনি।

বাহ্যত, সংগ্রামের সমস্ত পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য বানচাল হয়ে গেছে।

শীত জমাট হবার সঙ্গে সঙ্গেই নয়া-ইংলণ্ডের সৈনিকদের দলত্যাগের হিড়িক বেড়ে চল্ল। সপ্তাহখানেক মার্চ করে লী এবং তাঁর বাহিনী মরিশ টাউনে পৌঁছুল। কিন্তু হোয়াইট প্লেইনস্ থেকে এখানে আসবার মধ্যেই দলত্যাগের ফলে লী এক সহস্র সৈনিক হারিয়েছেন। এখন তিনি বৃটিশ বাহিনীর পশ্চাদভাগের কাছাকাছি এসে পড়েছেন। শম্বুক অগ্রগতি তাই আরও মন্থর করা হল। বারোই ডিসেম্বর মরিশটাউন ত্যাগ করে লী আট মাইল দূরে ভিলটাউনে ছাউনি ফেললেন। ক্রমাগত সানুনয় পত্র আসছে দীর্ঘ ভার্জিনিয়ানের কাছ থেকে। প্রতি নতুন পত্রেই তাঁর শোচনীয় অবস্থা শোচনীয়তর হবার আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। বড় জোর আর সাতদিন টিকবে, মনে মনে হিসাব করলেন লী। তারপর নতুন মহাদেশীয় বাহিনী পাবে নতুন প্রধান সেনাপতি!

একঘেয়ে ক্যাম্পজীবনে লী হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। এই হাঁদা সৈন্যের সহবৎ, একটানা সাতদিন মার্চ করবার একঘেয়েমি, কোথায় চলেছি, কেন যাচ্ছি ইত্যাদি সম্পর্কে স্টাফ অফিসারদের গতানুগতিক জিজ্ঞাসাবাদ তাঁকে ত্যক্ত-বিরক্ত করে তুলেছিল। জেলেদের নেতা গ্লোভার লীকে দেখতে পারত না। সুযোগমত কথাটা বুঝিয়ে দিতেও সে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করত না। লী যদি তাকে ধমকাতেন, সেও পালটা জবাব দিত। লী গালাগাল করলে মুখের মত জবাব দিতেও গ্লোভার কসুর করত না। তবু আপাতত কিছু করবার অভিপ্রায় লী'র ছিল না। প্রধান সৈনাপত্য আগে পাওয়া যাক, শৃংখলা কাকে বলে তার পর দেখিয়ে দেওয়া যাবে।

কিন্তু এখন সব কিছুর উপর বিরক্ত হয়ে আছেন তিনি। ভিলটাউনে সৈন্যদল ছাউনি ফেলবার পর ক্যাপ্টেন গানারসন তাঁকে শুঁড়িখানার খোঁজ দিল। লী'র মেজাজের যে অবস্থা ছিল, তাতে তিনিও সহজেই রাজী হয়ে গেলেন।

—কত দূরে হবে? লী জিজ্ঞাসা করলেন।

—মাইল তিনেক। জায়গাটা ভালো।

মন্দ কি? মনে মনে ভাবলেন লী। মাঝে মাঝে খানিকটা আরাম না করলে মেজাজ বিগড়ে যেতে পারে।

—মেয়েটি সুন্দরী তো? লী জিজ্ঞাসা করলেন।

—তেমন না। রঙটা একটু ময়লা। হাতের ভঙ্গীতে গানারসন বুঝিয়ে

দিলে যে মেয়েটি বেশ নাদুস্‌নুদুস। লী'র মনে লালসার মদির রস উপচে উঠল।

—মেয়েটির নাম আন্না। গানারসন বল্লে।

লী বল্লেনঃ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন কোনো লোক আমার সঙ্গে থাকলে তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কথাটা বোধকরি বুঝতে পারো ক্যাপ্টেন।

—আমি আমার বিচারবুদ্ধির গরব করি স্যর!

—ভালোই। নিজের পর সে আস্থা হারিও না।

দু' একদিন বাদে কি বড়জোর হপ্তাখানেক পরে যিনি একটা জাতির নেতা হতে চলেছেন, সেই কৃশকায় কুশ্রী সদাবিষণ্ণ লোকটির দিকে চেয়ে ঘাড় নাড়ল ক্যাপ্টেন। কিন্তু কোন আকর্ষণ বা বিরক্তিই অনুভব করল না। মনে মনে ভাবল, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে লী'র প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে মোটা বকশিশ পেলেই বেশী খুশী হতাম।

আলাদা একটা তাঁবুতে লী'র কুকুর থাকত। লী তাবুতে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাউ মাউ বন্ধ হয়ে গেল। তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্য কুকুরগুলো লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে তার গায়ে চড়ে বসল। কুকুরগুলো যাতে মুখ চাটতে পারে সে জন্য লী হাটু ভেঙে বসলেন। স্নেহ মমতায় তখন তাঁর মধ্যে একটা মেয়েলী ভাব ফুটে উঠল।

—বাচ্চু, বাচ্চু বাচ্চু! আদর করে ডাকলেন লী।

হাতের উপর লাফিয়ে উঠে কুকুরগুলো তাঁর মুখ হাত চাটতে লাগল।

—থাম বাচ্চু, থাম! শুয়ে পড়। আদুরে সুরে আবার বল্লেন তিনি।

কুকুরগুলো হুড়োহুড়ি বন্ধ করে অমনিই শুয়ে পড়ল। তখন পকেট থেকে মিঠাই বার করে এক এক করে কুকুরগুলোকে ভাগ করে দিলেন। প্রভুর এই অনুগ্রহের প্রতিদানে প্রত্যেকটি কুকুর একবার করে তাঁর মুখ চেটে দিল।

—আবার কাল দেখা হবে বাচ্চু! তিনি বল্লেন।

কুকুরগুলো বুঝতে পারল, তিনি চলে যাচ্ছেন। চুপ করে শুয়ে বড় বড় ঢলটলে চোখ পাকিয়ে তারা লী'র দিকে চেয়ে রইল।

—কাল, কেমন?

শুঁড়িখানা মাইল তিনেক দূরে। বাস্কিং ব্রিজে। ছয়জন দেহরক্ষী নিয়ে লী ঘোড়ায় চড়ে শুঁড়িখানার দিকে রওনা হলেন। প্রহরী নিয়ে যাবার ইচ্ছে

ছিল না। দেহরক্ষী ছাড়া কোন জেনারেল কোথাও গেলে বেমানান দেখায় বলে এদের সঙ্গে নিলেন।

শুঁড়িখানায় পৌঁছে কেতাদুরস্তভাবে অভিবাদন করে আত্মপরিচয় দিলেন লী ঃ মহাদেশীয় বাহিনীর মেজর-জেনারেল চার্লস লী। সেখানে তখন সামান্য জনকয়েক জার্সির গেঁয়ো লোক ছিল। আগন্তুকের পরিচয় শুনে তারা তো অবাক।

দেহরক্ষীরাও তাঁর পেছু পেছু একগাল হেসে, আনাড়ীর মত বন্দুক উঁচিয়ে ভারিক্কি চালে সরাইখানায় প্রবেশ করল। ভাবসাবে তারাও দেখাতে চায় যে তারাও কেউকেটা লোক। গেঁয়ো লোককটি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে আনাড়ীর মত প্রত্যভিবাদন জানাল এবং এক পা দু পা করে পাশের কামরায় ঢুকে পড়ল। বেঁটেখাটো সরাইর মালিক হন্তদন্ত হয়ে রান্নাঘর থেকে ছুটে এল। অভিবাদন জানিয়ে সে হাত কচলাতে লাগল এবং জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে লাগল।

—আমি দেশভক্ত স্যর। আজ আপনি সাচ্চা এক দেশভক্তের গৃহেই পদার্পণ করেছেন।

বারের পেছনে মেয়েটিকে দেখে লীর মুখে হাসি ফুটল। গানারসনের মুখে ওর কথা শুনেই না এতদূর আসা।

—এই দীনের কুটিরে আপনাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি, ইওর এক্সেলেন্সী।

—ঠিক আছে। আমি ডিনার এবং বিছানা চাই। পালকের বিছানা, বুঝলে?

—আলবত, ইওর এক্সেলেন্সী।

—আমার লোকজন থাকবার জায়গা হবে?

—আমার গাড়ি রাখার ঘরে থাকবে। বেশ আঁটসাট শুকনো গরম ঘর। আজ আমি ধন্য, ইওর এক্সেলেন্সী। আজ বাইশ বছর এই ভদ্র সরাইখানা চালাচ্ছি, কিন্তু এমন সৌভাগ্য কোনদিনই হয়নি। আজ আমি সত্যই সম্মানিত।

—তা বটে! মাথা নেড়ে মহানুভবতার ভাব দেখিয়ে বল্লেন লী।

—আমাদের খাবার সাদামাঠা। কিন্তু রান্না চমৎকার। দেখবেন, আমাদের খাবার আপনার খারাপ লাগবে না।

কোট খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লী আগুনের চুল্লীর কাছে একখানা চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন।

—এক বোতল মদ নিয়ে এসো।

—কি আনবো? ক্লারেট, বারগাণ্ডি, ম্যাদেরা, না পোর্ট?

লী ক্লারেটই পছন্দ করলেন। বেশ আরামেই আছেন। আদর আপ্যায়নে কোন ত্রুটি হচ্ছে না। মানীলোকের সম্মানই পাচ্ছেন। মেয়েটি মদ নিয়ে এল। যখন সে চেয়ার এবং চুল্লীর মাঝখানে দাঁড়াল, ঘরের আর কোন জায়গা থেকে তাকে দেখা যাচ্ছিল না। আলতোভাবে লী তার উরুতে হাত বুলিয়ে দিলেন। বড় বড় কালো চোখ পাকিয়ে মেয়েটি এমনভাবে খিলখিল করে ছিনাল হাসি হেসে উঠল যে আর একটু হলেই হাতের ট্রে পড়ে যেত।

—যাঃ, কি কচ্ছেন ইওর এক্সেলেন্সী।

—মদ ঢালো সুন্দরী, মদ ঢালো। লী বল্লেন।

নীচু হয়ে মেয়েটি যখন মদ ঢালছিল সেই সুযোগে লী আবারও তার গায়ে হাত চালালেন। মসৃন সুডৌল উষ্ণ দেহের স্পর্শে উদগ্র কামনায় তাঁর সারা গা শিরশিরিয়ে উঠল।

দুই বোতল মদ শেষ করে লী নৈশভোজনে বসলেন। তখন তিনি, মালিক আর মেয়েটি ছাড়া সরাইখানায় কোন লোক ছিল না। মেয়েটি মালিকের কন্যা কি ঝি, লী জানতেন না। সে যাই হোক, মালিক মেয়েটিকে লী'র দিকেই এগিয়ে দিচ্ছিল। মেয়েটিই নৈশখাবার পরিবেশন করল এবং লী'র খাবার সময় টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। মানী অতিথির ভোজনের জন্য গোটা একটা রোস্ট করা মোরগ, মাংসের পাই, পুডিং এবং তার সঙ্গে এক বোতল বাবগাণ্ডি আব মাটিব একটা জগ-ভরতি ঘবে-তৈরী পিচ্ ব্রাণ্ডির আয়োজন করা হয়েছিল।

আজকের মত এমন আয়াস, এমন দিলদরিয়া ভাব, দুনিয়া সম্পর্কে এমন নিরাসক্তি লী বহু মাসের মধ্যে অনুভব করেননি। মেয়েদের সঙ্গে ভাব করতে গিয়ে কোনকালেই তিনি জুৎ করে উঠতে পারেননি। তবু যতটা প্রেমের অভিনয় করেছেন, তা থেকে বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে অভিনয় না করেই মেয়েটিকে আজ তিনি পাবেন। যখন তাকে পাশে বসতে বল্লেন, ছিনাল হাসি হেসে মেয়েটি আপত্তি জানাল। কিন্তু নাদুসনদুস আদুরে বিড়ালছানার মত সোহাগভরা কণ্ঠে অস্ফুট ধ্বনি করে সঙ্গে সঙ্গে লী'র দিকে ঝুঁকে পেছন থেকে তাঁর কাঁধের উপর পরিস্ফীত স্তনযুগ ঘষতে লাগল।

বেশ পেট ভরে খাওয়া হল। খাবার টেবিল ছেড়ে যখন তিনি অগ্নিকুণ্ডের

কাছে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন, ওয়েস্ট কোটটা পেটে বেশ আঁট-আঁট লাগল। মেয়েটি তাঁর জন্য রাম দিয়ে ফ্লিপ তৈরী করছিল। লাল টকটকে তাতান লৌহশলাকাটা যখন সে কলসীর মধ্যে সেঁধিয়ে দিল, ভূরিভোজনে পরিতুষ্ট লী আরামে হাই তুললেন। যখন তিনি রসিয়ে মগে চুমুক দিচ্ছিলেন, মেয়েটি সযত্নে তাঁর বুট খুলে পা দুখানি একটা পা রাখবার টুলের উপর রেখে দিল। এতক্ষণে লী'র চোখে মেয়েটির হাবভাবের নির্লজ্জ অশ্লীলতা যেন উবে গেল। মনে হল, সে সুরুচিসম্পন্না, তন্বী, রূপসী—এককথায়, লী'র স্বপ্ন-সম্ভবা। চুল ধরে আদর করবার সময় সোহাগভরে খিলখিল করে হাসছিল মেয়েটি। সে হাসি সংগীতের ঝঙ্কার বলে মনে হল।

—আঃ প্রেয়সী, সত্যিই তুমি খুব আদর যত্ন করছো আমার।

—তা এমন আর কি? রোজ তো আর জেনারেল পাওয়া যায় না! মুচকি হেসে বলে মেয়েটি।

—আবার সেবাযত্ন করবার জন্য জেনারেলদেরও রোজ রাজকন্যে জোটে না, বুঝলে সুন্দরী!

—থামলেন কেন? খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটি।

—জেনারেলদের জীবন আরামের ফুলশয্যাও নয়, কিম্বা গৌরবের রাজ-পথও নয়।

মেয়েটি খিলখিল করে হেসেই চল্ল।

—তাকে বিরাট সৈন্য বাহিনীর বোঝা এবং একটা জাতির ভাগ্যের গুরু দায়িত্ব বহন করতে হয়।

—একবার একজন বৃটিশ কর্নেল দেখেছিলাম আমি। মেয়েটি বল্লে।

—আমাদের দুশমন। যথোচিত সম্মানে যেমন তাদের আপ্যায়ন করতে হবে, তেমনি কঠোর ভাবে ধ্বংস করতে হবে তাদের।

—সাদা ব্রিচেজ এবং লাল কোট পরা ছিলো তার। লোকটা দেখতে বেশ। ভুরু কুঁচকে খানিকটা ভেবে আবার বল্লে মেয়েটিঃ তার মাথায় পরচুলা ছিলো।

—আর আমার সেনাবাহিনী ছিন্নবাস পরে লড়াই করে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বল্লেন লী।

—দারুণ বদমায়েস লোকগুলো। গোলাঘরে শোবার জায়গা দেখিয়ে দেবার সময় ছজন সৈনিক থাবা মেরে কিভাবে তাকে জাপটে ধরেছিল, সেই কথা মনে পড়ে খোলাখুলি বল্লে মেয়েটি।

তিন মগ হ্লিপ শেষ করে লী বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। জীবনের সমস্ত দুঃখ, সমস্ত দৈন্য, সংযমের বাঁধন ছিড়ে তাঁকে উদব্যস্ত করে তুল্ল। আপন মনে বলে যেতে লাগলেনঃ গৌরবের পথ একলা চলার পথ। হতভাগ্য আমি। নিঃসঙ্গ আমি। আমি কুৎসিত! পোষা কুকুরগুলো ছাড়া কোন বন্ধু নেই আমার। কিন্তু আমি হলপ করে বলতে পারি, মানুষের চেয়ে তারা অনেক ভালো। তারা আমার সন্তানের মত। আমাকে ভালোবাসে, বিশ্বাস করে। আমার উর্দির বোতামগুলো চকচক করছে বলে তুমি খ্যাতির কথা ভাবছো সুন্দরী! কিন্তু বড় হতভাগ্য, জীবনে বড় নিঃসঙ্গ আমি। আমার কোন সংসার নেই, মাথা গুঁজবার কোন ঠাঁই নেই, বিদায় সম্ভাষণ জানাবার জন্য কোন প্রিয়ভাষিণী স্ত্রী নেই—বাবা বলে ডাকবে এমন কোন সন্তানও নেই। না, না, না, সৈন্যশিবিরের কেৎলিই আমার সব কিছু। যতদিন মাটিতে শির লুটিয়ে না পড়ে, জানোয়ারের মত ততদিন আরও কতগুলো জানোয়ারের সঙ্গে ঐ তাঁবুর মধ্যেই আমাকে পড়ে থাকতে হবে . . ।

নেশার ঘোরে তাঁর ভাঙ্গা গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল, চাপা কান্নায় অধর ঝুলে পড়ল। বার বার তিনি মাথাটা এপাশ-ওপাশ করতে লাগলেন।

—শোবেন চলুন। মেয়েটি হেসে বল্লে।

—আজাদী ফৌজের নতুন প্রধান সেনাপতির শয্যাসঙ্গিনী হবে এক বার-বনিতা! বিড়বিড় কবে বল্লে মেয়েটি।

হাত ধরে তাঁকে উপরতলায় নিয়ে যাবার সময়েও হাসছিল মেয়েটি।

ভোর চারটের সময় দরজায় দুমদাম শব্দ শুনে তাঁর ঘুম ভাঙল। ঘরটি অন্ধকার। যন্ত্রণায় মাথাটা দপদপ করছে। মুখ থেকে আসছে বিশ্রী একটা চামসে গন্ধ।

—কে? জড়িতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

দবজায় তখনও দুমদাম শব্দ চলছে।

—কে?

—মেজর উইলকিনসন।

—মেজর উইলকিনসন আবার কে?

—জেনারেল গেটসের কাছ থেকে এসেছি স্যর!

—কে?

—জেনারেল গেটস।

—জাহান্নমে যাও। চুলোয় যাক সব। কাল সকালে দেখা যাবে।

—ব্যাপারটা জরুরী স্যর!

একটু নড়াচড়া করতেই লী টের পেলেন যে পাশে এক কোমলাঙ্গী শুয়ে আছে। অগুণতি পানপাত্রের নেশায় রাত্রির কাহিনী কুহেলিকাচ্ছন্ন হয়ে আছে—কিছুই মনে করতে পারছেন না। লেপের তলা থেকে টেনে বার করে তিনি অন্ধকারের মধ্যেই মেয়েটির মুখ দেখবার চেষ্টা করলেন। ভয় পেয়ে মেয়েটি বিমূঢ় বিড়ালছানার মত মিহিসুরে কঁকিয়ে কেঁদে উঠল।

—কে তুই খান্‌কি মাগী! ধমকে জিজ্ঞাসা করলেন।

—আমি আন্না।

—কে?

ভয়চকিত জড়িতকণ্ঠে বাঁধবাঁধভাবে সে রাত্রির সমস্ত ঘটনা বল্লে। কিন্তু তিনি খেঁকিয়ে উঠলেনঃ জাহান্নামে যা খান্‌কি কোথাকার! বেরো এখান থেকে!

ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে সে দরজার দিকে পা বাড়াতেই, অন্ধকারের মধ্যে তাকে টেনে ধরে চাপাগলায় লী বল্লেনঃ ওদিকে না, বিছানার তলায়!

—কোথায়?

—ম'লো যা, বিছানার তলায় যা!

ডুকরে কেঁদে মেয়েটি হামাগুড়ি দিয়ে বিছানার তলায় ঢুকল। তখন লী দরজা খুললেন। উইলকিনসন নামে লোকটি এবং সরাইর মালিক দরজার সামনেই দাঁড়ান ছিল। নাইটশার্ট পরা মালিকটি কম্পিত হস্তে একখানা মোমবাতি ধরে ছিল। উনিশ বছরের নাবালক উইলকিনসন। ইতি-পূর্বে সরাইর মালিককে খুঁচিয়ে সমস্ত খবরাখবরই সে জেনে নিয়েছে; তবু তার চোখে কৃত্রিম হাসি ছিল।

—কি সংবাদ?

—চিঠিখানা দেখুন স্যর! পত্রখানি লী'র দিকে বাড়িয়ে দিয়ে উইল-কিনসন বল্লে।

—ব্যাপার কি বলো না, কে পাঠিয়েছে তোমাকে?

—জেনারেল গেটস। চার রেজিমেণ্ট সৈন্য নিয়ে তিনি ওয়ালপেক এসেছেন।

—তোমার কি মাথা খারাপ নাকি? এখান থেকে একশো মাইলের মধ্যেও

তাকে পাবে না। চিঠিখানা হাতে নিয়ে তিনি মোমবাতির নীচে ধরলেন।
—এতো ওয়াশিংটনকে লেখা।

—মাফ করবেন স্যর! বিষণ্ণতার ভাণ করে বল্লে উইলকিনসন।—জেনারেল ওয়াশিংটন কোথায় আছেন জানি না। জেনারেল গেটসও জানেন না। এই অভিশপ্ত দেশের কেউই হয়তো সে খবর জানে না। ওয়াশিংটন বিপদে পড়েছেন শুনতে পেয়ে শয়েলার চার রেজিমেণ্ট সৈন্যসহ গেটসকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু জেনারেল তাঁর কোন খোঁজই পেলেন না। আমিও পেলাম না। সারারাত ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়িয়েছি স্যর। এমন জমে গেছি যে এখন আর নড়বার সাধ্য নেই।

—ঠিক আছে। পত্রখানি খুলে লী বল্লেন—ঠিক আছে, এখন যাও। কোথাও একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়োগে।

টলতে টলতে বিছানায় এসে মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়বার পরে কয়েকটা করুণ কঁকানি না শোনা পর্যন্ত মেয়েটির কথা লীর মনে পড়েনি।

—বেরিয়ে এসো। লী বল্লেন। ফিরে আসবার সময় মালিকের হাত থেকে মোমবাতিখানা নিয়ে এসেছিলেন। সেই আলোয় এবার মেয়েটির ফুলোফুলো মুখ, লাল চোখ এবং কোমর অবধি পাকানো চুল দেখতে পেলেন।

—কে তুই?

—আমি আন্না! ডুকরে কেঁদে বল্লে মেয়েটি।

চোখ রগড়ে তিনি একটা ঢোক গিললেন। এতক্ষণে রাত্রিবেলার কাণ্ড-কারখানার খানিকটা খানিকটা মনে পড়তে লাগল। কাতর কণ্ঠে বল্লেনঃ আমায় খানিকটা রাম্ এনে দিতে পারো?

সাগ্রহে ঘাড় নাড়ল মেয়েটি।

—বেশ, তাহলে নিয়ে এসো!

এক মগ মদ নিয়ে মেয়েটি ফিরে এল। ঢকঢক করে তিনি সবটা গিলে ফেললেন। গলার কাছে গিয়ে এমন জ্বলে উঠল যে দম বন্ধ হবার উপক্রম হল। কিন্তু পেটে পড়ায় কতকটা সুস্থ বোধ করলেন।

শুধু অতি মিহি একটা সেমিজ পরে মেয়েটি বসেছিল বিছানার উপর। লী'র পায়ের কাছে। অবাক বিস্ময়ে দেখছিল লোকটার ভাবসাব।

—জেনারেল লী! মেয়েটি ডাকল।

—বলো।

তলপেটে হাত বুলাতে বুলাতে মুখ ভেঙচে খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটি।

—বেরিয়ে যা! জড়িতকণ্ঠে ধমকে উঠলেন লী।

খিলখিল করে হাসতে হাসতে দরজার দিকে এগুল মেয়েটি। যাবার আগে ঘাড় ফিরিয়ে আড়চোখে তাকাল বিছানার দিকে। মোড় ফিরে বালিশে মুখ চেপে পড়ে রইলেন লী।

মোমবাতিখানা পুড়ে শেষ হয়ে গেল। লী যখন বিছানার পর উঠে বসলেন, ঊষার পাণ্ডুর ছটা নোংরা ছোট জানালা দিয়ে চুইয়ে ঢুকছে ঘরের মধ্যে। একদৃষ্টে সামনে চেয়েছিলেন লী। এমন মাথা ধরেছে, অম্বলে পেট এত গুলোচ্ছে যে কিছুই ভাল লাগছে না। নিজের উপরই বিরক্ত লাগছে। রাগ হচ্ছে। থেকে থেকে ওয়াক্ দিচ্ছিলেন। লম্বা গোলমত বালিশের উপর তাঁর প্রসারিত হাত দুখানা হলদেটে দেখাচ্ছিল। বেলা আটটা বাজবার পূর্বে বিছানা ছেড়ে উঠবার কোন আগ্রহই বোধ করলেন না। তেমন শক্তিও ছিল না। তারপর পা দিয়ে খুঁজে চটিতে পা ভরে টলতে টলতে ঝুলান কোটটা আনতে গেলেন। নাইটশার্টের উপরেই কোনমতে কোটটা চড়িয়ে নিলেন এবং হাতমুখ না ধুয়ে নীচের তলায় চলে এলেন।

আগুনের চুল্লীর কাছে দাঁড়িয়ে উইলকিনসন অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্য; সঙ্গে সঙ্গে গা হাত পা সেঁকে নিচ্ছিল। লীকে আসতে দেখে স্মিতমুখে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল উইলকিনসন। কিন্তু নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না।

—হাঁ করে চেয়ে দেখছো কি? ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন লী।

—কিছু না স্যর! ঠোঁট চুষে জবাব দিল উইলকিনসন।

—আমাকে দেখছো?

—বেয়াদপি মাফ করবেন স্যর! উইলকিনসনের বিনীত ক্ষমাপ্রার্থনা সুস্পষ্ট অপমানকর।

—মাফ চাইবার কি আছে? লী বল্লেন। সেনানীটি মহাদেশীয় বাহিনীর নতুন প্রধান সেনাপতিকে দেখছে ভেবে লী খানিকটা সান্ত্বনা পেলেন। ধপ করে চেয়ারে বসে আস্তে আস্তে বল্লেনঃ আমার জন্য খানিকটা মদ নিয়ে এসো তো মেজর!

—রাম আনবো?

—আনো। বিষণ্ণভাবে মাথা নেড়ে বল্লেন। আগুনের আরও কাছে চেয়ারখানা টেনে এক চুমুকে তিনি পানপাত্র শেষ করে ফেললেন। তার পর আগুনে হাত পা' সেঁকে নিলেন। প্রাতরাশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্য সরাইখানার মালিক ইতিমধ্যে পাশে এসে দাঁড়াল। কিন্তু লী প্রথমে খেঁকিয়ে উঠলেন। তারপর গোটা কয়েক ঢোক গিলে মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন।

—কালকের চিঠিখানা সম্পর্কে কি বলেন স্যর? উইলকিনসন জিজ্ঞাসা করল।

—দুত্তোর চিঠি! ওয়াশিংটন কোথায় আছে আন্দাজ করতে পারো?

—ঠিক জানি না স্যর। তবে আমার মনে হয়, খুব সম্ভব দেলাওয়ারে আছেন।

—জানি না আমিও। তিনি কি বেঁচে আছেন, না মারা গেছেন, কিম্বা তাঁর কোন ফৌজ আছে কি না, কিছুই বলতে পারি না। অবিশ্যি তাতে কিছু এসে যায় বলেও মনে করি না। মলো যা, অমন হাঁ করে চেয়ে দেখছো কি? আমি বল্লাম, তাতে কিছু এসে যায় না।

—বুঝেছি স্যর! আমিও আপনার সঙ্গে একমত। লীকে খুশী করবার জন্য স্মিতমুখে জবাব দিলে মেজর।

—ইচ্ছে হয় প্রাতরাশ খেয়ে নাও না।

—আমাব তেমন খিদে পায়নি স্যর।

—বেশ, তাহলে খসে পড়ো! অমন হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে থেকো না।

লী'র এড্‌জুটাণ্ট কর্ণেল স্কামেল যখন এল, সে পর্যন্তও তিনি আগুনের কাছে তিরিক্ষি মেজাজে বসেছিলেন। বেলা তখন নটা বেজে গেছে। কিন্তু সরাইখানা প্রধান রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে ছিল বলে তখনও কোন খদ্দের আসেনি। অতিথির মধ্যে একমাত্র লী'ই সরাইখানায় রাত কাটিয়েছেন। মেয়েটি রান্নাঘরে লুকিয়ে ছিল। মালিকের শত শাসানি ধমকানি সত্ত্বেও নাইট-শার্টের উপর কোটপরা নগ্নপদ লী'র সামনে তাকে নিয়ে আসা গেল না।

লী'র চেহারা দেখে স্কামেলও উইলকিনসনের মতই বিস্মিত হয়েছিল। কিন্তু চট করেই সে নিজেকে সামলে নিতে পারল এবং সেলাম করতে ভুলল না।

আড়চোখে এড্‌জুটাণ্টের দিকে চেয়ে আগুনের দিকে মুখ ফিরিয়ে লী জিজ্ঞাসা করলেনঃ ব্যাপার কি?

—জেনারেল সুলিভান এগুবার আদেশ চাইছেন স্যর!

—এগুবার আদেশ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যর!

আগুনের দিকে চেয়ে ভুরু কুঁচকে লী বল্লেনঃ কি জন্য সে আদেশ তার চাই?

—আমার বিশ্বাস, তিনি মনে করেছেন যে আপনি তো আর ভিলটাউনে স্থায়ীভাবে ছাউনি ফেলতে চান না?

—নিশ্চয় না। সে চুলোয় যাক, কোথায় সে যেতে চাইছে জানো?

—না স্যর! সে আপনারই জানার কথা।

—তোমার ঔদ্ধত্য বরদাস্ত করতে আমি প্রস্তুত নই স্কামেল! এড্‌জুটাণ্টের দিকে তীব্র দৃষ্টি হেনে খেঁকিয়ে উঠলেন লী। স্বাভাবিকভাবে তাঁর দিকে চেয়ে নরম সুরে স্কামেল বল্লেঃ মাফ করবেন স্যর! ঔদ্ধত্য দেখাবার কোন অভিপ্রায়ই আমার ছিলো না।

—আমি দুঃখিত স্কামেল। অস্পষ্টভাবে লী বল্লেন।—আমার মাথাটা ফেটে যাচ্ছে।

—আমি কিছু করতে পারি?

—না থাক! মানচিত্র আছে তোমার কাছে?

মাথা নেড়ে সায় দিলে স্কামেল। বাইরে গিয়ে স্যাড্‌লব্যাগ থেকে মানচিত্রটা নিয়ে এল। ঘরে ফিরে মানচিত্রটা সে টেবিলের উপর বিছিয়ে ধরল। চেয়ার ছেড়ে লী পা টেনে এগিয়ে এলেন সেটা দেখবার জন্য। লেখা, রেখা, নদী ও শহর ঝাপসা হয়ে তাঁর চোখে একাকার হ'য়ে গেছে। প্রসারিত দুই হাতে টেবিলের উপর ভর কবে তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করবার চেষ্টা করলেন। উইলকিনসন চেয়ার এগিয়ে দিল এবং তাঁকে বসতে সাহায্য করল। ক্রমে মানচিত্রের স্থানগুলি তাঁর চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠল এবং আঙুল দিয়ে ভিলটাউন থেকে প্লাকামিন পর্যন্ত তিনি একটা আঁকাবাঁকা রেখা টানলেন। তাঁর কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি মেরে উইলকিনসন এবং স্কামেল উভয়েই দেখছিল। যখন তাঁর আঙুল প্লাকামিনে থামল, উভয়েই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

—প্লাকামিন। লী বল্লেন।

বিজ্ঞের মত মুচকি হাসল উইলকিনসন।

—ও তো সাত মাইলের বেশী হবে না স্যর! স্কামেল বল্লে।

—কি বল্লে?

—বলছিলাম, এতে খুব সামান্য জায়গা এগোনো হবে না স্যর?

—বেশী দূরে আমরা কেন এগোতে যাবো স্কামেল?

—কারণ অবশ্য নেই স্যর। তবে জেনারেল সুলিভানের ধারণা, জেনারেল ওয়াশিংটনের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য আমাদের এগোনো উচিত।

—সুলিভানকে বলো, আমার খুশী মতোই আমার বাহিনী এগোবে। বুঝলে স্কামেল? কথাটা তাকে বলে দিও।

—যে আজ্ঞে স্যর! সামরিক কায়দায় পেছন ফিরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল স্কামেল।

লী চেয়ে রইলেন স্কামেলের দিকে। তারপর উইলকিনসনের দিকে ফিরে বিরক্তির সুরে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি আমার ফৌজ দেখেছো? দেখেছো তাদের জুতো কেমন? দেখেছো তাদের উর্দির বাহার?

মাথা নেড়ে সায় দিল উইলকিনসন। লীর আত্মসন্তুষ্টির ভাব উপছে উঠল। টলটল করে উঠল তাঁর রক্তচক্ষু। নীচের ঠোঁটখানা কাঁপতে লাগল। ক্ষুব্ধকণ্ঠে সমর্থনের প্রত্যাশায় তিনি বলে উঠলেনঃ ওয়াশিংটনের সঙ্গে মিলিত হবো! দেখেছো তার লোকজনের জুতোর ছিরি? আর কোথায় সে আছে, কি করে জানবো? কেউ জানে, কোথায় সে আছে?

সরাইখানার মালিক টেবিলে প্রাতরাশের আয়োজন করছিল। অবাক বিস্ময়ে ঘাড় ঝাঁকানি দিয়ে উইলকিনসন টেবিলের পাশে বসে পড়ল। লী এতক্ষণ ক্ষিদে টের পাননি। কিন্তু খাবার আসামাত্র গোগ্রাসে ডিম, প্যান-কেক, শুয়োরের মাংস গিলতে লাগলেন। একসঙ্গে অনেকগুলো রুটি পুরে দিলেন মুখে। তাঁর খাবার ভঙ্গী দেখে মনে হয়, লোকটা বুঝি হপ্তাখানেক উপোস করে আছে। এতক্ষণে রান্নাঘর থেকে বেরিয়েছে মেয়েটি। বারের কাছে দাঁড়িয়ে হাতের উপর ঠোঁট চেপে ছিনাল হাসি হাসছিল। চোখ ছিল উইলকিনসনের দিকে। মুচকি হেসে মেয়েটির দিকে চেয়ে অশ্লীল ইঙ্গিত করে চোখ মারল মেজর।

—হারামজাদি খান্‌কি! বিড় বিড় করে বল্লেন লী। পেটে খাবার পড়ে তিনি খানিকটা সুস্থ বোধ করলেন।

—মেয়েটি কে?

—চাও তো তোমার! মেজাজী চালে বল্লেন লী। টেবিলের উপর কয়েকটা থাপড় মেরে সরাইখানার মালিককে কাগজ, কালি-কলম আনতে বল্লেন।—তোমাদের জেনারেল গেটসকে ভালোমত শিক্ষা দিয়ে দিচ্ছি। উইল-কিনসনের দিকে ফিরে বল্লেন।

—ভগবানের নামে হলপ করে বলতে পারি, শীগগিরই হালচাল বদলে যাবে। যে ব্যবস্থা দেখছো তা আর টিকছে না। আমি ইচ্ছে করলে কোন লোককে বড় করে দিতে পারি, আবার তাকে খতম করেও দিতে পারি। বুঝলে উইলকিনসন?

—আজ্ঞে! সরলভাবে হাসল বালকটি। তারপর একটু থেমে বল্লেঃ আমি যেন বাদ পড়ে না যাই স্যর! আমার পক্ষে চালু বিধিব্যবস্থা যে কী জঘন্য তা বলবার নয়!

—আমি তুলতেও পারি, নামাতেও পারি। জোর দিয়ে আবার বল্লেন লী। চেয়ার ছেড়ে উঠে উইলকিনসন জানালার কাছে গেল। পালকের কলম তুলে নিয়ে লী খসখস করে লিখে যেতে লাগলেনঃ

> "আমরা যে ভিৎ তৈরী করবার চেষ্টা করছিলাম, ওয়াশিংটন কেল্লা রক্ষা করবার আনাড়ী চালে তা একেবারেই ভেস্তে গেছে। এত বড় আঘাত আমরা ইতিপূর্বে পাইনি। আপনাকে গোপনে জানাচ্ছি, আমাদের কোন বড় আদমী একেবারেই অনুপযুক্ত। তিনি আমাকে উভয়-সংকটে ফেলেছেন। যদি আমি এই প্রদেশে থাকি, তাহলে আমার এবং আমার ফৌজের সমূহ বিপদ। আর যদি চলে যাই, তাহলে চিরকালের মত প্রদেশটি আমাদেব হাতছাড়া হয়ে যাবে।.."

জানালা দিয়ে একদৃষ্টে চেয়েছিল উইলকিনসন। শ'খানেক গজ দূরে একটা দৃশ্য চোখে পড়ে সে চমকে উঠল। রাস্তার মোড় ঘুরে একদল বৃটিশ অশ্বারোহী জোর কদমে সরাইখানার দিকে এগিয়ে আসছে দেখে সে তাজ্জব হল না। ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত বলেও মনে হল না। বেশ বুঝতে পারল, এতক্ষণ যে কুৎসিত নাটিকার অভিনয় সে প্রত্যক্ষ করছিল এখুনি তার যবনিকাপাত হবে।

লী তখন সবে চিঠি লেখা শেষ করেছেন। সহি করতে করতে তিনি বাইরে অশ্বখুরের শব্দ শুনতে পেলেন। ঘাড় না ফিরিয়েই জিজ্ঞাসা করলেনঃ ও কিসের শব্দ উইলকিনসন?

—বৃটিশ অশ্বারোহী সৈনিকের। অবিচলিত কণ্ঠে জবাব এল।

লী তখন ভাঁজ করছিলেন চিঠিখানা। চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পেছন ফিবে বল্লেনঃ কি বল্লে?

—বৃটিশ অশ্বারোহী সৈনিক। অবিচলিতভাবে আবার বল্লে উইলকিনসন।

—কোথায়? সেকি? কি করে এলো? হতভম্ব হয়ে লী জড়ের মত

দাঁড়িয়ে রইলেন। এক পায়ে চটি ছিল না। হাত দ্'খানা অসাড়ভাবে ঝুলে পড়ল গভীর হতাশায়। পাখীর মত ছোট্ট মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলেন অবসন্নের মত।

—আমার প্রহরীরা কোথায়? কাঁদ-কাঁদভাবে জিজ্ঞাসা করলেন।

উইলকিনসন ততক্ষণে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে।

—দোহাই ভগবানের! কোথায় যাচ্ছো উইলকিনসন? আর্তকণ্ঠে বল্লেন লী।

—নিজের চামড়াটা বাঁচাতে হবে তো! ওটার পর এখনও মমতা আছে। উৎফুল্লভাবে বল্লে বালক।

সরাইখানার একদিকে বন্দুকগুলো ছায়ায় জড়ো করে রেখে প্রহরীরা রোদ পোহাতে গিয়েছিল। বন্দুকের পাঁজাটা ছিল সরাইখানার অপর দিকে। রোদে পিঠ দিয়ে যখন তারা বসেছিল, সেই সময় মেয়েটি গরম ফ্লিপ নিয়ে এল। রাম শেষ কবে তারা মেয়েটিকে পাকড়াল। তার দেহের লোভনীয় অঙ্গে হাত দেবার জন্য সৈনিকদের মধ্যে রীতিমত হুড়াহুড়ি কাড়াকাড়ি শুরু হল। কলহাস্যে ফেটে পড়ল মেয়েটি। প্রহরীরা যখন তাকে গোলা-ঘরের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময় বৃটিশ অশ্বারোহী দল হাজির হল। মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে রইল প্রহরীরা। জমকাল উর্দির বহর দেখে বিস্ময় বিস্ফারিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে মেয়েটিও চেয়ে রইল আগন্তুকদের দিকে।

তখন দল ভেঙে প্রহরীরা যে যে-দিকে পারে ছুট দিল; আর বৃটিশ অশ্বারোহী দল তাদের ধাওয়া কবে তরবাবি চ্যাপ্টা করে পিটতে লাগল।

রাজকীয় অশ্বারোহী দলের কর্ণেল হারকোর্ট যখন সবাইখানায ঢুকলেন, দুহাতে চেয়ার ধরে আগুনের চুল্লীর কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন লী। পরে হার-কোর্ট বলেছে যে একসঙ্গে এমন হাস্যকব অথচ এমন করুণ দৃশ্য সে জীবনে দেখেনি। উভয়েই চিনত পরস্পরকে। লী যখন বৃটিশ ফৌজে ছিলেন, তখন তিনি এই অশ্বারোহী দলেরই ফৌজদাব ছিলেন। এখন তাঁর মনে হল যে নিয়তির মর্মান্তিক নিষ্ঠুর চক্রান্ত তাঁকে টেনে নিয়ে এসেছে এই সরাই-খানায় এমনি পরিণতির মুখে ঠেলে দেবার জন্য। সামনে ভূত দেখলে লোকে যেমন আঁতকে ওঠে, হারকোর্টকে দেখে অনেকটা তেমনিভাবে হকচকিয়ে

কম্পিত হস্তে কোটের বোতাম লাগিয়ে লী নোংরা কুঁচকান নাইটশার্টটা ঢাকবার চেষ্টা করলেন।

' মুচকি হেসে ঘাড় বাঁকিয়ে হারকোর্ট বল্লেঃ আমায় দেখে খুশী হয়েছো লী?

পদমর্যাদা মাফিক গম্ভীর হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন লী। চেয়ার ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। নগ্নপদ ঢাকবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মাথা ঘুরে পা টলে উঠল। এই সময় ক্যাপ্টেন হ্যারিশ ঘরে ঢুকল। একেও চিনতেন লী। সুদর্শন নিষ্কলংক চরিত্রের তরুণ এই ফৌজদারটি বরাবরই ঘৃণা করত লীকে।

—আমাকে নিয়ে কি করতে চান স্যর? ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন লী।

—বোধ হয় ফাঁসি দেবে। নিরুত্তেজকণ্ঠে জবাব দিল হারকোর্ট।

—না, না, না! দোহাই ভগবানের, না!

পকেট থেকে গন্ধমাখা রুমাল বার করে হারকোর্ট নাক ঝাড়ল।

—আপনারা আমাকে ফাঁসি দিতে পারেন না! অস্ফুট ব্যথিতকণ্ঠে আবার বল্লেন লী।

—একে এখন কি করা যায় স্যর? হ্যারিশ জিজ্ঞাসা করে।

—বাইরে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে দাও।

—তাহলে একে পোশাক পরবার সুযোগও দেবেন না তো!

এক পা পেছনে সরে গিয়ে রুমালখানা ঘুরাতে ঘুরাতে লীর আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করে টেনে টেনে বল্ল হারকোর্টঃ না, দরকার হবে বলে মনে করি না। সত্যি, এই পোশাকেই তো বেশ মানিয়েছে! তোমার কি মনে হয় ক্যাপ্টেন হ্যারিশ?

—স্যর, দোহাই ভগবানের! আমাকে উর্দিটা পরতে দিন!

—কেন, উর্দি তোমার পরা নেই মিঃ লী?

—আমার পদমর্যাদার সম্মান দিন!

—কোন পদমর্যাদা নেই তোমার। কর্কশকণ্ঠে বল্লে হারকোর্ট।—হ্যারিশ, একে বাইরে নিয়ে যাও!

বিছানার তলা থেকে বেরিয়ে উইলকিনসন জানালার কাছে গেল। জেনা-রেল লীকে মাঝখানে নিয়ে বৃটিশ অশ্বারোহী দল নয়া-ব্রুনসভিকের দিকে যাচ্ছিল। উর্দি থেকে ধুলোবালি ঝেড়ে উইলকিনসন একতলার বৈঠকখানায়

এল। লী বিল পরিশোধ না করায় সরাইখানার মালিক হা হুতাশ করছিল। উইলকিনসনকে দেখে সে বলে উঠল: দুই পাউন্ড গেল। গরীব লোক আমি। সাতটা ডিনার, আটটা প্রাতরাশ, ঘোড়ার দানাপানি—সব মিলে দুই পাউন্ড।

—জাহান্নামে যাও। চটেমটে বল্লে উইলকিনসন।

সে বেরিয়ে পড়ল। মেয়েটি ছিল উঠানে। উইলকিনসনকে দেখে মুচকি হেসে গুটি গুটি পা ফেলে এগিয়ে এল। প্রহরীদের মধ্যে কেউ কেউ ধুলোকাদামাখা জঘন্য অবস্থায় টলতে টলতে ফিরে আসছিল সরাই-খানার দিকে। মেয়েটি তখন উইলকিনসনের খুব কাছাকাছি এসেছিল। কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে সেইখানেই থমকে দাঁড়াল। প্রহরীদের সন্ত্রস্ত ভাব তখনও কাটেনি। একজনের কানের কাছে লম্বা একটা কাটা থেকে দরদর করে রক্ত পড়ছিল। উইলকিনসনের দিকে চেয়ে তারা তার মেজাজের অবস্থা আঁচ করবার চেষ্টা করল। মেয়েটি ততক্ষণে আরও কাছে ঘেঁষে হাত বাড়িয়ে উইলকিনসনের বাহু টেনে ধরল। সংগে সংগে বোঁ করে ঘুরে উইলকিনসন তার গালে কষে এক চড় মারল।

—বজ্জাত খানকি কোথাকার! তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল উইলকিনসন।

লী'র বাহিনী পরিচালনার ভার এখন সুলিভানের উপরেই পড়ল। কিন্তু কয়েকদিন পূর্বেও সুলিভান বৃটিশের হাতে বন্দী ছিল। ব্রুকলিনে বন্দী হবার পর বৃটিশ কারাগারেই তার দিন কাটছিল। একজন বৃটিশ ফৌজদারকে বন্দী করে ভার্জিনিয়ান তার সংগে বিনিময়ের ব্যবস্থা করেন। সেই থেকে সুলিভান লীর সংগেই ছিল। কিন্তু উভয়ের মধ্যে সম্পর্কটা মোটেই মধুর ছিল না। লী'র অভিপ্রায় অনুমান করে সে বুঝতে পারল যে, তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে শুধু প্রধান সেনাপতিরই সর্বনাশ হবে না, বিপ্লবের যা কিছু অবশিষ্ট আছে তাও খতম হয়ে যাবে। তবু আদেশ পালন করা ছাড়া কিছুই করবার ছিল না। স্কামেল ফিরে এসে যখন সরাই-খানার অবিশ্বাস্য কাহিনী বর্ণনা করল, ঘাড় ঝাঁকানি দিয়ে সুলিভান ছাউনি ভেঙে প্লাকিনামের দিকে অগ্রসর হবার আদেশ দিল। ভাবলে, চুপ করে বসে থাকার চাইতে সাত মাইল এগুনো বরং ভাল।

এর ঘণ্টা দুয়েক পরে উইলকিনসন হাজির হল। সৈন্যবাহিনী তখন এগিয়ে চলেছে। লী'র খোঁজে গতরাত্রে যখন সে ছাউনিতে এসেছিল, তখনই

সুলিভানের সঙ্গে তার দেখা হয়। সে-ই তাকে সরাইখানায় যেতে বল্লে। এখন সুলিভান গতানুগতিকভাবে মাথা নেড়ে তাকে অভ্যর্থনা করল। স্কামেল সরাইখানার কাহিনী মনে করে ভুরু কুঁচকে বল্লেঃ আমাদের জেনারেলকে তো তুমি বহাল তবিয়তেই দেখে এসেছো, তাই না?

কপট হাসিমুখে ঠোঁট চেটে উইলকিনসন আড়চোখে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাল সেনানীদ্বয়ের দিকে। পাকা চক্রী এবং পুরোপুরি আত্মম্ভরী উইলকিনসন। বাহ্যত পাথরের মত কঠোর। যে সব উচ্চাভিলাষী বিপ্লবকে নিজেদের গৌরববৃদ্ধির সোপান হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছে, বয়সে উনিশ বছরের নাবালক হলেও, উইলকিনসন তাদের সেই ক্ষমতার কাড়াকাড়িতে পুরোপুরি ভিড়ে পড়েছিল। লী বন্দী হওয়ায় সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি। লীকে সে মূর্খ এবং পশু বলেই মনে করত। বোকাটা নিজের ভারিক্কি চাল আর দেমাকেই অস্থির! সরে গিয়ে আপদ গেছে! ওর ব্যাপার নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না উইলকিনসন। সে ভাবছে অন্যকথা। ভার্জিনিয়ানের সর্বনাশ সাধনের জন্য যে ব্যাপক চক্রান্ত চলেছে, এখনও তা দানা বেঁধে না উঠলেও এ পর্যন্ত লী এবং গেটসই ছিলেন সে হীন চক্রান্তের প্রধান পাণ্ডা। উইলকিনসন ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না যে, স্কামেল এবং সুলিভান এই চক্রান্তে কতটা জড়িত ছিল। সন্ধানী দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে কোন রকম ভণিতা না করে উইলকিনসন তার সংবাদের ঝুড়ি থেকে মোক্ষম খবরটি বার করল।

—বহাল তবিয়তেই আছেন, তবে বৃটিশের হাতে। হেসে বল্লে সে।

সৈনিকদের সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে আস্তে এগুচ্ছিল তারা। এই কথা শুনে একসঙ্গে তাদের ঘোড়া থেমে দাঁড়াল। মনে হল যেন সলাপরামর্শ করে থামিয়েছে। স্কামেল বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টিতে চোখে টিপ মারতে লাগল। কিন্তু সুলিভান তীক্ষ্ম সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাল ছেলেটির দিকে। অপলকদৃষ্টিতে ছেলেটির দিকে চেয়ে সুলিভান ঘোড়া থেকে নামল। স্কামেল এবং বালকটিও তার অনুকরণ করল।

—এ খুব মজার কথা নয়, বুঝলে চাঁদ! উইলকিনসনের প্রতি ঘৃণা চাপতে না পেরে বল্ল সুলিভান।

তিনজনে তখন ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়েছিল। তাদের ওধারে ইয়াংকিদের দীর্ঘ সারি এক অন্তহীন বৈচিত্র্যহীন দৃশ্য সৃষ্টি করেছিল।

—বেশী বক বক করো না, ঠিকই বলেছি। কর্কশকণ্ঠে বল্লে উইলকিনসন।

স্কামেলের দিকে ফিরে সুলিভান জিজ্ঞাসা করল: এ খানকির বাচ্চা বলে কি?

—আমি ঠিক বলতে পারবো না স্যর। একটু আগে লীকে কি অবস্থায় দেখেছি এবং কি তিনি বল্লেন, তাতো আপনাকে বলেছি। তখন তো তিনি ভালোই ছিলেন।

—আমার সংগে অমনভাবে কথা কইবার কোন অধিকার নেই আপনার। মনে রাখবেন, আমিও একজন মেজর। আপনার কাছ থেকে এরকম কথা শুনতে আমি প্রস্তুত নই। তারস্বরে চেঁচিয়ে বল্লে উইলকিনসন।

—মুখ সামলে কথা কইবি! বালকটির কোট টেনে ধরে আগুয়ান সৈনিকদের দিকে বাঁকা চোখে চেয়ে শাসিয়ে বল্লে সুলিভান।

—মুখ সামলে কথা কইবি। নয়তো খুন করে ফেলে দেবো, নচ্ছার খানকির বাচ্চা কোথাকার!

সুলিভানের চোখের দিকে চেয়ে উইলকিনসন দমে গেল।

—লী'র কি হয়েছে বল। ছেলেটির জ্যাকেট না ছেড়ে সুলিভান জানতে চাইল।

—কে যেন বৃটিশ অশ্বারোহীদের সংবাদ দিয়েছে। তারা এসে ধরে নিয়ে গেলো।

—কে খবর দিলো?

—জানি না।

—কে দিয়েছে শীগগির বল। তুই? সত্যি বল, যদি প্রাণে বাঁচতে চাস!

—আমি দিইনি। প্রতিবাদ জানাল উইলকিনসন।—ভগবানের নামে শপথ করে বলতে পাবি। আমি কেন লীকে পথ থেকে সরিয়ে দিতে যাবো? বৃটিশ অশ্বারোহীদের হাতে তাঁকে ধরিয়ে দেওয়ায় আমার কি লাভ?

সুলিভান ছেড়ে দিলে তাকে।—তাও তো বটে! ও কিসের জন্য ধরিয়ে দেবে? চিন্তিতভাবে সুলিভান বল্লে।

উইলকিনসনের প্রায় কাঁদ-কাঁদ অবস্থা।

—আমি তাঁকে সাহায্য করবার চেষ্টা করেছিলাম। না ভেবে চিন্তে উইলকিনসন সাফাই দিতে লাগল।—বৃটিশ অশ্বারোহীদের পথ রোধ করে একা আমিই দাঁড়িয়ে ছিলাম। তাঁর বেয়াকুফ প্রহরীগুলো আগে থাকতেই ভেগে গেছলো।

দুই হাতে দুটো পিস্তল নিয়ে দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে বল্লাম, যে প্রথম ঘরে ঢুকবার জন্য পা বাড়াবে তাকেই গুলী করবো...

হো হো করে হেসে উঠল স্কামেল। ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করল সুলিভানঃ তা তারা তোমায় ধরে নিয়ে গেল না কেন উইলকিনসন? তোমায় বুঝি বৃটিশ অশ্বারোহীদের কোন কাজে লাগতো না?

—লী নিজেই ধরা দিলেন। আমি যখন দেখলাম কোনো ভরসাই নেই, তখন দোতলায় চলে গেলাম।

—ডাহা মিথ্যুক তুই!

উইলকিনসন চুপ করে গেল। কিন্তু তার চাহনি থেকে সুলিভান তার মনোভাব বুঝতে পারল। তার পাতলা বিবর্ণ ঠোঁট রাগে কাঁপছিল। তার দৃঢ় সংবদ্ধ ঠোঁটের দিকে চেয়ে স্কামেল ভাবল—ছেলেটার আগে মরে যাবার সম্ভাবনাও যে নেই তা নয়; কিন্তু যদি না মরে তাহলে একদিন ওর চোরাগুলীতেই সুলিভানের প্রাণ যাবে।

—হাঁ তারপর, বলে যাও যা বলছিলে! মাথা নেড়ে বল্লে সুলিভান।

গল্পের বাকীটা শুনিয়ে সুলিভানের হাতে একখানা চিঠি দিয়ে উইলকিনসন বল্লেঃ বৃটিশরা ধরে নিয়ে যাবার পূর্বে লী এই চিঠিখানা লিখছিলেন। পরে আমি টেবিলের উপর চিঠিখানা পেলাম।

পত্রখানা পড়বার সময় সন্ধানী দৃষ্টিতে সুলিভানের মুখের দিকে চেয়ে উইলকিনসন জেনারেলের প্রতিক্রিয়া আঁচ করবার চেষ্টা করল। কিন্তু কোন আভাষই পেল না। চোখ তুলে সুলিভান জিজ্ঞাসা করলঃ চিঠিখানা পড়েছো তুমি?

—না। উইলকিনসন চেপে গেল।

সুলিভান তখন পত্রখানা স্কামেলেব হাতে দিল। পত্রখানা পড়ে নীরবে সে আবার চিঠিখানা ফিরিয়ে দিলে সুলিভানকে। দুশ্চিন্তায় উদ্বেগে সুলিভান কয়েক মিনিট কোন কথা বল্ল না। ভরসা পেয়ে উইলকিনসন আবার অম্বি-তম্বি শুরু করল।

তার হাতে পত্রখানি দিয়ে সুলিভান বল্লেঃ জেনারেল গেটসকে পেঁছে দিও।

হাঁদার মত হেসে উইলকিনসন জানতে চাইলঃ জেনারেল গেটস যদি জেনারেল সুলিভানের অভিপ্রায় জানতে চান, তাহলে কি বলবো?

সুলিভান ও স্কামেল দৃষ্টি বিনিময় করল। রুদ্ধক্ষোভ যতটা সম্ভব

মোলায়েম করে সুলিভান বল্লেঃ জেনারেল গেটসকে পত্রখানা দিয়ে জানিও, আমি জেনারেল ওয়াশিংটনের সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছি। তাকে বোলো, আমার সঙ্গে যার মতের মিল হবে না, সে জাহান্নামে যেতে পারে। আমি পরোয়া করি না। বুঝলে উইলকিনসন, কথাটা তাকে বুঝিয়ে বোলো।

লী'র বন্দীত্বের কথা গোপন রইল না। যে করেই হোক পল্টনের মধ্যে রটে গেল। হয়ত লী'র প্রহরীদের মধ্যে যারা ফিরে এসেছে তারাই ফাঁস করে দিয়েছে। কিম্বা ফৌজদাররাই বলে দিয়েছে। তাদের কাছে তো সংবাদটা চেপে রাখা যায় না! কি কারণে এগুবার পথ পরিবর্তন করা প্রয়োজন হল, সে কথা তাদের খুলে বলতে হয়েছে। যা-ই ঘটুক, উইলকিনসন সংবাদ নিয়ে আসবার কয়েক ঘণ্টা পরেই পল্টনের মধ্যে নানা ধরণের গুজব মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকদের মনোভাব ও অভিপ্রায়ের পরিবর্তন টের পাওয়া গেল। সুলিভান তখনও ব্যাপারটা ঠিকমত ঠাহর করতে পারেনি। করুণভাবে সে স্কামেলকে জিজ্ঞাসা করলঃ কি করে বৃটিশরা টের পেলো যে তিনি সরাইখানায় রয়েছেন? ওই শালা বেজন্মা যদি না বলে থাকে ..কিন্তু তাই বা কি করে হয়? ও শালা তো লী আর গেটসের চক্রান্তের প্রধান পাণ্ডা!

—কেন, ইংরেজদের জানবার অসুবিধা কি? সবাই জানতো। মুলুকে কি টোরীর অভাব আছে নাকি?

—একবার ভেবেছিলাম পাজীটার ঘাড় মটকে দি।

—কিন্তু ওর পর আমার সন্দেহ হয় না। স্কামেল বল্লে।—ও কেন করতে যাবে?

—ভগবান জানেন!

আগুয়ান পল্টনের মধ্যে বিক্ষোভ টগবগ করে ফুটছিল। সেইদিন বিকেলেই লী'র গ্রেফতারের প্রতিক্রিয়ায় প্রথম বিস্ফোরণ হল। মাসাচুসেটসের দুশো সৈনিক নির্বোধের মত দল ছেড়ে চলে গেল। ঘোড়ায় চড়ে সুলিভান তাদের পিছু নিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু তারা মাথা হেঁট করে কিম্বা সরাসরি সামনে চেয়ে জেনারেলের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। সুলিভানের অনুনয়, উৎসাহ সঞ্চারের চেষ্টা, কিম্বা ধমকানি কারও কানে গেল বলে মনে হল না।

ঘণ্টাখানেক পরে মেইনের শ খানেক সৈনিক লাইন থেকে খসে পড়ে।

সুলিভান নিজে মেইনের লোক। আর দু'তিনটা দিন অপেক্ষা করবার জন্য সে কাতর মিনতি জানাল। ঘোড়া থেকে নেমে হেঁটে তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল। কিন্তু কোন লাভ হল না। অনুনয় ব্যর্থ হল।

জার্সির লোকজনও দশ বিশ জন করে, কিম্বা এক, দুই তিনজন করে সরে পড়তে আরম্ভ করল।

ব্রুকলিন ও পেলসপয়েন্টে মার্বলহেডের জেলেদের কীর্তির কথা সুলিভান জানত। তাই গ্লোভারকে জিজ্ঞাসা করলঃ আমার আদেশ পেলে আপনার লোকজন দলত্যাগীদের উপর গুলী করবে?

বিমর্ষভাবে মাথা নেড়ে গ্লোভার বল্লঃ ভরসা হয় না।

—তারা আমার পেছনে দাঁড়াবে?

—তা দাঁড়াবে। সায় দিয়ে বল্লে গ্লোভার।—তবে নিজেদের দলের লোক খুন করতে রাজী হবে না।

সন্ধ্যা ছটার সময় কনেক্‌টিকাটের আশীজন অশ্বারোহীর একটি দল অন্ধকারের সুযোগে সরে পড়ল।

রাত্রে ভারমণ্টের প্রায় দুশো এবং ভার্জিনিয়ার শ'খানেক গণফৌজ ভেগে গেল। মনস্থির করতে পেনসিলভানিয়ার একটি রেজিমেণ্টের গোটা একটি রাত লেগেছিল। পরদিন সকালে শ' তিনেক ভেগে গেল। সুলিভান সে রাত্রে ঘুমোল না। প্রতিটি রেজিমেণ্ট ঘুরে সে গণ্ডা গণ্ডা ক্যাপ্টেন, কর্ণেল, মেজর ও লেফটন্যাণ্টকে অনুনয়-বিনয় করতে লাগল। এমন কি নিজেদের যারা জেনারেল বলে পরিচয় দিত, তাদের কাছেও ধর্ণা দিল সুলিভান। সে আদেশনামা জারী করল, শাসাল, চীৎকার চেঁচামেচি করে গলা ভাঙল। তারপর তাঁবুতে ফিরে সে ঢকঢক করে প্রায় তিন পোয়া মদ গিলে ফেল্ল...দেশের কথা ভেবে অশ্রু বিসর্জন করল আর নিজের ভাগ্যকে শত ধিক্কার দিল।

স্কামেলের ঘুম ভাঙিয়ে জিজ্ঞাসা করলঃ হায় ভগবান, আমি কি করি বলো!

—আমার মাথায় আসে না।

—কি করতে পারি বলো!

—যারা আছে তাদের জড়ো করে দলত্যাগীদের গুলী করতে বলতে পারেন।

—কোনো লাভ হবে না। গুলী তারা করবে না। সবাই এক কথা ভাবছে।

—কতজন ভেগেছে?

—প্রায় হাজার খানেক।

—কি করা উচিত, আমার মাথায় আসে না। স্কামেল বল্লে। সৈনাপত্যের দায়িত্ব যে তার ঘাড়ে চাপেনি একথা ভেবে সে খুশীই হল।—কি আপনার করা উচিত যদি বলতে পারতাম তো খুশীই হতাম। কিন্তু আমার মাথায় কিছুই আসছে না।

জাগরণ-ক্লান্ত উসকো-খুসকো সুলিভান ঝাপসা চোখে চেয়ে দেখল যে পরদিনও পলায়নের হিড়িক অব্যাহতভাবেই চলেছে। শুধু এক-দুই-তিনজন করে নয়, রেজিমেন্টকে রেজিমেন্ট, ব্রিগেডকে ব্রিগেড ভেগে যাচ্ছে। মাসাচুসেটসের লোকজন, রোড দ্বীপবাসী, কনেক্‌টিকাটের লোক, জার্সি, নিউ-ইয়র্ক, মেরিল্যান্ড ও ভার্জিনিয়ার সৈনিক—সবাই টাপটুপ করে দল থেকে খসে পড়ছে।

কেমন করে শিয়াল-শিকারী একনায়ক হলেন

ছয় সাত কি আট বছর বয়সে একটি ছড়া মুখস্থ করেছিলেন শিয়াল-শিকারী। সেকেলে বর্ণমালায় উপাসনা সংগীতের মত ফ্রেমে বাঁধান ছিল ছড়াটি। বড় বড় পা আর লম্বা লম্বা নাকওয়ালা ইস্পাতে খোদাই করা বামন মূর্তি আঁকা সে ফ্রেম। সে আজ বহু বছর আগেকার কথা। তবু দু পাঁচটা ছোটখাটো অতি সাধারণ ঘটনা যেমন বহুদিন পরেও স্মৃতিপটে জেগে থাকে, বহু বছর আগে শেখা এই ছড়াটিও তেমনি তাঁর মনে উৎকীর্ণ হয়ে আছেঃ

ছুটে চল, ছুটে চল,
ছুটে চল রে।
তোকে যে জানতেই হবে,
কখন, আবার কখন,
ছুটতে হবে, ছুটতে হবে,
ছুটতে হবে রে!

ব্রুনস্‌ভিকে থেমে তিনি খানিকটা বিশ্রাম নিতে চেয়েছিলেন। খানিকটা দম নেবার ইচ্ছা ছিল। ভেবেছিলেন, খুঁজে পেতে যদি কিছু ময়দা আর গরম পোশাক পরিচ্ছদ জোগাড় করা যায়। মনে মনে এ আশাও ছিল যে, পাঁচ হাজার পল্টনসহ লী হয়ত এখানে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবেন এবং গণ-সেনাদের ক্ষমতা লাভের একটা সুযোগ দেবেন। সেই আশা, ক্ষমতা লাভের সেই কল্পনা আজ বড্ড বেখাপ্পা লাগে। কংগ্রেস এ কথাটা হামেশাই ব্যবহার করত। আদমস, হানকক, ফ্রাঙ্কলিন, জেফারসন—সবাই বলতেন ক্ষমতা-লাভের কথা। কথাটা তাঁদেরও খুব পছন্দসই ছিল। এই সামান্য দুটি কথা ব্যাপক অর্থে চাষী, দেশগাঁয়ের লোক, কারিগর ও কেরাণীর মানসচক্ষে এমন এক উদ্দীপনাময় ছবি এঁকে দিত যে তারা সবাই হিসাবের খাতা, লাঙ্গল আর যন্ত্রপাতি ফেলে দিয়ে বন্দুক কাঁধে করে সগর্বে এগিয়ে এসেছে শত্রু তাড়িয়ে নিজের দেশে সর্বকালের জন্য স্বাধীনতা ও সুবিচার সুপ্রতিষ্ঠিত

করতে। কিন্তু অন্তঃসারশূন্য বাস্তব অবস্থা একেবারেই উল্টো। রুদ্ধ কপাট, বন্ধ জানালা আর ক্ষুব্ধ উদ্যত বন্দুক সাবধান করে দিচ্ছেঃ ভাগ ভিক্ষুক, ভাগ!

যাই হোক, নয়া-ব্রুনসভিকে থেমে ভালই হল। অন্ততঃ ক্লান্ত পা দুটো তো খানিকটা বিশ্রাম পেল! গোণা-গুণতি করে নিজের আসল অবস্থা ভেবে দেখবারও ফুরসৎ মিলল। কিন্তু পয়লা ডিসেম্বরেই এ সুযোগ শেষ হল। উপবাস-খিন্ন অস্থিসার একটা ঘোড়ায় চড়ে উনিশ বছরের ক্যাপ্টেন পিটার মেনডোজ প্রধান সেনাপতিব বাসভবনে এসে চীৎকার করে বল্লেঃ তারা এসে পড়েছে স্যর!

শুধু একটা শার্ট পরা ছিল প্রধান সেনাপতির। শার্টের নীচে তাঁর অস্থি-সার প্রশস্ত কাঁধ কুঁজো হয়ে ঝুলে পড়েছে। এক টুকবো রুটি হাতে নিয়ে সেইভাবেই কোয়ার্টার থেকে বেবিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কারা এসেছে?

—বৃটিশরা স্যর!

রুটিব টুকবোটা একসঙ্গে মুখে পুরে দিলেন। বিলি পেছন থেকে চটপট কোটটা পবিয়ে দিল। কোটটা গায়ে ভরতে ভরতে বল্লেনঃ ঘোড়া থেকে নামো ক্যাপ্টেন। হাঁ, এখন ঠিক করে বলো।

ছেলেটি উত্তেজিতভাবে বুঝিয়ে বল্লঃ মাইল খানেক দূরে আছে।

—কি করে জানলে?

—আমি নিজে দেখেছি। করুণ কণ্ঠে ছেলেটি বল্লে।—ভগবানের নামে শপথ করে বলতে পাবি স্যর, আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

—কতজন হবে?

—কতজন কি স্যব! গোটা পল্টন আসছে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে শিয়াল-শিকারী ছুটতে লাগলেন। দৌড়োবার সময় কাটা গাছেব মত তাঁব দীর্ঘ দেহ টলছিল। গ্রীনকে দেখে ডেকে বল্লেনঃ আমাদের রওনা হতে হবে নাথানেল।

—কখন?

—এখুনি।

—কোথায় যাবো?

—এ জায়গা ছেড়ে।

—কোথায়?

—মার্কার আর স্টার্লিংকে তাদের ব্রিগেড রওনা করিয়ে দিতে বলো।

হোঁতকা নক্সও হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছিল উত্তেজিত ভাবে। খবরটা সেও জানতে পেরেছে। প্রধান সেনাপতি তাকে ডেকে বল্লেনঃ তুমি পুলটা ভেঙে দিতে পারো হ্যারি?

—পুল?

—দুত্তোর ছাই! তোমার কি কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই হ্যারি? নদীর উপরের পুলটার কথা বলছি।

—কোনোদিন চেষ্টা করে দেখিনি তো স্যর!

—বেশ যাও, ভেঙে দাও গে! যদি বুঝতে পারো যে ওরা পার হবার তোড়জোড় করছে, তাহলে কয়েকটা কামান সাজিয়ে রেখো। যাও, পুলটা ভেঙে দাও গে।

কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন সমুদ্রবক্ষে জাহাজীদের হুঁশিয়ার করে দেবার জন্য যে শিঙ্গা বাজান হয়, বই-বিক্রেতার কণ্ঠস্বরও অনেকটা সেই ধাঁচের। এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করে সে তারস্বরে জানিয়ে দিলঃ যে ব্রিগেড যেখানে আছো জলদি সরে পড়ো! ব্রিগেডস্, এগিয়ে চলো! গোটা ছাউনিতে অমনিই ছুটাছুটি হুড়াহুড়ি খোঁজাখুঁজির ডামাডোল শুরু হল। হাতিয়ারের খোঁজে সর্বত্র ছুটা-ছুটি করছে লোকজন। সেনানীরা হন্যে হয়ে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করছে সৈনিকদের। হাতের কাছে যা পাচ্ছে তাই দিয়ে চালকেরা গাড়ী ভর্তি করছে। এই ডামাডোলের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে ধেড়ে গলায় নক্স ডাকছে তার গোল-ন্দাজদের, খুঁজছে কোথাও শাবল আর হাতুড়ি পাওয়া যায় কিনা। পুল ভাঙার কাজ কোনদিনই সে করেনি। তাছাড়া রারিটান নদীর উপর এই মজবুত এবং পোক্ত কাঠের সাঁকোটি যে শাবল আর হাতুড়ির কয়েকটা ঘায়ে ভেঙে পড়বে, এমনও মনে হয় না। যাই হোক, সেতুটি ভেঙে ফেললেও বিপদ এড়ান যাবে না। শুধু অল্পস্থায়ী ফুরসৎ মিলবে। কেন না রারিটান নদীর অধিকাংশ স্থানে এক হাঁটুর বেশী জল নয়। হ্যামিলটনকে দেখতে পেয়ে তারস্বরে জিজ্ঞাসা করল নক্সঃ আলেক্স, তোমার কামান কোথায়?

—নদীর পাড়ে আছে স্যর। আমি ঘোড়া খুঁজছি।

—দুত্তোর ঘোড়া! নিজেরা ঠেলে পুলের উপর নিয়ে যাও। দেখো বৃটিশরা যেন পার হতে না পারে।

—যে আজ্ঞে, স্যর!

—কোথাও শাবল দেখতে পেলে?

—আজ্ঞে?

—শাবল হে, শাবল! আমাকে ঐ পুল ভাঙতে হবে!

অবাকভাবে মাথা নাড়ল হ্যামিলটন। নক্স তখন ছুটল অন্যদিকে। কিছু-ক্ষণ পরে কুড়াল, শাবল ও হাতুড়ি সহ জনবারো লোক কুড়িয়ে পুলের কাছে এল। হ্যামিলটন ইতিমধ্যেই সেতুমুখে কামান সাজিয়ে অপেক্ষা করছিল। লোকজনসহ হিমশীতল জলে নেমে সে পুলের তক্‌তা ও পাঁজার উপর দমাদম ঘা মারতে শুরু করল। শীতে ঠকঠক করে কাঁপছিল আর হাঁচছিল সেতুভাঙা দলটি। এই সময়ে তাদের মাথার উপর কামান গর্জে ওঠে। মিনিট কুড়ির মধ্যেই ভেঙে পড়ে সেতুটি।

নদীর পাড়ে উঠে শীতের কাঁপুনি থেকে ত্রাণ পাবার জন্য খানিকটা চাঙ্গা হবার আশায় লাফাতে লাগল নক্স। নদীর ওপারে চেয়ে দেখল যে, লাল ও সবজে উর্দিপরা বৃটিশ ফৌজ সুশৃংখল ও সুসংহত ভাবে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে কামানের পাল্লার বাইরে। সেতুটির অপর প্রান্তে তিনটি হালকা পদা-তিকের দেহ পড়ে আছে। পুল পার হবার চেষ্টা করতে গিয়ে কামানের গ্রেপ-গোলায় খতম হয়ে গেছে। হাইল্যান্ডার বাঁশীবাজিয়েরা প্যারেড্ করতে করতে 'ইয়াংকি' ডুডলের বেসুরো গৎ বাজাচ্ছিল। নক্স দেখল, একজন বৃটিশ সেনানী খানিকটা তাচ্ছিল্যভরে, খানিকটা শ্রদ্ধায় টুপী তুলে অভিবাদন গ্রহণ করল। পরে মনে হয়েছে, ঐ সেনানীটিই কর্ণঅয়ালিস্।

—দুত্তোর শালা ঘাঘরাপরা জানোয়ার কোথাকার! বিড় বিড় করে বল্লে নক্স। নিস্ফল আক্রোশে দাঁত কড়মড় করে উঠল হ্যামিলটন।

—কামানগুলো হয়ত পুঁতেই রাখতে হবে। নক্স বলে।

—অবিশ্যি অন্ধকার হলে যদি সরিয়ে নেওয়া না যায়!

—ঘোড়া ছাড়া টেনে নেবে? নক্স ভাবছিল যে অন্ধকার হবার পূর্বেই বৃটিশরা নদী পার হয়ে পেছন থেকে তাদের ঘিরে ফেলবে। হঠাৎ একটা উড়ো চিন্তা মনে এল। এই অফুরন্ত ঝামেলা ঝঞ্ঝাটের দিগদারি এড়িয়ে বৃটিশ কারাগারে বসে থাকতে কেমন লাগবে? পেছন ফিরে দেখল, প্রিন্সটনের পথ ধরে ইতিমধ্যেই মহাদেশীয় ফৌজ সটকে পড়েছে। পলায়নপর শেষ সৈনিকটিই শুধু তার নজরে পড়ল।

পরদিন সন্ধ্যার মুখে আজাদী ফৌজের অবশিষ্ট কয়েকশ' সৈনিক ট্রেনটন পেঁৗছুল। বিনা যুদ্ধে নিউ-জার্সি ছেড়ে যাওয়া হবে না, শুধুমাত্র এই জিনিসটি প্রতিপন্ন করবার জন্য স্টার্লিং-এর নেতৃত্বে বারো শ' সৈন্য প্রিন্সটনে

রেখে গেলেন প্রধান সেনাপতি। এটা লোক-দেখান চাল মাত্র। স্টার্লিং এবং সুলিভান দুজনেই বন্দী হয়েছিল ব্রুকলিনে। বন্দী বিনিময় করে উভয়কেই মুক্ত করেছিলেন ভার্জিনিয়ান।

—কিন্তু আমি কি করবো স্যর? অর্ধভুক্ত জীর্ণবাস অস্ত্রহীন শীতজর্জর সৈনিকদের দিকে চেয়ে স্টার্লিং জিজ্ঞাসা করে।

—আমরা তাদের দেশরক্ষার চেষ্টা করছি দেখলে জার্সির কিছু গণসেনা এসে যোগ দিতে পারে। এ প্রধান সেনাপতির আশা বই কিছুই নয়।

—ওদের রক্ষা করবো? আপনি কি বলছেন স্যর! এরা সবাই ঘৃণা করে আমাদের।

ভার্জিনিয়ান কি জবাব দেবেন ঠাহর করে উঠতে পারলেন না। থতমত খেয়ে এক পা পেছনে হটে গেলেন।

—ওদের রক্ষা করতে বলছেন? আবার বল্লে স্টার্লিং।—আমেরিকার সব চাইতে সম্পদশালী অঞ্চল এই জার্সি। অঢেল খাবার এখানে। কিন্তু তবু এই দেশেই আমরা উপোস করছি।

—এরা বোঝে না। ফিস ফিস করে বল্লেন তিনি।

—বেশ বোঝে স্যর! নিজের পেট কি করে ভরতে হবে, বেশ জানে।

—আমি জানি।

—আর যদি বৃটিশরা আসে?

বড় আদমী মাথা ঝাঁকতে লাগলেন।

—আমরা মোটে বারো শ' রইলাম। এদের অবস্থাটা একবার চেয়ে দেখুন স্যর! কিন্তু বৃটিশের হাতে রয়েছে দশ পনেরো হাজার তামাম দুনিয়ার সেরা সৈনিক।

—তাও জানি।

—তবুও আপনি...

—যা সাধ্যে কুলোয় করো! ভার্জিনিয়ান বল্লেন।

ট্রেনটনে মিফলিন এবং গ্রীনকে নিয়ে তাঁবুতে বসেছিলেন তিনি। ব্রুকলিন পাহাড়ে মিফলিনের উপর যেদিন চটেছিলেন, সে এক যুগের কথা বলে মনে হল। ভারনন পাহাড়ের শ্যামল প্রান্তরে শিকারী কুকুরের পেছন পেছন হামেশাই তিনি দৌড়েছেন। সে আজ বহু যুগ আগেকার কাহিনী বলে মনে হয়। বহুদিন পূর্বে মৃত কোন মানুষ সম্পর্কে লোকে যতটা

নিরাসক্তভাবে চিন্তা করতে পারে, পোটোমাক নদীতীরের দীর্ঘকায় সুদর্শন অভিজাত শিয়াল-শিকারীকেও আজ সেইভাবেই তিনি বিচার করতে পারেন। সেজন্য কোন অনুশোচনা হয় না। কিন্তু কষ্ট হয়, যখন নিশ্চিত বুঝতে পারেন যে দুনিয়ার সে-হাল খতম হয়ে গেছে। অবলুপ্ত হয়েছে সে-জীবন-ধারা। এমনি করেই যায়! আগেও গেছে, আবারও যাবে। কিন্তু কোন ভবিষ্যৎ রেখে যাবে না। শুধু চলতি পথের পথচারীর জীবনে দিয়ে যাবে অন্ধকারময় ক্লান্তিকর এক বর্তমান।

—লোকজন একবার গোণা-গুণতি করা দরকার নাথানেল। তিনি বল্লেন।

—গুণে কি লাভ হবে স্যর! বিরক্তভাবে জবাব দেয় মিফলিন।

—কেন?

—নিউইয়র্কের গণসেনারা আজ ভেগেছে। এখন হাজার খানের সৈন্যও নেই। বড় জোর আট ন শো থাকতে পারে।

—হতে পারে না। সুর নরম করে সংশয় প্রকাশ করলেন শিয়াল-শিকারী।

—মিফলিন ঠিকই বলেছে। হাঁদার মত বলে উঠল গ্রীন।—নিউইয়র্কের গণসেনারা সত্যিই চলে গেছে। তাদের থামাতে গেলে কোন লাভ হতো না। সংখ্যায় আমরা কজন? সে চেষ্টা যদি করা হতো, তাহলে বাকী যারা আছে তারাও ভেগে যেতো।

—মাত্র আট নশো! শিয়াল-শিকারী মনে মনে ভাবলেন।

—সব কিছু শেষ হতে চলেছে, একথা ভাবতেও আমার ঘৃণা হয় স্যর! সত্যিই ঘৃণা হয়। করুণভাবে বল্লে মিফলিন।

—এখনও লী'র পল্টন রয়েছে! গ্রীন স্মরণ করিয়ে দেয়।

—একবার যদি লী'র পল্টনের দেখা পেতাম!

—দেখা পাবো। শিয়াল-শিকারী বল্লেন। কিন্তু তাঁর কণ্ঠে প্রত্যয়ের দৃঢ়তা ছিল না। ভগবানের দয়া এবং অপার করুণা সম্পর্কে লোকে যেভাবে কথা বলে, শিয়াল-শিকারীর উক্তিও ছিল সেই ধরণের।

—বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আমরা নিউইয়র্কে ছিলাম, এ গতকালের কথা বলে মনে হয়। গ্রীন বলে।

—কালকের কথা ভুলে যাও। শিয়াল-শিকারী বল্লেন।—তোমাকে ফিলা-ডেলফিয়া যেতে হবে মিফলিন। সেখান থেকে যতোটা পারো লোকজন নিয়ে আসবে। কংগ্রেসের সামনে হাজির হতে হবে তোমাকে। আমার কোন পত্রই তাঁরা পড়েন না। কিম্বা পড়লেও এমন জায়গায় রেখে দেন যে, ও সম্পর্কে

তাঁদের স্মৃতি বা বিবেক বিন্দুমাত্র বিব্রত বোধ করে না। কিন্তু তোমাকে কংগ্রেসের সামনে গিয়ে হুমকি দিতে হবে। মেজাজ দেখাতে হবে। প্রয়োজন হলে অনুনয় করতে হবে। মোটমাট যে করেই হোক, সৈন্য নিয়ে ফেরা চাই।

প্রধান সেনাপতি যদি বলতেন যে 'চাঁদ নিয়ে ফেরা চাই', তাহলেও অন্যায় হত না।

রারিটান নদীতীরে বৃটিশদের রুখে নক্স যখন ফিরে এল, খুকখুক কাশিতে বেশ কষ্ট পাচ্ছিল সে। ফিরে এসে ভার্জিনিয়ানকে সে জেনারেল হাউ'র ঘোষণার কথা জানাল।

—মহামান্য সম্রাটের গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তাঁর যত প্রজা অস্ত্রধারণ করেছে, ঘোষণায় তাদের নিজ নিজ গৃহে ফিরে যাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নক্স বল্লে।—পঞ্চাশ দিনের মধ্যে যারা ঘোষণা অনুযায়ী কাজ করবে তাদের ক্ষমা করা হবে বলেও প্রচার করা হয়েছে।

—আমিও এমনি একটা কিছু প্রত্যাশা করছিলাম। মাথা নেড়ে বল্লেন ভার্জিনিয়ান।

—এতে আমরা কি খুব আঘাত পাবো স্যর?

—যা পেয়েছি তার চাইতে বড় কি আঘাত আমাদের দেওয়া যায়!

—কি জানি! দাবানলের মত এই ঘোষণা গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে। আগে টোরীরা আত্মপরিচয় দিতে সাহস পেতো না। কিন্তু এখন বুক ফুলিয়ে ঘোষণা করছে। সেজন্য গর্বও করে। প্রাণের মায়া ত্যাগ করে জার্সি'র পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়ালে অনেক অভিনব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যায়।

শেষ পর্যন্ত চরম পরিণতি সত্যিই কিছুদিন পেছিয়ে গেল। মিফলিন এক বিস্ময়কর কাণ্ড করে বসল। ফিলাডেলফিয়া থেকে পনেরো শ গণসেনা নিয়ে ফিরল। সৈনিক এরা কেউই নয়। তবু মাথা-গুণতিতে পনেরো শ মরদ তো! ফিলাডেলফিয়ার কেরানী, দোকানদার, দপ্তরী, ছুতোর, দর্জি ও কাপড়ের দোকানের কর্মচারী নিয়ে গড়া এই গণসেনা দল ইতিমধ্যেই শ্রান্ত এবং ভীত হয়ে পড়েছে। দীর্ঘ পথ চলায় সবাইর শরীরে বিষ-বেদনা। দুই-তৃতীয়াংশ লোকের বন্দুক ছিল। খানিকটা শঙ্কিতভাবে আনাড়ীর মত বন্দুক নিয়ে চলাফেরা করছে তারা। বাকী আর সবাইর হাতে ছিল বর্শা কি তলোয়ার। কিছুদিন আগেও এই সব হাতিয়ার তাদের ঘরে আগুনের চুল্লীর উপরের তাকে

কিম্বা সেকেলে ক্ষুদে বন্দুক ব্লাণ্ডারবাসের পাশে ঝুলান থাকত। একেবারেই আনাড়ী এরা। খেলার ছলে খানিকটা কুচকাওয়াজ শিখেছে মাত্র। ভয় দেখিয়ে ধমকে মিফলিন এদের নিয়ে এসেছে ট্রেনটনে। কিন্তু তাহলেও এরা মরদ তো!

ভার্জিনিয়ান সাগ্রহে মিফলিনের করমর্দন করলেন। তাঁর চোখের চাহনি থেকে মিফলিন বুঝতে পারল যে, চূড়ান্ত বিপর্যয়ের কতটা কাছে তিনি এসে পড়েছিলেন।

—আর কতজন আছে? সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করল মিফলিন।

—শ ছয়েক...।

মিফলিন শিশ দিতে লাগল।

—বিপর্যয়ের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম। বড় আদমী স্বীকার করলেন। দুর্বল ও ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাঁকে। মুখে ছিল পীতাভ রুগ্ন উজ্জ্বলতা। কিন্তু এত কথা তিনি বলছিলেন যে, তা থেকেই তাঁর মনের প্রকৃত অবস্থা আঁচ করা যায়। মিফলিনকে বোঝাবার জন্য যত কথা তিনি বল্লেন, ইতিপূর্বে কোনদিন একসঙ্গে অত কথা বলেননি।

—আমি তাদের আসল অবস্থাটা বুঝতে দেইনি। জানতে পারলে সবাই ভেগে পড়তো। ছোট ছোট দলে তাদের ভাগ করে দিয়েছিলাম। সব সময় চলতির উপর রেখেছি যাতে তারা টের না পায় যে সবাই ভেগে গেছে। তাতে আর যাই হোক, তারা বুঝতে পারেনি। তাছাড়া জেনারেল, আমি রোজ প্রার্থনা করেছি. .। বলতে বলতে সহসা থেমে গেলেন প্রধান সেনাপতি। লজ্জায় সংকোচে মুখ রাঙা হয়ে উঠল। প্রধান সেনাপতি হয়ে একি বলছেন তিনি? একটু থেমে গাঢ়কণ্ঠে বল্লেনঃ এড্‌জুটান্টের কাছে এদের নাম লিখিয়ে দাও। তারপর এদের ট্রেনটন পাঠিয়ে দেবে। গ্রীন রয়েছে সেখানে। আমার দলে যে কজন আছে তাদের নিয়ে আমিও আসছি। মোড় ফিবে তিনি নতুন গণসেনাদের পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

—হাঁ. পাশাপাশি দুটো লাইন করে এদের মার্চ করিয়ে নিয়ে যাও। জার্সির টোরী ব্যাটারা দেখুক যে এখনও আমাদের পল্টন আছে। কিন্তু খুব হুঁশিয়ার, এদের লড়াই করতে পাঠাবে না। মিফলিনকে আবারও বল্লেন তিনি।

সদর ঘাঁটিতে ফিরে তিনি বিলিকে ডাকলেন। নিগ্রো খানসামাটি ঘরে ঢুকলে জিজ্ঞাসা করলেনঃ আর মাদেরা আছে?

ঘাড় নেড়ে সায় দিল সে।

—কতোটা?

—ছয় বোতল।

—সবটা নিয়ে আয়। শিয়াল-শিকারী বল্লেন।

খাঁটি মাতাল কোনদিনই তিনি হননি। আজও মদ খেয়ে নেশা হল না। কেমন বিষণ্ণ আর বিশ্রী লাগতে লাগল। বেপরোয়াভাবে গেলাশের পর গেলাশ মদ খেয়ে চল্লেন ঢক্‌ঢক্‌ করে। বিস্মৃতি তাঁর কাম্য নয়। তিনি চান স্মরণ করতে। যে অনধিগম্য জটিল গ্রন্থি দিয়ে তাঁর জীবন গড়া, তিনি চান সেই জটপাকান অজ্ঞাত গ্রন্থির রহস্য জানতে ..সেই তালাচাবিবন্ধ শক্ত মোড়কে বাঁধা রহস্যের হদিশ করতে।

কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হল। মাতাল হওয়া বা স্মরণ করা—কোনটাই সম্ভব হল না। ভারনন পাহাড়কে মনে হল অস্পষ্ট স্বপ্নের মত। তার চাইতে বেশী কিছু নয়। ভারনন পাহাড়ে তাঁর শিয়াল-শিকারী ভদ্রলোকের জীবন স্বপ্নের অংশ বলেই প্রতিভাত হল। অতীত জীবনের সব কিছুই হারিয়ে গেছে। কোন কালেই সে জীবন ফিরে পাবার আশা নেই। আজ যে দুর্গম পথে তিনি চলেছেন সে পথে চলতে দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু অতীত জীবনে কোন সম্বল এ পথ চলতে তাঁকে সাহায্য করবে না।

বর্তমান অবস্থায় অস্তিত্ব বজায় রাখাই সমস্যা। পল্টন হিসাবে, আন্দোলন হিসাবে, আদর্শ হিসাবে অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারলেই হল। আজাদী ফৌজ দৌড়োল, ভাঁওতা দিল, লুকিয়ে রইল, কখনও বা আঁকাবাঁকা ভুল পথে চলল। তারা হোঁচট খেল, পড়ে গেল, হামাগুড়ি দিল, তবু এগিয়ে চলা বন্ধ হল না। রুখে দাঁড়িয়ে আঘাত হানবাব কথা আজকাল কেউই বলে না। কিছুদিন আগেও ভার্জিনিয়ান পালাতে চাইতেন না। গর্বোন্নত শিরে খুনে-রাঙা সর্বনাশের মধ্যে মাথা খুঁড়ে মরা শ্রেয় মনে করতেন। কিন্তু লক্ষ্য ও পরিবেশের পবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সে-গর্বও টুটে গেছে।

ফিলাডেলফিয়া থেকে সদ্য-আগত সৈনিকদের প্রিন্সটন পাঠিয়ে দিয়েছেন। পল্টনের সঙ্গে মিলিত হবার আশায় নিজেও চল্লেন সেদিকে। পথে পলায়নপর এক জনতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। আগে হলে তিনি ক্রোধে হিতাহিতশূন্য হয়ে যেতেন। কিন্তু আজ পলায়নপর জনতার আগুয়ান দল দেখে নিরাসক্তভাবে চেয়ে রইলেন। গ্রীনকে দেখতে পেয়ে ধীরস্থিরভাবে জিজ্ঞাসা করলেনঃ আবার কি হলো নাথানেল?

যেমন ক্লান্ত তেমনি খিটখিটে হয়ে পড়েছিল গ্রীন। এমন কি প্রধান সেনাপতির প্রতিও কোন দরদ ছিল না। আর্তকণ্ঠে সে বল্লেঃ যা হয়ে থাকে। পোড়াকপাল আর কি! কি আর হতে পারে বলুন?

—বৃটিশরা প্রিন্সটনে এসেছে? মোলায়েমভাবে জিজ্ঞাসা করলেন লম্বা আদমী।

গ্রীন হতাশভাবে মাথা নাড়ল।

-সাময়িকভাবেও তাদের রুখবার কি কোন উপায় ছিলো না নাথানেল?

—না। তাহলে কি আমি রুখবার চেষ্টা করতাম না মনে করেন? আমরা যদি সুশিক্ষিত পল্টন হতাম, তাহলেও রুখবার উপায় ছিলো না। শত্রুর সংখ্যা আমাদের তিনগুণ। কিন্তু স্যর, ফিলাডেলফিয়ার গণসেনাদের লক্ষ্য করেছেন?

– করেছি। ঘাড় নেড়ে শিয়াল-শিকারী বল্লেন। তারপর হতাশভাবে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কতজন ভেগেছে?

—মাত্র তিনশো।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে ভার্জিনিয়ান ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে পলায়নপর পল্টনের পেছু পেছু ছুটলেন। গ্রীনও তাঁর পেছু নিল এবং খানিক পরে রুক্ষভাবে জিজ্ঞাসা করলঃ এখন কি আদেশ দেন স্যর! না, কোন আদেশ দেবেন না! আমি এখন কি করবো বলুন?

—কিছুই করতে হবে না নাথানেল! নিজেকে সামলে নাও!

—কিন্তু আপনি এখন কি করবেন?

—হয়তো দেলাওয়ারে পার হবো। ঘাড় ঝাঁকানি দিয়ে ভার্জিনিয়ান বল্লেন।

– তারপর, স্যর? কর্কশকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে গ্রীন।

বড় আদমী কোন জবাব না দিয়ে মুচকি হেসে এগিয়ে চল্লেন। কিন্তু জোর কদমে ছুটে গ্রীন যখন তাঁর পাশাপাশি এল তখন বল্লেনঃ পথ যখন একটিই থাকে, তখন আর মানচিত্রের দরকার হয় না নাথানেল।

—দোহাই ভগবানের, হেঁয়ালী কথা বলবেন না স্যর!

—বেশ তাহলে সোজা কথায় বলছি। একটানা পিছু হটে যাবো আমরা। কতদূর? ঘাড় ঝাকানি দিয়ে ভার্জিনিয়ান আবার বল্লেনঃ তোমার কি মনে হয় বৃটিশরা খুব ধৈর্যশীল? তারা কি পাহাড়ে পাহাড়ে আমাদের খুঁজে বেড়াবে বলে মনে করো? তা' যদি হয় তাহলে বনের মধ্যে আমরা তাদের সঙ্গে লড়বো। দরকার হলে, বনের ওধারেও লড়বো। কিন্তু সে কথা ঠিক বলতে

পারি না। আজও সেখানে কোন মানুষ যায়নি। হয়তো আমরাই সেখানকার প্রথম যাত্রী হবো নাথানেল!

চিরকালের জন্য স্বাক্ষর রেখে গেল তারা। দেলওয়ারে নদীর দিকে এগিয়ে যাবার সময় গুড়িগুড়ি তুষারপাত শুরু হল। শীতার্ত ক্ষুধাতুর ভয়কাতর পল্টন বরফের পর রেখে গেল রক্তের স্বাক্ষর। এদের পশ্চাদনুসরণের জন্য শিকারী কুকুর নিয়োগ করবার কোন আবশ্যক ছিল না। মহাদেশীয় ফৌজের চলার পথের যে অভিজ্ঞতা কর্ণঅয়ালিস সঞ্চয় করলেন, আমৃত্যু সে কথা তাঁর স্মরণে থাকবে। কিন্তু কোন উল্লাস বোধ করবেন না।

খরস্রোতা নদী পার হবার জন্য শীতার্ত সৈনিকদের আনাড়ী চেষ্টার ব্যর্থতা লক্ষ্য করে ভার্জিনিয়ান মনে মনে ভাবলেনঃ এখন যদি জেলেরা থাকতো! মাঝিগিরি জানে না কেউ। তবু আনাড়ীর মত হোঁচট খেয়ে নদী পার হবার অক্লান্ত চেষ্টায় অনেকেই হিমশীতল স্রোতের মধ্যে পড়ে গেল। গড়িয়ে গড়িয়ে কোনমতে তারা কামানগুলো নৌকায় তুলল। কিন্তু নৌকা উলটে সেগুলো যখন নদীগর্ভে তলিয়ে গেল, নিস্ফল ক্রোধে তারা শুধু অশ্রুবিসর্জন করল। বন্দুক ও বারুদ জলে ভিজে গেল। বৃটিশরা যদি সেই সময় তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, তাহলে বিনায়াসে চটপট বিপ্লব খতম করে দিতে পারত। সৈনিকদের মধ্যে কেউ কেউ গালাগাল দিতে লাগল। কেউ বা ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। এমন কি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোমর জলে দাঁড়িয়ে নক্স পর্যন্ত ক্ষোভে দুঃখে কষ্টে হাউ মাউ করতে লাগল।

তবু, বহু দুর্ভোগ, বহু কষ্ট করে আস্তে আস্তে তারা নদী পার হল। নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে অবশিষ্ট কামানের প্রায় সবকটি, কয়েকখানা গাড়ি, কয়েকটি ঘোড়া এবং যৎসামান্য মজুত খাদ্যও নিয়ে গেল ওপারে। ঘোড়া অবশ্য সবকটি পার করা গেল না।

ভার্জিনিয়ান বুঝতে পারলেন যে ভবিষ্যতে কোন কিছু করতে হলে এই সময় দুটি জিনিসের বন্দোবস্ত অবিলম্বেই তাঁকে করতে হবে। সৈনিকদের বিশ্রামের সুযোগ দিতে হবে এবং বৃটিশরা কাছাকাছির মধ্যে কোথাও যাতে নদী পার হতে না পারে সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যবস্থাও করতে হবে। উজান ও ভাঁটির পঁচিশ ত্রিশ মাইলের মধ্যে সমস্ত নৌকা যদি তিনি সরিয়ে আনতে পারেন, তাহলে বৃটিশদের কিছুকাল হয়ত দূরে সরিয়ে রাখা যাবে। অবশ্য কতদিন যে তারা আটকে থাকবে, তা জানেন না। কিন্তু দিন সাতেকও যদি

তাদের অগ্রগতি রুখে দেওয়া যায়, তাহলেও তিনি বেঁচে যান। হপ্তা দুয়েক রুখতে পারলে তো কথাই নেই। এই সংকল্প করে নদীর উজানে ও ভাঁটিতে তিনি দু চারজন করে লোক পাঠিয়ে দিলেন। নৌকা দেখতে পেলেই হয় তারা এ পাড়ে নিয়ে আসত, আর তা সম্ভব না হলে ভেঙে চুরমার করে দিত।

আজাদী ফৌজ দেলওয়ারে পার হল। রারিটানের মত এবারেও একটু-খানির জন্য তারা রক্ষে পেয়ে গেল। কেননা শেষ নৌকাখানি জার্সির তীর ছেড়ে আসবার পূর্বেই হাইল্যান্ডারদের বাঁশীর সুর তাদের কানে পৌঁছুল। নদীর পশ্চিম পাড়ে আগুন জেলে চারপাশে গুটিসুটি হয়ে বসে শীতার্ত গণসেনা দেখল যে, পূব পাড়ের যে জায়গাটা খানিক আগে তারা ছেড়ে এসেছে, কর্ণঅয়ালিসের লাল-কোটয়ালা সৈন্য, ঘাঘরাপরা হাইল্যান্ডার এবং সবজে উর্দি-পরা হেসিয়ানরা সেই দিকেই মার্চ করে এগিয়ে আসছে। হাজার হাজার নিয়মিত বৃটিশ সৈনিকের উর্দির চেকনাই...তাদের মার্চ করবার নিখুঁত ভঙ্গী . .নদীতীরে আপনা থেকে সুশৃংখলভাবে সার বেঁধে দাঁড়াবার কায়দা ..মেঘাচ্ছন্ন কালিমাখা শীতের আকাশের পটভূমিকায় বিপদসংকেতের মত পদাতিকদের অনুবর্তী শত শত কামানের ঘর্ঘর শব্দ.. অগুণতি রসদের গাড়ির মিছিল... বাঁশীওয়ালাদের সমবেত সংগীত ..ব্যাঙের ছাতার মত যত্রতত্র একসংগে গজিয়ে ওঠা সাদা তাঁবু...এ পাড়ের শীতকাতর অর্ধনগ্ন ভীতিবিহ্বল বুভুক্ষু মহা-দেশীয়দের চোখের সামনে এক বিভীষিকাময় দৃশ্য তুলে ধরল। নদীতীরে মার্চ করতে করতে বাঁশীওয়ালারা ব্যংগ করে বাজাচ্ছেঃ টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে ইয়াংকি বাবু গেলেন লণ্ডনে।

খানিকবাদে সূর্য হেলে পড়তেই মেঘের প্রাচীরে চিড় খেল এবং সেই ফাটলের মধ্য দিয়ে চুঁইয়ে এক ঝলক আলো এসে পড়ল বৃটিশ ছাউনিতে। তখন এই আলোকস্নাত অপূর্ব দৃশ্যটি অসম্ভব ও কাল্পনিক বলে মনে হল।

প্রধান সেনাপতি, নক্স, গ্রীন, পুটনাম, মিফলিন ও মার্কার এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল। নক্স বল্লেঃ জীবনে আমি এমন দৃশ্য দেখিনি।

—ভারী সুন্দর! বড় আদমী আস্তে আস্তে বল্লেন।

—তবুও আমরা চলেছি। মিফলিন ভাবল।

—ইংরেজদের অভিপ্রায় আমি বুঝতে পারিনি। নক্স বল্লে ভয়কম্পিত সুরে।—আজ কতদিন হলো আমরা ওদের সংগে লড়াই করছি এবং একটানা পালিয়ে চলেছি। কিন্তু ব্যাপারটা যে এত ঘোরালো হবে, আগে বুঝতে পারিনি। জানবো কি, কোনদিন চিন্তাই তো করিনি।

—চিন্তা করেই বা লাভ কি? বিরক্তভাবে মার্কার বল্লে।—আমাদের সামনে অমনিভাবে দাঁড়ানো ওদের কৌশল। ভেবে কিছু লাভ হবে না।

অগ্নিকুণ্ড ফেলে সৈনিকরা নদীর পাড়ে জটলা করে দেখছিল বৃটিশদের। তাদের দিকে ইঙ্গিত করে গ্রীন বল্লেঃ ওপারের দৃশ্য দেখলে ওদের মনটা খুব খুশী হবে না।

—নিশ্চয়! ভার্জিনিয়ান সায় দিয়ে বল্লেন।—নদীর পাড় থেকে অন্তত মাইলখানেক দূরে আমরা ছাউনি ফেলবো।

—তবু দৃশ্যটা দেখতে পেয়ে আমি খুশীই হয়েছি। গম্ভীরভাবে নক্স বল্লে।—আমার বিশ্বাস, যাদের সঙ্গে লড়াই করছি কিম্বা যাদের ভয়ে পালাচ্ছি, তাদের চিনতে পারলে ভালোই হয়।

পরদিন সকালবেলা ভার্জিনিয়ান ও গ্রীন একসঙ্গে নদীর উজানে মাইল দশেক ঘোড়ায় চড়ে গেলেন। ওপারে বৃটিশ টহলদারও বেরুল নৌকার খোঁজে।

—একখানা নৌকাও পাবে না। খানিকটা সন্তুষ্টভাবে বড় আদমী বল্লেন।

—তা পাবে না! কিন্তু ওরা যদি ত্রেঞ্চ-টাউন অবধি এগিয়ে যায়?

—সে অনেক পথ। শীতটা আমাদের মত ওদেরও ভালো লাগবে না।

—তাহলে আমাদের এই ভাবে ছেড়ে দিয়ে তো আর চলে যেতে পারে না।

—কেউ কেউ যাবে, কেউ হয়তো থাকবে!

—নদী পার হতে কিছুতেই পারবে না ওরা। নিজেকে প্রবোধ দিল গ্রীন। তারপর চিন্তিত ভাবে বল্লেঃ কিন্তু পার হতে পারলে বিপদ আছে।

কাজে কিম্বা বাক্যে বিপ্লবকে এতকাল যারা সমর্থন করে এসেছে, ফিলাডেলফিয়ার সেই দেশ-প্রেমিকেরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। এককালে সৌভ্রাত্র-বন্ধনে আবদ্ধ শহরটির সে চেহারা বদলে গেছে। বহুদিন পূর্বেই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে। সত্য বটে মহাদেশীয় কংগ্রেসের অধিবেশন এইখানেই হয়েছিল। এই শহরেই স্বাক্ষরিত হয়েছিল স্বাধীনতার সনদ। তথাপি ফিলাডেলফিয়ায় এখন বিদ্রোহীর চাইতে টোরীদের সংখ্যা বেশী। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া টোরীরা দুটি চরমপন্থী দলে ভাগ হয়ে পড়েছিল। একপক্ষে ছিল খানদানী পরিবার, ধনী, শাঁসাল অভিজাতেরা। অপর পক্ষে জমায়েৎ হয়েছিল যত অধঃপতিত ভবঘুরে পরগাছার দল—সমাজের যত গাদ ও গাঁজলা। কোয়েকাররা সাধারণতঃ দূরে সরেছিল। কিম্বা দু'চারটি ব্যতি-

ক্রম ছাড়া টোরীভাবাপন্ন ছিল। এই দুই দলের মাঝখানে বিপ্লবকে বাঁচিয়ে রেখেছিল মধ্যবিত্ত কারিগর কর্মকার রাজমিস্ত্রী দোকানদার মুদ্রাকর নাবিক ছোটখাটো বেপারী দেরাজ ও চাকাওয়ালা, নলওয়ালা কাচওয়ালা বস্ত্রবিক্রেতা জাঁতাকলওয়ালা ছুতোর এবং শুঁড়ি। আর এদের সঙ্গে জুটেছিল কিছু চোরাকারবারী, দলদস্যু এবং সরকারী সনদপ্রাপ্ত বে-সরকারী রণতরীর কিছু নৌ-সেনা। এই পাঁড়মাতাল ইতর গুণ্ডাদলের আড্ডা ছিল দেলওয়ারে উপকূলে।

টোরীরা এতকাল নীরবে সুযোগের প্রতীক্ষা করছিল। তারা জানত যে বৃটিশরা অচিরেই মহাদেশীয় জনতাকে ধুলোর মত উড়িয়ে দেবে। কিন্তু কোন সংগঠন ছিল না তাদের। বিদ্রোহীদের হাতে ছিল গণসেনা, মুরদ তার যাই হোক। ইদানীং ভার্জিনিয়ানের পরাভূত পল্টন থেকে মিফলিন এসে ধমকে শাসিয়ে অনুরোধ করে বিদ্রোহী গণসেনার অর্ধেক নিয়ে চলে গেছে। এইটেই চেয়েছিল টোরীরা।

সহসা তারা উপলব্ধি করল যে তাদের দিন এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে সাহসও বেড়ে গেল। নির্ভয়ে আত্মপ্রচার করল। দরজা-জানালা বন্ধ করে তারা চাকর-বাকরদের অস্ত্রসজ্জিত করল। এক মগ রাম আর দু একটা রূপার শিলিংয়ের বিনিময়ে সহজেই যাদের কেনা যায়, শহরের সেই গাদ ও গাঁজলার হাতে হাতিয়ার তুলে দিল। সংখ্যাহানির দরুণ শান্তিহীন গণসেনা বেশ বুঝতে পারল যে মহাদেশীয় ফৌজ ভেঙে পড়ছে। টোরীদের বিরুদ্ধে কোন কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তারা স্বভাবতই ইতস্তত করল। গুজব রটে গেল যে দেলওয়ারে নদী বরাবর নৌবহর নিয়ে এসে ইংরেজরা শহর দখল করবে। যদি সত্যিই তাই হয়, তাহলে তাদের ঘরবাড়ী পরিবার-পরিজনের কি দশা হবে? এইভাবে ফিলাডেলফিয়া দুটি সশস্ত্র শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু বিপক্ষকে আক্রমণ বা ঘায়েল করবার সামর্থ্য ছিল না কোন পক্ষের। মহাদেশীয় কংগ্রেসের সদস্যদের বিমূঢ় দৃষ্টির সম্মুখে কেবল প্রাণদণ্ডিতের মিছিল এবং পাইকারী ফাঁসির ছবিই ফুটে উঠল। হতবুদ্ধি হয়ে তাঁরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁরা কার্যপদ্ধতি বদলে দিলেন। এতদিন পর্যন্ত ওয়াশিংটনই তাঁদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে এসেছেন। এখন কংগ্রেস উলটে তাঁর কাছে সাহায্য পাঠাবার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতে লাগল।

—আমি কি করতে পারি? পুটনামকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।—পাঠাবার

মত কোন লোকই আমার হাতে নেই। তোমাকেই ওখানে যেতে হবে ইস্রায়েল। ওখানকার গণসেনা দিয়ে কতোটা কি করা যায় দেখোগে।

পুটনাম বৃদ্ধ হয়েছেন, তায় আবার রুগ্ন ও ক্লান্ত। রাত্রে নিজের খামারের স্বপ্ন দেখে কঁকিয়ে কেঁদে ওঠেন।

—আর কার উপর আমি নির্ভর করতে পারি বলো! খিটখিটে মেজাজে বল্লেন বড় আদমী। আমি জানি ইস্রায়েল, তুমি ক্লান্ত। শহরে গেলে হয়তো বিশ্রাম করবার সুযোগ তুমি পাবে।

—বিশ্রাম যা হবে, বুঝতে পারছি। বিমর্ষভাবে পুটনাম বল্লেন। সেখানে গিয়ে আমায় নরকের মধ্যে পড়তে হবে। যা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে, ওরা সবাই ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন। সে ক্ষেত্রে আমি গিয়েই বা কি করবো?

—যাই করো, কিছু না করার চাইতে তো তা ভালো হবে!

—ইংরেজরা যদি সত্যিই এসে পড়ে! পুটনামের আপত্তির সুর তখন নরম হয়েছে। তবু অপ্রসন্নভাবে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

—যতটা পারো লোকজন আর রসদ সংগে নেবে, তারপর পিছু হটবে।

—আমি এত ক্লান্ত যে আর পারছিনে। অনুযোগের সুরে পুটনাম বল্লেন। —শরীর আপনারও ভালো না; কিন্তু আপনাকে তো বাতে কষ্ট পেতে হয় না!

—দুর্দিন কাটিয়ে দেবার জন্য নিয়তই ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি। শান্তভাবে শিয়াল-শিকারী বল্লেন। —তোমার জন্যই প্রার্থনা করছি ইস্রায়েল। আর সবাইর মত তোমার বয়স কম নয়। কিন্তু আমার বয়সও কম হলো না। দেহ যখন বশে থাকে না তখন যে কি অবস্থা হয়, আমিও কতকটা বুঝি।

—শুরু হবার সময় ব্যাপারটা এত সহজ ছিলো! ক্ষুণ্ণভাবে বল্লেন পুটনাম।

—সব কিছুর আরম্ভই সহজ!

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গজগজ করতে করতে পুটনাম ঘোড়ায় চড়ে চলে গেলেন। কিন্তু ফিলাডেলফিয়া পৌঁছে তিনি দেখলেন যে গবর্নমেণ্টের নথিপত্র যা কিছু অবশিষ্ট ছিল, সব একখানা গাড়িতে বোঝাই করে কংগ্রেস ইতিপূর্বেই বালটিমোর চলে গেছে। পুটনামের সর্বাংগ বেদনায় টনটন করছিল। তবু এক জায়গায় বসে তিনি প্রধান সেনাপতির কাছে পত্র লিখলেন।

গলায় পশমী মাফলার জড়িয়ে, চশমাটা আলগাভাবে নাকের ডগায় ঝুলিয়ে ভার্জিনিয়ান বসেছিলেন আগুনের চুল্লীর সামনে। মাথায় ছিল পুরনো আঁটসাট একটা টুপী। সদর কার্যালয় হিসাবে বড় আদমী যে ভাঙাচুড়া

কুঁড়েখানি ব্যবহার করছিলেন, কিছুতেই তা গরম হতে চায় না। সর্দি লেগে প্রধান সেনাপতির চোখ লাল এবং নাকটা চকচকে হয়েছে। অনবরত হাঁচছেন তিনি। গ্রীন ঘরে ঢুকতেই হাতের ইশারায় একখানা নড়বড়ে চেয়ার দেখিয়ে বল্লেনঃ বসো নাথানেল। এই চেয়ারখানি এবং লিকলিকে একখানা টেবিল ছাড়া আর কোন আসবাবপত্রই ছিল না ঘরে।

—ফ্লিপটা সর্দির পক্ষে খুব উপকারী স্যর! গ্রীন বল্লে।

—আর কত ফ্লিপ একটা লোকে খেতে পারে বলো! প্রায় সেরটাক খেয়েছি, কিছুই হলো না।

সন্তর্পণে চেয়ারে বসে সহানুভূতির ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল গ্রীন। ঠান্ডা তারও খুব লেগেছে। আগুনের এত কাছে সে ঘেঁসে বসল যে লকলকে আগুনের শিখা তার হাঁটু ছোঁব ছোঁব হল।

—এই, আগুন ধরে যাবে। লম্বা আদমী সাবধান করে দিলেন।

—ধন্যবাদ, স্যর! এদিকে বড় গা কামড়ানে শীত—বড্ড বেশী আর্দ্রতা। কেন তাকে ডেকে পাঠান হয়েছে শুনবার আগ্রহে হাঁটুদুটো জোড়া করে দুহাতে চেপে বসে রইল গ্রীন।

—কংগ্রেস চলে গেছে ফিলাডেলফিয়া ছেড়ে। লম্বা আদমী বল্লেন।

—সে কি?

—ঠিকই করেছে। যতদিন গবর্ণমেন্টের অস্তিত্ব থাকে ততদিনই বিপ্লব বেঁচে থাকে। বন্দী হবার চাইতে পালিয়ে যাওয়া বরং ভালো।

—কোথায় গেলো?

—বোধ হয় বাল্টিমোরে। মাঝে মাঝে আমার শংকা হয়, ওরা হয়তো হাল ছেড়ে দিয়েছে।

গ্রীন কোনদিনও ভার্জিনিয়ানকে এতটা ক্লান্ত, এমন বিমূঢ় হতে দেখেনি। তিনি যেন অনেকটা বুড়িয়ে গেছেন। বুকপকেটে একখানা পত্র খুঁজতে গিয়ে তাঁর বিরাট হাতখানা ঈষৎ কেঁপে উঠল। এমন ভঙ্গীতেও কোনদিন কথা বলেননি তিনি। তাঁর কন্ঠস্বরে আভিজাত্যের গর্ব বা কর্তৃত্বের লেশমাত্র ছিল না।

—কারা স্যর? ভাঙ্গা গলায় জিজ্ঞাসা করল গ্রীন।

—কংগ্রেস।

ঘাড় ঝেঁকে আপত্তি জানাল গ্রীন।

—সব কিছু তারা আমার উপর ছেড়ে দিয়েছে। ব্যথিতকণ্ঠে বল্লেন বড় আদমী।

—আর কি ছেড়ে দিলো স্যর?

—গবর্ণমেন্ট। কিন্তু আমি তো কোনোকালেই এ কর্তৃত্ব চাইনি। একলার কাঁধে আর কত বোঝা বইবো বলো?

গ্রীন একদৃষ্টে চেয়ে রইল তাঁর দিকে।

—শোনো, পড়ে শোনাচ্ছি তোমাকে। চশমার মধ্য দিয়ে চিঠিখানির দিকে চেয়ে তিনি পড়লেন— 'তাহারা (কংগ্রেস) ভিন্নরূপ আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত সরকারী দপ্তর ও যুদ্ধপরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব জেনারেল ওয়াশিংটনের উপর অর্পিত হইল ..।"

— এ ক্ষমতা যদি আর কোনো লোককে দেওয়া হতো তাহলে সত্যিই চিন্তিত হতাম। কিন্তু এ তো আপনাকেই দিয়েছে স্যর! তবে আর ভয় কিসের? গ্রীন বাধা দিয়ে বল্ল।

—ব্যাপারটা তা নয়! তাতে এমন কিছু এসে যায় না। কিসের জন্য আমরা লড়ছি বলো? আমরা কি একটা জাতির উপর একজনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করছি?

—ভগবানের নামে হলপ করে বলতে পারি, বিশ্বাস করুন, ও ভয় আমি করি না সার! কিন্তু কেন ওরা দিল বলতে পারেন?

—ওরা ভেবেছে সব শেষ হয়ে এসেছে, তাই খড়কুটো আঁকড়ে ধরছে।

—আপনারও বিশ্বাস, সব শেষ হয়ে এসেছে? মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল গ্রীন।

—জানি না। বড় আদমী বল্লেন।—বলতে পারি না।

সেই হিমশীতল ঘরেই সমর মন্ত্রণা-সভার বৈঠক ডেকেছিলেন প্রধান সেনাপতি। গ্রীন, নক্স, মার্কার, মিফলিন, স্টার্লিং এবং জন ক্যাডোয়ালেডার বসেছিল তাঁর চারপাশে। পুটনামের প্রভাবে পড়ে ফিলাডেলফিয়ার তরুণ যুবক ক্যাডোয়ালেডার একদল স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে চলে এসেছে। কিন্তু দেলওয়ারে নদীতীরে যেসব দৃশ্য সে দেখেছে, তাতে রীতিমত ভড়কে গেছে যুবকটি। ক্যাডোয়ালেডারের পরনে অবশ্য ফিলাডেলফিয়ার দর্জির তৈরী আনকোরা স্যুট। কিন্তু তার পোশাক ছাড়া আর সবাইর পরিধেয় শতচ্ছিন্ন, তালি-লাগান। প্রধান সেনাপতির নীল কোট ও বাফ্ ব্রিচেজের অনুকরণে সবাই এবা সযত্নে উর্দি বানিয়েছিল। কিন্তু আজ সকলেরই পরনে পুরনো ব্রিচেজ,

গায়ে ব্যবহৃত বেমানান তাঁতেবোনা কোট। চরম দুর্দশাগ্রস্ত নোংরা এবং ভগ্নোৎসাহ যে জিনিসটিকে তারা পল্টন বলে ডাকেন, তার চেহারাও দেখেছে ক্যাডোয়ালেডার। আজকের এই বৈঠককে সমর মন্ত্রণা-সভা বলে গণ্য করা চরম হাস্যকর স্বপ্নের সামিল।

যে অবস্থায় তিনি সর্বময় কর্তৃত্ব পেয়েছেন তার বিবরণ শুনিয়ে বিনীত অনুনয়ের সুরে ভার্জিনিয়ান বল্লেনঃ বন্ধুগণ! এ আকাঙ্ক্ষা কোনদিনই আমার ছিলো না। বিশবাস করো, কোনোদিন চাইনি এ কর্তৃত্ব। আমাদের কংগ্রেসকে আমি সুমহান সাহসী প্রতিষ্ঠান বলেই গণ্য করি : এবং আমার সমস্ত কার্যের জন্য কংগ্রেসের কাছে দায়িত্বশীল বলে মনে করি। তাঁর কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গ বা তাচ্ছিল্যের বিন্দুমাত্র আভায় ছিল না।—এখনও নিজেকে আমি তার কাছে দায়িত্বশীল বলে গণ্য করবো। কোনো অবস্থাতেই এর নড়চড় হবে না। যে মহান উদ্দেশ্যের জন্য কংগ্রেস কাজ করে যাচ্ছে, তাতে সকলেরই তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত এবং তার সেনাবাহিনী, যা পরিচালনার গৌরব আমার উপর অর্পিত, সেই পল্টনকেও উদ্দেশ্যের যোগ্য হতে হবে। তবু সাময়িকভাবে নিজের দায়িত্বে কিছু কাজের ঝক্কি আমাকে নিতে হবে। কেনোনা কংগ্রেসের পক্ষে সে সব কাজ বিচার বিবেচনা করে দেখা অসম্ভব।

—এতকাল আমরা পিছু হটেছি শুধু সৈন্যবাহিনী বাঁচিয়ে রাখবার জন্য। সৈন্যবাহিনী বাঁচিয়ে রাখার অর্থ দেশকে বাঁচিয়ে রাখা। কিন্তু আজ আমরা এমন এক অবস্থায় এসেছি যখন আবার পশ্চাদপসরণ করতে গেলে যা আমাদের এখনও আছে তা-ও শেষ হয়ে যাবে। আমাদের এখন পালটা আঘাত হানতে হবে। জানি না, যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা লড়ছি পাল্টা আঘাতে তার নতুন অধ্যায় শুরু হবে, না সব চুকেবুকে যাবে। কিন্তু আঘাত আমাদের হানতেই হবে। আর বিলম্ব করলে সে সুযোগ কোনদিনই মিলবে না।

অপলক দৃষ্টিতে সেনানীরা চেয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে। প্রধান সেনাপতি কি সহসা পাগল হয়ে গেলেন নাকি? পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল সেনানীরা। সে দিকে লক্ষ্য না করে তিনি বলে চল্লেনঃ দুর্ভাগ্যবশতঃ, আমাদের দেশ ও কংগ্রেসের তেমন অর্থ নেই। যা ছিলো তা-ও ইতিমধ্যেই খরচ হয়ে গেছে। দেশের আরও কিছু শাঁসালো পরিবার যদি আমাদের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন, তাহলে হয়তো বা অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু আমাদের দলে যারা রয়েছে সাংসারিক

ধনসম্পদের দিক থেকে তারা গরীব। তা ছাড়া দেবার মত যা কিছু ছিলো. অনেকেই দিয়ে দিয়েছে। আমাকে ধনী বলে গণ্য করা হয়। আমার বিশ্বাস, কিছু অর্থ আমি সংগ্রহ করতে পারি। আমি জানি, খুব সামান্য কিছুই আছে তোমাদের। তবু আমার বিশ্বাস, যথাসাধ্য সাহায্য তোমরাও হয়তো করবে। কিন্তু সে যা-ই হোক্, পল্টনে নাম লেখাবার জন্য মানুষকে আকৃষ্ট করতে হলে বিভিন্ন কাজের জন্য আমাদের বিভিন্ন ধরণের বকশিশ ও পুরস্কার ঘোষণা করতে হবে। আমাদের বর্তমান দুর্দশার কথা নতুন করে বুঝিয়ে বলবার আবশ্যক বোধ হয় হবে না। কর্নেল ক্যাডোয়ালেডার সময়মত পৌঁছান সত্ত্বেও কয়েকদিন পরে আমাদের হাতে দু হাজার সৈনিকও থাকবে না। কিন্তু সেজন্য হতাশ হবার কোনো কারণ আমি দেখি না। বরং এই অবস্থায় দ্বিগুণ উৎসাহে অক্লান্ত চেষ্টা করবার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন হয়।

একটু থেমে তিনি ঘুরেফিরে সবাইর মুখের দিকে তাকালেন। নক্সের চোখ ভিজে উঠেছিল। কোনক্রমে গাম্ভীর্য বজায় রাখবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিল গ্রীন। স্টার্লিং শূন্যদৃষ্টিতে চেয়েছিল সামনাসামনি। চরম ব্যর্থতার ছবি ফুটে উঠেছিল মিফলিনের নিষ্প্রভ হতাশ দৃষ্টিতে।

—তোমরা সবাই আমার পুরনো সহকর্মী। মৃদুকণ্ঠে বল্লেন বড় আদমী। —চরম দুঃসময়ে আমার সংগে একসাথে যে বোঝা তোমরা বয়েছো, তার জন্য প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কথা শেষ করেই উঠে দাঁড়ালেন প্রধান সেনাপতি এবং ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলেন।

লী'র গ্রেপ্তারের সংবাদ নক্সকে সর্বপ্রথম গ্রীনই জানায়।

—বন্দী হয়েছে না আপদ গেছে! শূয়োরটাকে আমি ঘৃণা করতাম।

--কথাটা ওঁকে বলবে নাকি হ্যারি? গ্রীন জিজ্ঞাসা করে।

--ওঁর কাছে বলতে পারি না।

—তার পল্টনই বা গেলো কোথায়? পাঁচ হাজার লোকের পল্টন! হায় ভগবান, জেলেরাও রয়েছে সে দলে! তোমার মনে পড়ে হ্যারি, পেলস্‌পয়েণ্টে জেলেরা কি কাণ্ডটাই না করেছিলো? মনে রাখবার মতো ঐ একটি ঘটনাই তো আছে। কোথায় গেলো তারা?

—সংবাদদাতার কাছে কি শুনলে? সে সুলিভানের কাছ থেকে আসেনি? সুলিভানই তো এখন ওদের কমাণ্ডার, তাই না?

—সে তো বল্লে যে সুলিভান আরও খানিকটা উত্তরে নদী পার হবার চেষ্টা করবে।

—এ কদিন আগের কথা?

—দিন কয়েক হবে। কর্ণঅয়ালিস যদি তাদের বিচ্ছিন্ন করে না ফেলে থাকে, এতদিনে তাদের আসা উচিত ছিলো। আর তাই যদি হয়ে থাকে...। হতাশভাবে ঘাড় ঝাঁকাল গ্রীন।

—লী'র সংগে সরাইখানায় ছিলো কে? নক্স জিজ্ঞাসা করে।

—উইলকিনসন নামে একটা পাজী বজ্জাত। গেটসের লোক। আমি চিনি ব্যাটাকে। বয়স বেশী হয়নি, কিন্তু নেহাৎ বাজে ছেলে। সে বল্লে কিনা, সে লড়াই করতে চেষ্টা করেছিলো! কিন্তু আমি হলপ করে বলতে পারি, ডাহা মিথ্যা কথা। সত্যিই যদি সে সরাইখানায় থেকে থাকে, তাহলে আমি জানি, কেন সে সেখানে গেছলো।

—সংবাদ শুনে উনি কি করলেন? মাথার ইশারায় ভার্জিনিয়ানের সদর-ঘাঁটি দেখিয়ে নক্স জিজ্ঞাসা করল।

—তোমার কি মনে হয় হ্যারি? কি করতে পারেন?

—জানি না। তবে আমার মনে হয়, পল্টনের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

---মোটেই না। বিরক্তভাবে গ্রীন বল্লে।—তিনি ভাবছিলেন লী'র জন্য। আমি তোমাকে বলছি হ্যারি, লী বন্দী হওয়ায় উনি ভেংগে পড়েছেন। বুঝলে? কেন? কারণ তিনি একজন সহকর্মী, একজন মহান নেতা এবং নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক হারালেন। সংবাদ শুনেই লী'কে বিনিময় করবার উদ্দেশ্যে কর্ণঅয়ালিশের কাছে দূত পাঠিয়েছেন। লী'র বিনিময়ে বৃটিশ পক্ষের যত লোক আমরা বন্দী করেছি, প্রায় সবাইকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন। শুধু কি তাই? কি দিতে চান নি বলো! লী'কে ফাঁসি দেওয়া হলে কত কী যে করবেন বলে ভয় দেখিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই।

—কেনো? সরলভাবে জিজ্ঞাসা করে নক্স।

—জানি না। ওর মনের কথা বুঝবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছি। ঐ পদে যদি আমি থাকতাম...

—লী'কে ওরা ফাঁসি দেবে বলে মনে করো কি?

--দিতে পারে। জানো না, লী এককালে বৃটিশ ফৌজদার ছিলো!

চারদিন পরে, বিশে ডিসেম্বর, লী'র ছিন্নভিন্ন, ক্রেশজর্জ'র পল্টনের অবশিষ্ট সৈনিকেরা দেলওয়ারে নদীতীরের ছাউনিতে হাজির হল। হোয়াইট-প্লেইনসে পাঁচ হাজার ইয়াংকি ফৌজের যে পল্টন লী পরিচালনা করেছিলেন, সেই বাহিনীতে এখন দু হাজার সৈনিকও অবশিষ্ট নেই। দারুণ শীতে এই ইয়াংকিরা নীলচে বিবর্ণ হয়ে গেছে। সবাইর পরিচ্ছদ শতচ্ছিন্ন। কারও পা কেটে গেছে। কারও থেঁতলেছে। দরদর ধারায় রক্ত পড়ছে কারও পা দিয়ে। পা টেনে ছাউনিতে ঢুকে অন্ধের মত হুড়মুড়ি খেয়ে অনেকেই ছুটল আগুনের দিকে। দুচার জন পড়ে গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে অচৈতন্য হল। বৃটিশদের ভাঁওতা দেবার জন্য পুরো এক সপ্তাহ তারা এঁকেবেঁকে পালিয়ে বেড়িয়েছে। কিন্তু ধরা দেয়নি। শেষ পর্যন্ত শত্রুর বেষ্টনী পার হয়ে এরা যে আসতে পেরেছে, এই পরম আশ্চর্যের বিষয়। এদের দলে একমাত্র মার্বলহেডের জেলেদের কোম্পানীর মধ্যেই খানিকটা শৃংখলা বা আশার আলো চোখে পড়ে। জেলেদের নীল জ্যাকেট ছেঁড়া নেকড়া হয়ে গেছে। পায়ে জুতো নেই কারও। তবু এখনও তারা জোট ভাঙেনি। তাদের বিশীর্ণ লম্বা ইয়াংকি মুখ আগের চাইতে আরও দৃঢ়ভামণ্ডিত, আরও কঠোর দেখাচ্ছে।

ক্লান্তি ও অনিদ্রায় টলতে টলতে একগাল দাড়িগোঁফ নিয়ে রক্তচক্ষু বিভ্রান্তদৃষ্টি সুলিভান হুড়মুড় খেয়ে ভার্জিনিয়ানের সামনে গিয়ে বল্লেঃ আমায় মাফ করতে হবে স্যর! কিছু কাপুরুষ আসবার পথেই ভেগে গেছে।

পুনরায় দেলওয়্যারে অতিক্রম

এক কলসী গরম ফ্লিপ সামনে নিয়ে বহুদিন পরে গ্লোভার ও ভার্জিনিয়ান আবার মুখোমুখি বসলেন। দুজনের হাতেই পূর্ণপাত্র। গ্লোভার বিশ্রাম করে কামিয়ে নিয়েছে। আগের চাইতে অনেক শীর্ণ দেখাচ্ছে শিয়াল-শিকারীকে। গাল বসে গেছে। চোখের নীচে গভীর কালির পোঁচ। উভয়েই উভয়ের পরিবর্তন লক্ষ্য করল। নতুন পরিবেশ উপলব্ধি করে দুজনেই সহজভাবে মেনে নিল এই অপরিহার্য রূপান্তর। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের শীতের প্রভাব কতকটা কাটিয়ে উঠেছে গ্লোভার। মানুষের অন্তরের নগ্ন মূর্তি সে দেখেছে। পেলস্‌পয়েণ্টে যে করুণ ছবি সে দেখেছিল, এ দৃশ্য তার চাইতেও মর্মান্তিক। শিয়াল-শিকারীর মতই সে পথ বেছে নিয়েছে। যতদূর প্রয়োজন সেই পথে চলতে সে বদ্ধপরিকর। দুজনেই সমবয়সী। উভয়ের প্রকৃতিতে খানিকটা মিল থাকলেও, অমিলও ছিল প্রচুর। গ্লোভার স্পষ্টই বুঝতে পারল যে, শিয়াল-শিকারীর মধ্যের অভিজাত মানুষটি মরে গেছে। ঠিক উপলব্ধি করতে না পারলেও, তার মনে হল যে, টেবিলের বিপরীত দিকে বসা মানুষটির মধ্যে এক বিস্ময়কর নতুন গর্ব ও নয়া আদর্শবাদ দানা বেঁধে উঠছে। উভয়েই তারা নিঃসঙ্গ। পরস্পরের সান্নিধ্যেও এই নিঃসঙ্গতা দূর হবার নয়। তবু এই একাকীত্ব সত্ত্বেও পরস্পরকে বুঝতে তারা ভুল করল না।

হাতের গ্লাশে চুমুক দিয়ে শিয়াল-শিকারী বল্লেনঃ তোমাকে দেখে বড্ড খুশী হয়েছি কর্ণেল। কতোদিন পরে দেখা হলো!

সবিনয়ে মাথা নাড়ল গ্লোভার। তার গম্ভীর মুখে মৃদু হাসিরেখা ফুটে উঠল।

—প্রথমদিকে জেলেদের আমি হিসেবের মধ্যেই ধরিনি। আধাপরিহাসচ্ছলে বল্লেন শিয়াল-শিকারী।—বুঝতে পারিনি যে আমার জীবন, আমার পল্টন, আমার জাতির আদর্শ তাদের উপর এতোটা নির্ভর করবে।

—আপনি মহান স্যর! গ্লোভার বল্লে। তার কোঁচকান রোদে-পোড়া মুখে খুশীর আমেজ দেখা দিল।

—তোমার কাছে আমরা অশেষ ঋণী।

—না না, তেমন আর কি। বিচলিতভাবে জবাব দিল গ্লোভার।

—যাই হোক, তুমি এখানে এসেছো এইটেই বড় কথা। দ্যাখো, প্রশংসা করবার ভাষা কোনদিনই আমার তেমন আসে না।

—আমিও প্রশংসায় খুব স্বস্তি বোধ করি না স্যর!

গ্লাশের ফ্লিপ শেষ করে শিয়াল-শিকারী বল্লেনঃ আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে ।

ইয়াংকি কর্নেল আরও খানিকটা ঝুঁকে বসল। ,

—ড্যানি, পাগলামি...বহুৎ ঝঞ্ঝাট .। দুজনের গ্লাশেই আরও খানিকটা ফ্লিপ ঢাললেন তিনি। তারপর উষ্ণ কড়া রামের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে বল্লেনঃ তোমায় আমার দরকার আছে। তুমি না থাকলে সে কথা চিন্তা করাও অর্থহীন।

—দেলওয়ারে পার হবার কথা? চাপা গলায় বল্লে গ্লোভার। তার কণ্ঠে সংশয় ছিল না, ছিল কিছুটা শংকা।

শিয়াল-শিকারী মাথা নাড়লেন।

তখন মার্বলহেডের লোকটি হেসে বল্লেঃ আমি বুঝতে পেরেছিলাম। বুঝেছিলাম, তাই হবে। তাছাড়া আর কি হতে পারে বলুন?

মনের কথা সাজিয়ে গুছিয়ে চটপট প্রকাশ করতে কোনকালেই তিনি পারেন না। তবু আজ স্বচ্ছন্দভাবে বলে চল্লেনঃ বৃটিশরা চলে গেছে। নিউইয়র্কে গা সেঁকতে গেছে জার্মানদের রেখে। আমাদের তারা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। ভালোই হলো, জ্যাগারদের সঙ্গেও আমাদের একটা মোকাবিলা হওয়া দরকার! অনেক কিছুর শোধ নিতে হবে।

প্রধান সেনাপতির কথায় এমনি উচ্ছ্বাসিত ভাবাবেগ, কোনদিন কারও নজরে পড়েনি। মনের এদিকটা তিনি চাপা রেখেছিলেন। তাই শুধু গ্লোভার নয়, কেউই এতকাল টের পায়নি। কিন্তু বাঁধ আজ ভেঙে গেল। উচ্ছ্বাসভরা কণ্ঠে তিনি বলতে লাগলেনঃ খুন করাই যাদের পেশা, সেই জ্যাগারদের ওরা নদীর ওপারে রেখে গেছে। নিজেদের দেশ যুদ্ধে লিপ্ত বলে এরা যুদ্ধ করছে না। কোনো কিছু রক্ষার জন্যও লড়াই করছে না এরা। ঘৃণার বশবর্তী হয়ে অথবা বিদ্বেষের বিরুদ্ধাচরণের জন্যও এরা

আসেনি। এরা লড়াই করছে বেতনভুক ভাড়াটে বলে। ক্লিপহাউজেন ওপারে আছে। তার সঙ্গেও আমাদের একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার। বলতে বলতে সহসা থেমে গেলেন তিনি। এই আকস্মিক ভাবোচ্ছ্বাসে তাঁর দম ফুরিয়ে গেল। খুক খুক করে কাশতে লাগলেন শিয়াল-শিকারী।

—কবে পার হতে চান? গ্লোভার জিজ্ঞাসা করে।

—বড়দিনে। লম্বা আদমী ধীরভাবে জবাব দিলেন। দমকা উচ্ছ্বাস কেটে গিয়ে আবার তিনি শান্ত হয়েছেন। আবার ফিরে এসেছে তাঁর কঠোর কাঠিন্য।

যুক্তি তর্ক নিয়ে কোনদিনই মাথা ঘামায় না গ্লোভার। চেয়ারে ঠেস দিয়ে আধ-বোজা চোখে সে কাজটা নিষ্পন্ন করবার কথা ভাবতে লাগল। তার ভাব দেখে মনে হল যে, পরাভূত, অর্ধাশনক্লিষ্ট, ন্যূনতম অস্ত্রশস্ত্রহীন এক জনতার পক্ষে প্রুশিয়ার সামরিক কলাকৌশলে সুশিক্ষিত ভাড়াটে এক বাহিনীর ছাউনি আক্রমণ করা বুঝি দুনিয়ার আর পাঁচটা ঘটনার মত নিতান্ত সহজসাধ্য ব্যাপার।

—কত লোক পার করতে হবে? সে জিজ্ঞাসা করে।

—তা, তখন আমাদের প্রায় হাজার পাঁচেক লোক থাকবে।

—এক রাত্রের মধ্যেই পার করতে হবে?

—কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হলেই ভালো হয়। বড় আদমী বল্লেন।

চোখ বুজে আস্তে শিশ্ দিতে লাগল গ্লোভার। গেলাশ তুলে দু এক চুমুক রামও খেল। তারপর টেবিলে টোকা দিতে দিতে চোখ বোজা অবস্থায় জিজ্ঞাসা করলঃ খাঁটি কি আপনি চান, আমায় বুঝিয়ে বলতে পারেন স্যর?

—আমি চাই নৌকোয় তুলে নদী পার করে, ওপারে গিয়ে সৈন্যদল পুনর্গঠন করতে এবং সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনটনের দিকে এগিয়ে যেতে। আমার ইচ্ছে, প্রথম থেকে শেষ অবধি অন্ধকারের মধ্যেই আক্রমণ চালানো হোক।

—তা হতে পারে। ভেবেচিন্তে বল্লে গ্লোভার।—এক জায়গাতেই...

—না, তিন জায়গায়। আমি যে পরিকল্পনা করেছি, তাতে একদল নামবে এখান থেকে নয় মাইল উজানে। একদল মাইলখানেক ভাঁটিতে এবং তৃতীয় দল নামবে বার্লিংটনে।

—তাহলে তো একটু মুস্কিল হয়ে পড়ছে! গ্লোভার বল্লে।—নৌকাগুলো কেমন?

—আমি তো আর জাহাজী নই যে বলতে পারবো! শিয়াল-শিকারী

বল্লেন। —নদীর ভাঁটিতে ও উজানে মাইলের পর মাইল জুড়ে বাঁধা রয়েছে। সবই এপারে। তা সংখ্যায় কম হবে না! নদীতে যতো নৌকো পেয়েছি সবই নিয়ে আসা হয়েছে।

অপলক দৃষ্টিতে শিয়াল-শিকারী চেয়ে রইলেন গ্লোভারের দিকে। চেয়ারে ঠেস দিয়ে চোখ বুজে সে আবারও আঙুল দিয়ে টেবিলের পর টুক্‌টাক শব্দ করতে লাগল।

—তোমার কি মনে হচ্ছে? বড় আদমী জিজ্ঞাসা করলেন।

—তা হয়ে যাবে! টেনে টেনে বল্লে গ্লোভার। —কামান পার করতে হলে বজরা লাগবে। সারা রাত ধরে ডিঙি দিয়ে সেগুলো টেনে নিতে হবে। তা সে যাই হোক, কাজ আটকে থাকবে না।

—তোমার ওপর ভরসা করতে পারি?

—পারেন সার। গ্লোভার বল্লে। তারপর দুজনেই ঝুঁকে লিকলিকে টেবিলের উপর করমর্দন করল।

অবস্থার সামান্যই উন্নতি হল। ভার্জিনিয়ান সৈনিকদের গুণবার আদেশ দিলেন। গোণা-গুণতি করে দেখা গেল যে প্রায় হাজার পাঁচেক লোক আছে। তার মধ্যে সক্ষমের সংখ্যা আরও কম। উত্তরে শয়েলারের পল্টন থেকে চার রেজিমেণ্ট সৈন্য নিয়ে জেনারেল গেটস এদিকে রওনা হন। কিন্তু আসবার পথে হাজার দুয়েক দল ছেড়ে পালিয়ে যায়। এই নতুন পরিকল্পনার তোড়-জোড়ের সংবাদ যখন জেনারেল গেটসের কানে এল, সরাসরি ভার্জিনিয়ানের কাছে গিয়ে বল্লেনঃ আমি ফিলাডেলফিয়া যাবার ছুটি চাইছি স্যর!

—ফিলাডেলফিয়ায় যাবেন কেনো?

--চারদিকে যে পাগলামির কথা শুনছি, তার মধ্যে আমি থাকতে চাই না স্যর!

—ফিলাডেলফিয়া কিম্বা জাহান্নামে, যেখানে খুশী আপনি যেতে পারেন সার! ধীরভাবে বল্লেন বড় আদমী। —আমার কাছে দুই-ই সমান।

—আপনি যদি তা-ই মনে করেন, তাহলে আমার মনোভাবও আপনি বোঝেন বলেই আশা করি! জবাবে গেটস বল্লে।

উইলকিনসনও এসেছিল গেটসের সঙ্গে। লীকে বন্দী করবার সময় কেমন করে দুহাতে দুটো পিস্তল নিয়ে গোটা এক কোম্পানী বৃটিশ অশ্বা-রোহীকে সে রুখেছিল, ছাউনির সর্বত্র ঘুরাঘুরি করে উইলকিনসন কয়েক

পোঁচ রঙ চড়িয়ে তার পল্লবিত কাহিনী শুনিয়ে দিল। অনবরত বকর বকর করছিল ছেলেটি। সম্ভবত প্রধান সেনাপতি স্বয়ং কারসাজি করে লীকে ধরিয়ে দিয়েছেন, এমন প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত করতেও সে কসুর করল না। সবজান্তার মত মুচকি হেসে সে শুনিয়ে দিলে যে, খুব শীগগিরই হয়ত নতুন কমান্ডার নিযুক্ত হবে এবং সেই কমান্ডারের নাম যদি গেটস হয় তাহলে অবাক হবার কিছুই থাকবে না। এমন কথাও সে বল্লে যে, শিয়াল-শিকারী এবং হাউ'র মধ্যে বহু পত্রালাপ হয়েছে। সৈন্য বাহিনীর কোন একটা সংকটের উল্লেখ করে শুনিয়ে দিল যে, ওটা আকস্মিক দুর্ঘটনা বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনিবার্য পরিণতি নয়। ওর পেছনে একটা সুচতুর কারসাজি রয়েছে। ঘটনাটা সেই কারসাজির অঙ্গ।

একদিন উইলকিনসনকে খুঁজে বার করে ক্যাপ্টেন হ্যামিলটন বল্লেঃ তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে উইলকিনসন।

—মেজর উইলকিনসন বলো! ছেলেটি বল্লে।

সমবয়সী তারা। দুজনেরই বয়স উনিশ বছর। হ্যামিলটন সামান্য লম্বা, কিছুটা পাতলা। তার বেগনী চোখ দুটো সহসা প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। ঠোঁটে ফুটে উঠল বাঁকা হাসিরেখা। মাথা নেড়ে সায় দিয়ে সে বল্লঃ হাঁ, মেজর উইলকিনসন।

—কি চাও তুমি।

—আমি তোমাকে খুন করতে চাই। মুচকি হেসে বল্লে হ্যামিলটন। —কিন্তু এখনও তার ঠিক সময় হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।

—তোমার কি মাথা খারাপ নাকি?

—মোটেই না। মাথা বেশ ঠান্ডাই আছে মেজর। ভালো চাও তো, এখনও খসে পড়োঃ জেনারেল গেটসের সঙ্গে ফিলাডেলফিয়া চলে যাও!

—তুমি যদি দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে চাও তো...। মেজাজ দেখিয়ে বলতে শুরু করল উইলকিনসন।

—তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করবার ইচ্ছে আমার নেই। আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই, বুঝলে? বাধা দিয়ে হ্যামিলটন বল্ল এবং সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে হনহন করে চলে গেল।

পরদিনই গেটসের সঙ্গে ফিলাডেলফিয়া চলে গেল উইলকিনসন।

—একে যদি পাগলামি বলো তাহলে এই আমাদের শেষ পাগলামি জানবে।

গম্ভীরভাবে ভার্জিনিয়ান বলছিলেন। —তোমরা শোনো, না ভেবে চিন্তে চট করে এ সিদ্ধান্ত আমি করিনি। এর জন্য বহু ঘণ্টা আমাকে ভাবতে হয়েছে। নিজের সঙ্গে রীতিমত লড়াই করতে হয়েছে। কংগ্রেস আমার ওপর যে ক্ষমতা অর্পণ করেছে, খামখেয়ালী করে সে ক্ষমতা আমি প্রয়োগ করবো না। বহু চিন্তাভাবনা করে একান্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই আমি সে ক্ষমতা ব্যবহার করবো। আজ আমাদের প্রয়োজন যে কত জরুরী, তা বলাই বাহুল্য। খেলা শেষ হয়ে গেছে। একদিন আমি তোমাদের বলেছিলাম যে প্রয়োজন হলে সৈন্য-বাহিনী এবং আমাদের কংগ্রেসের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য আমরা হাজার হাজার মাইল পশ্চিমে হটে যাবো। কিন্তু কংগ্রেসের আস্থা আমরা রক্ষা করতে পারিনি। আমরা তাদের রক্ষা করতে পারিনি বলেই শহর ছেড়ে কংগ্রেসকে আজ আমাদেরই মত ছুটতে হচ্ছে। তাছাড়া, হাজার মাইল তো দূরের কথা, আজ আমরা যদি আর একশো মাইল হটে যাই, তাহলেও আমাদের পল্টন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

সবাই ছিল তাঁর সামনে। গ্রীন, সুলিভান, নক্স, মার্কার, স্টার্লিং, পুটনাম, মিফলিন, গ্লোভার—সবাই দাঁড়িয়েছিল তাঁর মুখোমুখি। রীড এবং ক্যাডোয়ালেডার ইতিপূর্বেই বার্লিংটন চলে গেছে। ইতিমধ্যেই এই পরি-কল্পনার কথা জানান হয়েছে তাদের। কমাণ্ডারের অবশিষ্ট সঙ্গী যারা ছিল, সকলেই গম্ভীরভাবে শুনল। সব দিক বিচার করে পরিকল্পনাটি তাদের কাছে সর্বনাশের সমন বলেই মনে হল।

—সময়ও আমি ঠিক করে ফেলেছি। প্রধান সেনাপতি বলে চল্লেন। বড়দিনের রাত্রে- -দিনের আলো দেখা দেবার এক ঘণ্টা পূর্বে আমরা আঘাত হানবো।

সকলেই উৎসুকভাবে চাইল তাঁর দিকে।

--কেনোনা জ্যাগররা তখন মদের নেশায় চুর হয়ে থাকবে। বুঝিয়ে বল্লেন তিনি।

--এই অনুমানের পর খুব ভরসা করা যায় কি স্যার? কে একজন বলে উঠল।

—কোনো কিছুর উপরেই আমরা ভরসা করতে পারি না! কোনো আশাও করতে পারি না আমরা। এসপার ওসপার করা একান্ত প্রয়োজন বলেই আমরা এগোচ্ছি।

—কামানের কি করবো স্যার? নক্স জিজ্ঞাসা করে।

—কেনো বোলটা তো আছে।

—আঠারোটা স্যর! জেনারেল পুটনাম ফিলাডেলফিয়া থেকে দুটো বারো-পাউন্ডার নিয়ে এসেছেন।

—সবকটাই পার করবার চেষ্টা করবে হ্যারি। তিনি বল্লেন। —কর্নেল গ্লোভার বজরা জোগাড় করেছে। দিনের আলো কমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে তুমি ওগুলো নৌকোয় চড়াতে আরম্ভ করবে। চারটের পরেই কাজ শুরু করতে পারো। ঘোড়াগুলোও ওপারে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবো। সম্ভব হলে ওপারে গিয়ে একটি অশ্বারোহী দল গড়ে তুলবো। ফিলাডেলফিয়ায় বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কাজেই জেনারেল পুটনাম সেখানে ফিরে যাবে। বাকী আর সবাই আমার সঙ্গেই থাকবে। কাল আমার ঘড়ির সঙ্গে তোমাদেরটা মিলিয়ে নেবে। রাত্রে আমরা আলাদা হয়ে গেলেও ঠিক সময় মত কাজ করবার অসুবিধা হবে না।

সবাই গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল। ভয় তাদের ছিল না। কিন্তু কোন নবীন উৎসাহেও উদ্দীপ্ত হল না সেনানীরা। তারা বেশ উপলব্ধি করতে পারল যে. এইবার হয় নতুন অধ্যায় শুরু হবে, না-হয় এইখানেই সব শেষ!

শিয়াল-শিকারী বল্লেনঃ কর্নেল ক্যাডোয়ালেডার আমাদের কিছু মাদেরা এনে দিয়েছে। সেগুলো এখুনি আনাচ্ছি। আজ সবাই মিলে আমরা মদ্য-পান করবো। এসো!

পাঁচিশে ডিসেম্বর দ্বিপ্রহরেই গোটা শিবির কর্মচঞ্চল হয়ে উঠল। যেখানে যতটুকু নেকড়া-কানি বা কম্বলের টুকরো পাওয়া গেল তা-ই গায়ে জড়িয়ে মহাদেশীয় সৈনিকেরা শঙ্কিতভাবে সার বেঁধে দাড়াল। ফৌজদাররা বড় বড় গোল ঘড়ির দিকে চেয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। শরীর চাঙ্গা রাখবার জন্য সকলেই পা ঠুকছে, নড়াচড়া করছে, কিম্বা হাততালি দিচ্ছে।

দিনটি ছিল যেমন কনকনে তেমনি পাংশুটে। দিগন্তে জমেছিল মেঘের ভীড়। হাওয়া ছিল না। সব মিলে আসন্ন তুষারপাতের ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে। শীতের প্রকোপ তেমন প্রচণ্ড নয়। তবু এই হতভাগ্যদের কাবু করবার পক্ষে এই শীতই যথেষ্ট। সমস্ত নেকড়া-কানি গায়ে জড়াবার পরেও তারা অর্ধনগ্নই রয়ে গেল। তখন পর্যন্তও তারা সঠিক জানত না, কী তাদের করতে হবে। শুধু এইটুকুই শুনতে পেয়েছিল যে, জ্যাগারদের সঙ্গে একটা মোকাবিলা হবে। কথাটা পল্টনের মধ্যে রটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকদের মধ্যে ক্রোধ, ঘৃণা ও

আকস্মিক ত্রাসের সঞ্চার হল। পেনসিলভানিয়ার দেশগাঁয়ের একদল স্বেচ্ছাসেবী ঘাবড়ে গেল। দক্ষিণ জার্মানীর বাসিন্দা তারা। প্রুশিয়ান দস্যুদের ভয়-ভীতি থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্যই না তারা দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল! আজ আবার সেই জানোয়ারদের, সেই ভীতির সম্মুখীন হতে হবে? প্রুশিয়ানদের সম্পর্কে এই বিভীষিকা পুরুষানুক্রমে মজ্জাগত হয়ে গেছে তাদের মধ্যে। নয়া-ইংলণ্ডের বাসিন্দারাও ভয় পেল। যখনই জ্যাগারদের কর্কশ 'ইয়ংকি-ইয়ংকি' রণহুঙ্কারের কথা মনে পড়ল...চোখের সামনে ভেসে উঠল কিরীচ দিয়ে গাছের সঙ্গে এফোড় ওফোড় করবার বীভৎস দৃশ্য...মনে হল হাতিয়ার ও লাঠি দিয়ে খোঁচাতে খোঁচাতে জন্তুর মত হেসিয়ানদের জেলে পুরবার কথা, ভয় পেল তারাও। সমুদ্রের ওপারে হল্যাণ্ডে প্রতিনিয়ত যে ত্রাসের বিভীষিকার মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছে, জার্সির ওলন্দাজদের মনে হল সেই আতঙ্কের কথা। পেনসিলভানিয়াবাসীদের মনে পড়ল, আর শ' আণ্টেক পেনসিলভানিয়ান সৈন্যের নির্মম হত্যাকাণ্ডের কাহিনী। নিরাপদ আশ্রয় মনে করে ছুটে আসছিল তারা ওয়াশিংটন কেল্লার দিকে। কিন্তু হার্লেম পাহাড়ে পলায়নপর পেনসিলভানিয়ানদের জ্যাগাররা কসাইর মত কুচি কুচি করে খুন করে। ছাউনিতে আজ যারা আছে, সাহসী তাদের বলা চলে না। তবু তাদের ভীতির মধ্যে মিশে ছিল এক কঠোর সংকল্প।

নক্সের পক্ষে হ্যামিলটন সালসার কাজ করত। কোন সময় সে আঠারোটি কামানের ব্যাটারি ছেড়ে দূরে থাকত না; কিম্বা তার গোলন্দাজদেরও গালে হাত দিয়ে ভাববার অবকাশ দিত না। সব সময় গোলন্দাজদের কামান দেখাশুনা বা সাফসাফাই করবার কাজে লাগিয়ে রাখত। কখনও তাদের দিয়ে চাকার অক্ষদণ্ডে চর্বি মাখাত...কখনও কামানের মুখ সাফ করাত...কখনও বা স্ক্রুর মরচে চেঁচে ফেলতে বলত...আবার কখনও কখনও তাদের দিয়ে গোলা-বারুদের সযত্নে-তৈরী গাঁটরি বানাত। নক্সের আজ সেদিনকার কথা মনে পড়ল, যখন নিউইয়র্কে মাথা-গুণতিতে তারা ছিল বিশ হাজার এবং কামানও ছিল শতে শতে। সে আজ কদিন আগেরই বা কথা! কিন্তু আজ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। নিজেও সে বদলে গেছে। একদিন যে বই-বিক্রেতা বেন ফ্রাঙ্কলিনের মত প্রকাশক হবার স্বপ্ন দেখত, আজ সে কোথায়? কি আর আছে সেদিনের? সেদিন চলে গেছে। তার আজকের জীবন থেকে একেবারেই মুছে গেছে সেদিন। যে করেই হোক সেই পুরনো দিন এত পেছনে পড়ে আছে, এত দূরে সরে গেছে

যে আবার কোনকালেই তার নাগাল পাবার কিম্বা সেখানে ফিরে যাবার ক্ষীণতম সম্ভাবনাও নেই। লাখ কি দেড়লাখ কপি বিক্রী হতে পারে, এমন বইয়ের পাণ্ডু-লিপি মনের আনন্দে বসে বসে সংশোধন করবার আর কোন আশাই নেই। আরাম ও আয়াসের কাঙাল নক্স। সে চেয়েছে সাধ-আহ্লাদ সুখশান্তিভরা ভদ্দর-লোকের সাংসারিক জীবন ..চেয়েছে বিদেশ থেকে আমদানি করা চিপেনডেল আসবাবপত্রে রুচিসম্মতভাবে সাজান বাড়ী. ভাল ভাল ইংরেজী লেখকের সেরা সেরা বই ভর্‌তি লাইব্রেরী...রাত্রে শয্যাসঙ্গিনী স্বাস্থ্যবতী গোলগাল স্ত্রীর সোহাগ...আর চেয়েছে সন্তান সন্ততি, যাদের চোখে চোখে রেখে নিজের মনো-মত ছাঁচে ঢেলে সে লেখাপড়া শিখিয়ে ভদ্দরলোক করে তুলতে পারে। কিন্তু এখন তার বয়স মাত্র ছাব্বিশ বছর। তবু নিজেরই মনে হয়, সে অনেকটা বুড়িয়ে গেছে। শুধু একটি ছাড়া সমস্ত লক্ষ্য জীবন থেকে ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে গেছে। বাকী আছে শুধু ভার্জিনিয়ানের সঙ্গে নির্জন লক্ষ্যহীন পথে নিরানন্দময় পথ-চলা।

হ্যামিলটন কিন্তু পাতলা-মুখ বেগনী চোখো ছোট্ট ভূতের মত কামান-গুলোর চারপাশে ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াচ্ছে।

সংখ্যাল্প সৈনিকের লাইনের দিকে বিমর্ষভাবে চেয়ে মার্কারকে জিজ্ঞাসা করলেন শিয়াল-শিকারীঃ গুণেছো?

—তেইশ শো বাহাত্তর।

--ক্যাডোয়ালেডারের সঙ্গেও আঠারো শ'র মত আছে। স্বগতোক্তির মত আস্তে আস্তে বল্লেন শিয়াল-শিকারী।

তারপর তিনি ও বেঁটে স্পচ-ম্যান নীরবে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

গোলন্দাজ দলের হেডশো কর্নেলের কাছে এসে গ্রীন জিজ্ঞাসা করলঃ কি মনে হচ্ছে হ্যারি?

--বুঝি না। কোন কিছু না ভাবাই ভালো। উনি যদি নরকে গিয়ে পিশাচদের ঘুষ দিতে চান, তাহলেও আমি ওঁর সঙ্গেই থাকবো। তাছাড়া আর কি আছে বলো?

--তা বটে!

– আচ্ছা তোমার ঘড়িতে কটা বাজে?

—বারোটা বিশ।

রূপার টাইমপিস্‌টায় চাবি দিয়ে কাঁটা ঠিক করে নক্স বল্লেঃ ঘড়িটা তেমন ভালো না। ঘণ্টায় পাঁচ মিনিট গড়বড় হচ্ছে।

—দ্রুত চলছে না আস্তে চলছে?

—আস্তেই চলছে। কিন্তু কখনও বেশী কখনও কম।

—আজ তুষারপাত হবে বলে মনে হয় না। গ্রীন বলে।

—হবে দেখো।

—ওঃ! জলের মধ্যের ঐ লোকগুলোর কি কষ্টই না হচ্ছে!

ঘাড় ঝাঁকানি দিয়ে মুচকি হাসল নক্স।

—কামান পার করতে কখন শুরু করছো?

—একটু বাদেই।

—নদীতে বরফ ভাসছে। গ্রীন বল্লে।

—জানি। যত বিচ্ছিরি বাধা, যত রকম অসুবিধা হতে পারে, সবই আজ একে একে দেখা দেবে বুঝছি!

– হুঁ! আচ্ছা হ্যারি, ভালোয় ভালোয় কেটে যাব, এই প্রার্থনাই করি।

উত্তর দিককার পাহাড়ের খাঁজ ও খাদ থেকে বরফের ঢল নেমে নদীবক্ষ ছেয়ে যাচ্ছে। তেমন পুরু না হলেও চাঙড়াগুলো বেশ বড় বড়। ঘূর্ণিস্রোতে আবর্তিত হয়ে প্রান্তভাগ ছুরির মত শাণিত হয়েছে। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়েছিল গ্লোভার। শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে অনবরত ধোঁয়া বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে। ভাসমান বরফখণ্ড নদীবক্ষে চাপ বাঁধছে দেখে সে হতাশভাবে মাথা ঝাঁকাতে লাগল।

—বড্ড বিচ্ছিরি জিনিস। গ্লস্টারের ক্যাপ্টেন পার্ডিকে বল্লে গ্লোভার।

—দাঁড়ের বদলে লগি মেরেই পাড়ি দিতে হবে।

—হ্যাঁ, যদি অবশ্য নৌকোর তলা ফেটে না যায়'

—যাই হোক, অবস্থা যা দাঁড়াচ্ছে দেখছি, তাতে যতোটা ভাবা গেছলো, তার চাইতে অনেক বেশী ভাঁটির দিকে যেতে হবে। আমার মনে হয়, মাইলখানেক ভাঁটিতে আগে থেকে একটা জায়গা দেখে রাখা ভালো।

—তার সময় পাচ্ছি কোথায়? তাছাড়া খেয়াঘাটের বন্দোবস্ত না থাকলে নৌকোয় কামান তুলবো কি করে? দেখা যাক, যতটা যা সম্ভব করতেই হবে।

অর্ধনগ্ন মহাদেশীয় সেনা শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে—সর্বশরীর অসাড়

হয়ে আসছে বলে মনে হয়। পাটল রঙের হৃষ্টপুষ্ট একটা ঘোড়ায় চড়ে প্রধান সেনাপতি শীতক্লিষ্ট সেনাদলের মধ্য দিয়ে জোর কদমে ছুটছেন আর ডাকছেনঃ জেনারেল গ্রীন! জেনারেল গ্রীন! তন্তুসার জীর্ণ লম্বা ক্লোকটা ছুটবার সময় তাঁর দীর্ঘ শীর্ণ খাঁচার চারিধারে পতপত করে উড়ছে। ঠান্ডা লেগে ছলছল করছে চোখদুটো। নাকটা বেশ চকচকে লাল দেখাচ্ছে। জেনারেল গ্রীনকে ডাকবার সময় খুক খুক করে কাশছিলেন প্রধান সেনাপতি —সঙ্গে হাঁচিও ছিল।

—ব্যাপার কি স্যর?

—কটা বাজলো?

—এই তো সবে দেড়টা হলো।

—আর কিসের জন্য অপেক্ষা করছো নাথানেল? লোকজন পারঘাটায় নিয়ে যাও। দেখছো না লোকগুলো শীতে কেমন অসাড় হয়ে আসছে!

—আমি ভেবেছিলাম, আরও পরে কাজ শুরু করবো স্যর!

--না না না! এখুনি ওদের রওনা করিয়ে দাও!

গ্রীনকে আদেশ দিয়ে তিনি তিলমাত্র অপেক্ষা করলেন না। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে তখুনি ছুটলেন নক্স এবং হ্যামিলটনের কাছে। কামান নিয়ে তারা কি করছে স্বচক্ষে দেখবার জন্য।

শীতার্ত, প্রায়-অসাড় সৈনিকদের নদীর পাড়ে এগিয়ে যাবার ভঙ্গী দেখে গ্রীন বড়ই ব্যথিত হল। মর্মান্তিক শঙ্কা নিয়ে ঘণ্টাখানেক কাটিয়েছে তারা। কিন্তু তাদের ভীতি এখন অনড় সঙ্কল্পে রূপান্তরিত হয়েছে। এদের ফষ্টিনষ্টি আর চালিয়াতি বহুদিন ঘুচে গেছে। তার বদলে দানা বেঁধে উঠেছে এক নীরব কঠোর প্রতিজ্ঞা। অনেকেরই দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে, এইবার তাদের ক্ষণস্থায়ী বিপ্লব চিরকালের মত খতম হয়ে যাবে। যুক্তি-তর্ক এখন তাদের মনে কোনও সাড়া জাগাতে পারে না। আজাদীর জন্য আত্মবলি দেবার যে শপথ তারা করেছিল, সেই শপথ ছাড়া আর সব কিছু চুকেবুকে গেছে। আর সেই শপথ এখনও রয়েছে বলেই আজ তারা মৃত্যুবরণ করতে চলেছে।

নদীর দিকে এগিয়ে যাবার সময় কেউই গান ধরল না কিম্বা কোন কথা বল্ল না। প্রাণপণ আগ্রহে বড় বড় গাদা বন্দুক চেপে ধরে নীরবে এগিয়ে চল্ল। অধিকাংশ সৈনিকই নাকসোজা চেয়ে হাঁটছিল। কিন্তু তখন তাদের

কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে, তাদের এই পথচলার খস্‌খস্‌ শব্দ নিত্য-কাল ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হবে!

এদের পাশ দিয়ে একলা চলতে চলতে আপনমনে গ্রীন বল্লেঃ সত্যিই এরা বীর! জীবনে কখনো আমি কথাটা ভুলতে পারবো না। এরপর রণে ভঙ্গ দিয়ে যদি এরা পালায়, তাহলেও আজকের এই সাহসিকতার কথা চির-কাল আমার মনে থাকবে।

এককালে গ্রীনকেও নিজের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। ধর্মভীরু কোয়েকার সে। তার ধর্মীয় নির্দেশ যেমন কঠোর তেমনি সুস্পষ্ট—'জীব-হত্যা করিও না'। সে নির্দেশ পালনের পক্ষে আজই প্রকৃষ্ট দিন। আজকের এই বড়দিনেই এমন একজন লোক দুনিয়ায় আবির্ভূত হয়েছিলেন, যিনি পৃথিবীতে শান্তির বাণী, মানুষের প্রতি সদিচ্ছার বাণী প্রচার করে গেছেন। ব্যাপারটা বিসদৃশ এবং অদ্ভুত বলে মনে হলেও মনে প্রাণে গ্রীন জানত যে, আজকের এই পুণ্যদিবসকে সে কলুষিত করছে না। সজ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছে। পাশ দিয়ে যে ভীরু জনতা হেঁটে যাচ্ছে, তাদের মত দুর্বল-চিত্ত হলেও গ্রীন গর্বিত এবং বিনয়ী।

জিনের উপর বসে খানিকটা ঝুঁকে গ্লোভারকে জিজ্ঞাসা করলেন শিয়াল-শিকারীঃ ব্যাপার কি রকম বুঝছো?

—ভালোই বলতে হবে স্যর! যা আশা করেছিলাম, তা থেকে খারাপ কিছু নয়!

--তোমার নৌকো প্রস্তুত আছে?

মাথা নেড়ে গ্লোভার জানাল—আছে; এবং সঙ্গে সঙ্গে হাতের ইশারায় নদীর বুকে ঘূর্ণায়মান বরফের চাঙড়াগুলো দেখিয়ে দিলে।

--নদী পার করে দিতে পারবে তো?

—পার হবো ঠিকই। তবে যা ভেবেছিলাম, তার চাইতে খানিকটা বেশী সময় লেগে যাবে। কিন্তু পার আমরা হবোই! কখন শুরু করতে চান?

প্রথমে ঘড়ির দিকে চেয়ে বড় আদমী আকাশের দিকে তাকালেন। তাঁর মনে হল, মিনিট কুড়ি পরেই যতটা অন্ধকার হবে তাতে ওপার থেকে তাদের হালচাল লক্ষ্য করা যাবে না।

—আগে লোকজন পার করে তারপর কামান পার করবেন?

—দুটোরই কিছু কিছু একসঙ্গে। মুচকি হেসে বড় আদমী বল্লেন।

সৈন্যদলের পাশ দিয়ে এগিয়ে চল্লেন প্রধান সেনাপতি। ঠাণ্ডা মাটিতে গুটিসুটি মেরে বসে আছে সৈনিকেরা। তাঁকে ঘোড়ায় চড়ে যেতে দেখে শত শত বিবর্ণ মুখ ফিরল তাঁর দিকে। ভাবলেন, এদের কাছে কিছু বললেই বোধহয় ভাল হয়। কিন্তু সেই প্রদোষে সৈনিকদের পাণ্ডুর মুখের দিকে চেয়ে মনে হল, তাঁর চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে যে বক্তৃতাই করুন না কেন, কিছুই আসে যায় না। তাঁর এই বেপরোয়া শেষ চেষ্টা যে নিছক পাগলামি, নিজে তিনি ভাল করেই জানেন। এরাও তাই মনে করে কি? কি ভাবছে এরা তাঁর সম্পর্কে? এরা কি তাঁকে ঘৃণা করে, না ভালবাসে? না ভেড়া যেমন মেষপালকের অনুসরণ করে, এরাও তেমনিভাবে কোন চিন্তা-ভাবনা না করে তাঁর অনুগমন করে চলেছে! যে অদৃশ্য বস্তুকে লোকে স্বাধীনতা বলে, সেই বস্তু, সেই লক্ষ্য, সেই আদর্শ কি এতই মহৎ? সেই অভীষ্ট কি এমন সুদুর্লভ যে তার জন্য এত দুঃখকষ্ট, এমন প্রচণ্ড শীত, এই অনশন-অর্ধাশনের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে?

এ প্রশ্নের জবাব তিনি দিতে পারেন না। এককালে অনেক জিনিস সম্পর্কেই তিনি নিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু আজ একটিমাত্র জিনিস ধ্রুব সত্য বলে জানেন যে, নিঃসংগ অন্ধকার পথে তাঁকে চলতে হবে। সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ তিনি। আজকে যা-ই ঘটুক--এই শেষ চেষ্টার ফলে তিনি বিজয়ী হন কি পরাভূত হন, যশস্বী হন কি ধ্বংস হয়ে যান -তিনি জানতেন যে, কোন কিছু-তেই তাঁর নিঃসংগতাব লাঘব কি অবসান হবার নয়! তবু এজন্য কোন অস্বস্তিই বোধ করেন না। হামেশাই তিনি বলতেন এবং লিখতেন যে, দুনিয়ার কোনও পুরস্কারের লোভে আবার তিনি এমনি অবস্থায় পড়তে রাজী নন। কিন্তু আজকে আর সে কথা জোর দিয়ে বলতে ভরসা পান না। কোন অভিজাত শিয়াল-শিকারীর পক্ষে, আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ ধনীর পক্ষে কত-গুলো জিনিস অসম্ভব বলেই তিনি জেনেছিলেন। কিন্তু আজ বুঝতে পেরেছেন যে, আগেকার সেই ধ্যান-ধারণা ভুলে যেতেও তিনি অ-রাজী হবেন না। অপরের ভালবাসা ও শ্রদ্ধার কাঙাল তিনি। জীবনে এই দুটি জিনিসই সব চাইতে বেশী কামনা করেছেন। কিন্তু আজকে বুঝতে পেরেছেন যে, নিজের অশান্ত হৃদয়ের কথা প্রকাশ করলেও অভিনব শান্তি পাওয়া যায়।

প্রচণ্ড শীতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পদাতিকেরা দাঁড়িয়ে ছিল কিম্বা গুটিসুটি দিয়ে জড়সড় হয়ে ছিল। এতক্ষণ পরে আবার চলবার আদেশ পাওয়া গেল। শীতে কুঁকড়ে তাদের অংগপ্রত্যংগ কাঠ হয়ে গেছে। হাঁটবার সময় শরীরের

গ্রন্থিগুলো টনটন করছে। হাততালি দিয়ে এবং বন্দুকের উপর আঙুলের গ্রন্থিগুলো ঠুকে তারা জড়ত্ব কাটাবার চেষ্টা করল। চলতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। কিন্তু আবার উঠে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে হাতড়ে পথ চলতে লাগল। মার্বলহেডের জেলেরা গান গাইছিল। নৌকোয় চড়ার গানঃ 'ঠিকমত ওঠো ভাই! চটপট ওঠো!' মাঝিদের গাইবার ভংগী দেখে হেসে উঠল পদাতিক দল। অনেকটা বিকারগ্রস্থের হাসির মত অস্বাভাবিক এ হাসি! নৌকোয় চড়তে গিয়ে তারা ঠেলাঠেলি আরম্ভ করল। দু একজন হিমশীতল নদীর জলে পড়েও গেল। মাছের মত কম্পিত কলেবরে গালিগালাজ করতে করতে আবার জল থেকে উঠে এল। নদীবক্ষে প্রতিনিয়ত ভাসমান বরফের চাঙড়ার ঘর্ষণে কড়কড় শব্দ হচ্ছে। অনবরত ঠকঠক শব্দ হচ্ছে নৌকার খোলে। দুলছে জীর্ণ ডিঙিগুলো। ভাবসাব দেখে সৈনিকদের গলা কাঠ হয়ে এল। তবু তারা নৌকোয় চড়তে দ্বিধা করল না। ধীর মন্থরে কিন্তু নিঃসংশয়ে এগিয়ে চল্ল মসীকৃষ্ণ অন্ধকারের গর্ভে।

এত শীত তবু গোলন্দাজরা ঘেমেচুমে একশা হল। কামান নৌকোয় তুলতে মেহেনতের একশেষ! একদল কাঁধে করে বয়ে এনে হাঁপাতে হাঁপাতে কোমর জলে দাঁড়িয়ে বজরায় তুলে দিল। আর একদল সেগুলো টাল-খাওয়া নৌকায় সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে হিমসিম খেয়ে গেল। মনে হয়, ঐ নিরেট প্রাণ-হীন ভারী ধাতব খন্ডগুলি বুঝি সহসা সজীব হয়ে উঠেছে। গোলাবারুদ ভর্তি ক্যানেস্তারা এবং লোহার খোলে-ভরা গোলা বয়ে আনতে আর কিছু গোলন্দাজের ঘাড় ভেঙে যাবার উপক্রম হল। নেয়ের কাজে অনভিজ্ঞ গোলন্দাজদের আনাড়ী কান্ডকারখানা দেখে জেলেরা গালিগালাজ করতে লাগল। এটা কর, সেটা কর বলে নানাপ্রকার নির্দেশ দিলে এবং অনুরোধ জানাল। সমস্ত সোরগোল ছাপিয়ে নক্সের বাজখাঁই গলার আদেশ শোনা গেলঃ এগিয়ে ঐটা ধরো! ধরে থেকো! এটার তলায় কাঁধ দাও! আঃ! কাঁধ দাও বলছি!

একখানা বজরা উলটে গোটাতিনেক ঘোড়া জলে পড়ে গেল। চিঁহিহিহি শব্দ করে ভীত ঘোড়া তিনটি স্রোতের টানে নদীর মধ্যে দাপাদাপি শুরু করল। সুলিভানের ঘোড়াটিও ছিল এর মধ্যে। চীৎকার করে সে বল্লেঃ আহাহা! ধরো! ধরো! দোহাই ভগবানের! ডুবে যায় না যেনো! শীগগির ধরে তোলো!

শশব্যস্ত ক্লান্তিহীন গ্লোভারের খোঁজে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে হাতড়ে শিয়াল-শিকারী নক্সের কাছে হাজির হলেন। দুহাতে তার কাঁধ চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করলেনঃ রাত দুপুর হয়ে গেলো হ্যারি, এখনও কামানগুলো নৌকোয় বোঝাই করা হলো না কেনো?

নদীর হিমশীতল জলে ও ঘামে ভিজে নক্স চুপচুপে হয়েছে। মাথায় টুপী নেই। কোটের পিঠ ছিঁড়ে দুভাগ হয়ে গেছে। বুটজুতো কাদা-মাখা। হাড়-কাঁপানি শীতের সঙ্গে সঙ্গে একটু জ্বর-জ্বর ভাব লাগছে। বড় আদমীর দিকে ফিরে মাথা ঝোঁকে মিনতির সুরে নক্স বল্লেঃ সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি করছি না স্যর! কিন্তু এর বেশী করবার উপায় নেই। বরফের জন্যই সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। নৌকোগুলো ইচ্ছেমত ওপারে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। অনেকটা ভাঁটিতে গিয়ে আবার উজানে টেনে আনতে হচ্ছে। তাছাড়া বাস্কে ভরে গোলাগুলিও পার করবার চেষ্টা করছি স্যর। প্রয়োজন হলে চট করে কামান ব্যবহার করা যাবে!

—বেশ, যতোটা তাড়াতাড়ি পারো করো হ্যারি! আর শোনো, গ্লোভারকে ডাকোতো! আমার গলা বসে গেছে। হাঁক দাও!

ষাঁড়ের মত ধেড়ে গলায় নক্স ডাকতে লাগল গ্লোভারকে। একটু পরে পেছন ফিরে দেখে, ভার্জিনিয়ান ইতিমধ্যেই অন্ধকারে অন্তর্হিত হয়ে গেছেন।

রাত দুটোর মধ্যেই অধিকাংশ গণফৌজ নদী পার হয়ে গেল। ভূতের মত অক্লান্ত শ্রম করে জেলেরা আবারও অসাধ্য সাধন করল। নিকষকালো অন্ধকারের মধ্য দিয়ে তীব্র স্রোত ও ভাসমান বরফের বাধা অতিক্রম করে ট্রেনটনে হেসিয়ানদের ছাউনির মাইল নয়েক দক্ষিণে গণফৌজের লোকজন এবং কামান-বন্দুক পার করে দিল। এই সংবাদ জানাতে এসে গ্লোভার দেখল যে, নক্স আর গ্রীনকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন শিয়াল-শিকারী।

—আপনারা এখন পার হলেই ভালো হয় স্যর! গ্লোভার বল্লে। —ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট প্রায় মিটে গেছে।

ঘাড় নেড়ে ওয়াশিংটন সম্মতি জানালেন। নৌকোয় উঠতে সাহায্য করবার জন্য গ্রীন তাঁর হাত ধরল। কিন্তু তিনি একপাশে সরে গিয়ে বল্লেনঃ তুমি আগে ওঠো হ্যারি! তুমি ঠিক হয়ে বসলে আমি নিশ্চিন্ত বোধ করি।

প্রধান সেনাপতির হালকা রসিকতায় নক্স হেসে কুটি কুটি হল। হোহো—হাহা করে হাসতে হাসতে সে নৌকোয় চড়ল। হাসির চোটে চোখ দিয়ে জল

গড়াতে লাগল। নক্স ঠিক হয়ে বসবার পর গ্রীন উঠল। তারপর গ্লোভারের দৃঢ়হস্তে ভর করে ভার্জিনিয়ান নৌকোয় পা দিলেন। নৌকোয় চড়ে তিনি বসবার জায়গা খুঁজতে লাগলেন। তারপর পায়ের আঙুল দিয়ে গোলন্দাজ দলের হোঁতকা কর্নেলকে খোঁচা মেরে বল্লেনঃ এই হ্যারি, সরে বসো! তোমার ভারে নৌকোটা কাত হয়ে আছে দেখছো?

জেলেরা নৌকো ছেড়ে দিল। ভার্জিনিয়ার দীর্ঘ চাষী এবং জেলেদের মধ্যে ব্যবধানের যে প্রাচীর ছিল, তাদের প্রাণখোলা হাসিতে পলকের জন্য সে ব্যবধান ঘুচে গেল। খুশীর আনন্দে তখনও খিল-খিল করে হাসছে নক্স। আজ তার পরম আনন্দ, পরম সৌভাগ্যের দিন। সবার উপরে যাকে সে ভালবাসে, তিনি স্বয়ং আজ তারই পাশে, তারই গা ঘেঁষে একই আসনে বসে আছেন। ওয়াশিংটনের দিকে ফিরে তাকাল নক্স। তাঁর ঈষৎ কটা চোখের ভাস্বর দৃষ্টি তখন অন্ধকারের গর্ভে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। নতুন এক উপলব্ধিতে নক্স ও গ্রীন উল্লসিত হয়ে উঠল। নক্স জানত, গ্রীনও জানত যে, এইখানেই তাদের যাত্রাপথ শেষ হয়ে যাবে না। এ পথের পথিক যারা অন্তহীন তাদের যাত্রা। এ পথের শেষ নেই। আছে শুধু নব নব সূচনা।

শেষ কথা

শেষ কথা দিয়েই অনেক বই শেষ করা হয়। এখানে সে রীতির ব্যতিক্রম আছে। যে রক্তমাখা পায়ের মিছিল ট্রেনটনের দিকে এগিয়ে যায়, সেই মিছিলের পদশব্দ বজ্রনির্ঘোষে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে সারা দুনিয়ায় চমক সৃষ্টি করেছিল। আজও হারিয়ে যায়নি সে পদধ্বনি! ভগবান করলে, কোন কালেই বিলুপ্ত হবে না। শীতার্ত দুর্গত এই জনতা কেমন করে ট্রেনটন এল, কেমন করে স্থানটি দখল করে সহস্রাধিক জার্মান সেনা বন্দী করল—এখানে তার পুনরুক্তি বাহুল্য মাত্র।

ভার্জিনিয়ার শিয়াল-শিকারী চাষী হিসাবে যে মানুষটি দেলওয়ারে নদী অতিক্রম করল, ওপারে গিয়ে সে একেবারে বদলে গেল। সেই মানুষই মহাপুরুষের পর্যায়ভুক্ত হল। যত দেবতুল্য মানুষ দুনিয়ার বুকে পদচিহ্ন রেখে গেছেন, তাঁদের সবাইর চাইতে মহীয়ান ও গরীয়ান মানুষে রূপান্তরিত হলেন। সবার উপরে অক্ষয় হয়ে রইল তাঁর মহিমামণ্ডিত উন্নত শির। এই-খানে পদার্পণ করেই তিনি সর্বদেশের হতভাগ্য ও নিপীড়িতদের নিয়ে গড়া এক নতুন জাতির জনক হলেন। এত বড় সম্মান মানব ইতিহাসে আর কারও প্রাপ্য নয়। আমেরিকার উপর চিরকাল অম্লান অক্ষয় হয়ে থাকবে জর্জ ওয়াশিংটনের ছাপ। আর এ ছাপ আমেরিকার পক্ষে নিঃসন্দেহে কল্যাণকর। কথাটা বড্ড সহজ, বড্ড কাটাকাটা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এমনি সরল সত্য কথা প্রকারান্তরে বোঝাবার সার্থকতা কি? যতভাবেই তাঁকে খাটো বা নস্যাৎ করবার চেষ্টা করা হোক না কেন, জর্জ ওয়াশিংটনের বিস্ময়কর সারল্য, অকৃত্রিম নিঃস্বার্থপরতা এবং ঘর-সংসার ছাড়া করে যাঁরা তাঁকে বিপ্লবের সংগ্রামে পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের প্রতি তাঁর অবিচল বিনয়ী শ্রদ্ধার কাহিনী চিরকাল ভাস্বর হয়ে থাকবে। হাতের মুঠোয় ক্ষমতা পেয়েও তিনি অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করেছেন সে ক্ষমতা। তাঁর এই দৃষ্টান্ত আমেরিকাকে শিখিয়েছে নতুন নেতৃত্বের আদর্শ.. দিয়ে গেছে জনগণের সেবার উত্তরাধিকার —শাসনের নয়! কখনও কখনও এই আদর্শ হয়ত চাপা পড়ে। তবু জাতির

অন্তরের মণিকোঠায় এ আদর্শ চিরজাগরূক। আমেরিকার মানসলোকে এ ছাপ চিরজীবী।

দুঃখের কথা, অষ্টাবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও ইতিহাস লেখা হত স্তুতিবাদ, মিথ্যা আর উপকথার মিশ্রণে। আজকের দিনে খাঁটি সত্য উদ্ঘাটন করা সুকঠিন। জর্জ ওয়াশিংটন প্রায় আট বছরের মত বিপ্লবের নেতৃত্ব করেছেন। এই সময় তাঁকে যে কত কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে সে সম্পর্কে আমেরিকাবাসীর কোন ধারণাই নেই। লিংকলন সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। সে যুগে কতকটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইতিহাস লেখা শুরু হয়ে গেছে। তবু লিংকলনের সুকঠোর পরীক্ষা সম্পর্কে সাধারণ আমেরিকাবাসীর জ্ঞান কতটুকু? নিজেদের গোষ্ঠীগত ইষ্টসাধনের জন্য আমেরিকান বিপ্লবকে যারা ঘরোয়া সম্পত্তি করে রেখেছে, কাঁচের বাক্সবন্দী করে রেখেছিল চরম প্রতিক্রিয়াশীলদের জন্য, বিশেষতঃ সনস্ অফ দি আমেরিকান রেভলিউসন এবং ডটারস্ অফ দি আমেরিকান রেভলিউসনের (উগ্র প্রতিক্রিয়াপন্থী প্রতিষ্ঠান) পান্ডাদের জন্য, মানব জাতির এক মহান দুঃসাহসী প্রচেষ্টাকে তারা গোপন করতে চেয়েছে। সেই মহান প্রচেষ্টার নায়ককে বানিয়েছে তাদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার। সস্তা চটকদার রঙের এই প্রলেপ দেখে লক্ষ লক্ষ আমেরিকান মুচকি হেসে সাচ্চা মানুষটিকে পর্যন্ত উপেক্ষা করেছে। ওয়াশিংটনের সত্যবাদিতা সম্পর্কে শেরীগাছ কাটার কাহিনীটি উদ্ভট বলে, তাঁর সম্বন্ধে সব কিছুকেই এরা আজগুবি বলে ধরে নিয়েছে। তাঁর নামটা পর্যন্ত উড়িয়ে দেবার জন্য সর্বপ্রকার গণতন্ত্রের দুশমনরা ইদানীং যে গগনভেদী চীৎকার-চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছে, চারিদিকের সেই গলাবাজীর মধ্যে সাধারণ মানুষের এই জাতীয় ধারণায় অবাক হওয়া যায় না।

সেই মানুষটিকে এবং তাঁর চারিপাশের সবাইকে আমি যথোচিত মানবীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছি। সাচ্চা মানুষ হিসাবে, এক ডুবুডুবু আদর্শের একনিষ্ঠ দৃঢ়পণ সেবক হিসাবে আদতে এঁরা যা ছিলেন বলে আমার মনে হয়েছে, কোন অতিমানবীয় মহিমা আরোপ না করে ঠিক সেই ভাবেই এই বইয়ে তাঁদের চরিত্র-চিত্রণ করেছি। এদের মধ্যে একমাত্র হ্যামিলটন ছাড়া কাকেও প্রতিভাবান বলা চলে না। আবার যুদ্ধের পর যখন জাতি-গঠনের পালা এল, তখনও একমাত্র হ্যামিলটন ছাড়া (ওয়াশিংটন তো বটেই) কেউ সে কাজে স্মরণীয় কোন অংশ গ্রহণ করেননি। নবযুগ প্রবর্তনের জন্য এরা দেখা দেন যুগসন্ধিতে। কিন্তু তাঁদের পেছনের দিন কিংবা পরবর্তী

নতুন দিন—কোনটার সঙ্গেই তাঁদের যোগসূত্র ছিল না। বিপ্লবী তাঁরা। সব কিছু নিঃশেষে দান করে গেছেন। কিন্তু নিজেদের জন্য অবশিষ্ট কিছুই ছিল না বলে কোন অনুতাপ করেননি। অনেকের নামই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস, তার জন্যও এঁরা কোন অনুতাপ করতেন না।

নিউইয়র্ক অভিযান এবং পরবর্তী পশ্চাদপসরণের পটভূমিকায় যখন এই এই উপন্যাস লিখতে শুরু করলাম, আমি জানতাম, অতি সন্তর্পণে আমায় পথ চলতে হবে। এ কাহিনীর কোন চরিত্রই কাল্পনিক নয়। প্রতিটি নামের এক একটি লোক ছিলেন এবং কাহিনীতে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, খোদ বিপ্লবেও অনুরূপ ভূমিকাই তাঁরা গ্রহণ করেছেন। আমি তাঁদের বাঁচিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছি। আজকের দিনে সেই বিস্মৃতপ্রায় যোদ্ধাদের বেঁচে উঠবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। যে কাজ তাঁরা করে গেছেন, আবারও তেমনি কাজ করতে হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সমস্ত শুভ-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সংগ্রামে আবারও তাঁদের যোগ দিতে হবে। কাজেই তাঁদের মুখে আমি এমন ভাষা দিয়েছি, যার কোন নজীর নেই।

একথা আমি জোর করে বলব যে, এই সব মানুষের চরিত্র যথাসম্ভব যথাযথ রাখবার চেষ্টাই আমি করেছি। অপ্রচলিত রূপ বদলে সুযোগ পেলেই তাদের কথার উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছি এবং অবস্থা বিশেষে যে সব কথা তাঁরা বলেছেন কিংবা যে সব চিন্তা তাঁদের মনে দেখা দিয়েছে, নজীর না থাকলেও আমি তা লিপিবদ্ধ করেছি। এ সম্পর্কে বহু ঐতিহাসিক রচনা আছে। বইয়ে উল্লিখিত কোন কোন ঘটনা যদি ঐতিহাসিকদের সঙ্গে না মেলে, তবুও সেগুলো আমি সত্য বলেই মনে করি। কিছুদিন আগেও আমাদের বিপ্লব সম্পর্কে বহু ঘটনা যতটা সম্ভব চাপা দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। একশো ষাট বছর সযত্নে চাপা দেবার সুচতুর প্রয়াসের পর, সেই সব ঘটনা-বলীর যাথার্থ্য যতটা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব, খাঁটি সত্যের যতটা কাছাকাছি এগোনো যায়, ঐকান্তিকভাবে সে চেষ্টা আমি করেছি। ইচ্ছে করেই উপন্যাসের সঙ্গে কোন গ্রন্থ-পরিচিতি সংযোজনা করলাম না। তবে ওয়াশিংটনের জীবনী সম্পর্কে ভাল-মন্দ অগণিত বইয়ের কাছে আমার ঋণ অনস্বীকার্য। বিশেষতঃ রুপার্ট হিউজেসের অপূর্ব বইখানির কাছে আমি অশেষ ঋণী।